শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ

(শাশ্বত বঙ্গ)

কাজী আব্দুল ওদুদ

প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ :

কে এম বদিয়ার রহমান

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ

কাজী আবদুল ওদুদ

প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ

কে এম বদিয়ার রহ্‌মান

এস. আর. প্রকাশন

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক
মোঃ আশ্রাফুর রহমান
এস. আর. প্রকাশন
১২ বাংলাবাজার
(সিকদার ম্যানশন)
ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১৮৪৩৫৯৬১

প্রকাশকাল
আগষ্ট ২০১৪

কম্পোজ
ভূঁইয়া কম্পিউটার
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
আব্বাস খান

মুদ্রণ
সুন্দরবন প্রিন্টার্স

মূল্য : ২৫০ টাকা মাত্র

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

আমার পিতা

মরহুম মোহাম্মদ পেঞ্জেল খান

ও

আমার মাতা

জুলেখা বেগমকে

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

সাহিত্যের সুবিজ্ঞ গবেষকের দৃষ্টিতে নয়, সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধ আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছি। 'ওদুদ-প্রবন্ধ: প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ' গ্রন্থটি সিলেবাস অনুযায়ী বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত হয়েছে। জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, প্রশ্নোত্তরসহ প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছি। সমালোচনার ক্ষেত্রে দেশি বিদেশি পরম শ্রদ্ধেয় সমালোচকবৃন্দের তথ্য-উপাত্তের সাহায্য নিয়েছি। আমি তাঁদের সকলের কাছে ঋণী।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি যিনি আমাকে গ্রন্থটির আলোচনা ও বিশ্লেষণ অসীম ধৈর্য, শক্তি ও সাহস প্রদান করেছেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান স্যারের আন্তরিক উপদেশ, গ্রন্থের নামকরণে সস্নেহ নির্দেশ এবং আনুষঙ্গিক জটিলতায় তাঁর সূক্ষ্ম বিবেচনা ব্যতীত আমার পক্ষে এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব ছিল না। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম। মোঃ মনিরুজ্জামান, হাতেম আলী সরদার, প্রকাশক মোঃ আশ্রাফুর রহমানসহ অন্যান্য যাঁরা আমাকে সর্বদা এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধগুলোর আলোচনা কেবল শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। তাদের উপকারে আসলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

এই প্রাসঙ্গিক আলোচনার উন্নতির জন্য কারও কোন পরামর্শ থাকলে তা সাদরে গৃহীত হবে।

যশোর
জুলাই ২০১৪

কেএম বদিয়ার রহমান

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ওদুদ-প্রবন্ধ : প্রাসঙ্গিক আলোচনা ১১

প্রথম অধ্যায়

১.১ কাজী আব্দুল ওদুদের ব্যক্তি জীবন (১৮৯৪-১৯৭০) ১১

১.২ কাজী আবদুল ওদুদের রচনাবলি ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ মূল বক্তব্য ১৯

২.১.১ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ১৯

২.১.২ রস ও ব্যক্তিত্ব ২০

২.১.৩ শতবর্ষ পরে রামমোহন ২১

২.১.৪ ইকবাল ২২

২.১.৫ সংস্কৃতি কথা ২৪

২.১.৬ নজরুল ইসলাম ২৭

২.১.৭ গ্রেটে ২৯

২.১.৮ বাঙলার জাগরণ ৩২

২.১.৯ কোরআনের আল্লাহ ৩৫

২.১.১০ সম্মোহিত মুসলমান ৩৬

২.২ মুক্ত বুদ্ধির চেতনা ৩৯

২.৩ প্রগতিশীল চিন্তা ৪৫

২.৪ সমাজ-ভাবনা ৪৯

২.৫ রেনেসাঁসের চেতনা ৫৪

২.৬ সাহিত্যাদর্শ ৫৭

২.৭ রাষ্ট্রচিন্তা ৬০

২.৮ ধর্মচিন্তা ৬৩

২.৯ মননশীল চিন্তা ৬৬

২.১০ গদ্যরীতি ৬৭

২.১১ তথ্য-নির্দেশ ৭০

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

নিবেদন	৭৫
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ	৭৭
রস ও ব্যক্তিত্ব	৮৪
ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি	৮৮
সংস্কৃতির কথা	৯২
কোরআনের আল্লাহ্	৯৮
ইকবাল	১০০
রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান-সমাজ	১০৮
বিষাদ-সিন্ধু	১১১
নজরুল ইসলাম	১১৩
মুসলমানের পরিচয়	১২৩
ব্যর্থতার প্রতিকার	১৩৬
রামমোহন রায়	১৪৭
রামমোহন ও মুস্‌লিম-ধারণা	১৪৭
রামমোহন ও হিন্দু-সাধনা	১৫৩
রামমোহন ও খ্রিস্টধর্ম	১৬০
রামমোহন সাধনা	১৬০
গ্যেটে	১৬৭
বাংলার জাগরণ	১৮১
সম্মোহিত মুসলমান	১৯২
শতবর্ষ পরে রামমোহন	১৯৮
ভারতবর্ষের সাধনা	২০২
বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা	২০৫
দেশের জাগরণ	২১৫
বাংলা সাহিত্যের চর্চা	২২৬

চতুর্থ অধ্যায়

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী	২৩৬

www.nagorikpathagar.org

ওদুদ প্রবন্ধ : প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ

প্রথম অধ্যায়

১.১ কাজী আবদুল ওদুদের ব্যক্তি জীবন (১৮৯৪-১৯৭০)

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান লেখক : তিনি এ প্রতিষ্ঠানকে নবজাগরণের আদর্শে উজ্জীবিত করে বাঙালি মুসলমান সমাজের মুক্ত বুদ্ধির চেতনা জাগ্রত করতে আজীবন সাহিত্য সাধনার ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর প্রায় অর্ধশতাব্দীর সাহিত্য চর্চা বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান বলে বিবেচিত। তাঁর রচনা পরিমাণে, বৈচিত্রে এবং গুণগত মানে সুসমৃদ্ধ।

কাজী আবদুল ওদুদ ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে এপ্রিল (১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৪ বৈশাখ শুক্রবার) ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত বাগমারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহের নাম কাজী ইয়াসিন আলী ও পিতার নাম কাজী সৈয়দ হোসেন ওরফে ছগীর কাজী। তাঁর পিতামহরা ছিলেন পাঁচ ভাই,-কনিষ্ঠ কাজী মোহ্সীন আলী পুলিশ বিভাগে রাইটার কনস্টেবল অথবা হেড কনস্টেবল ছিলেন। তাঁরই বাসায় থেকে ছগীর কাজী কিছুদিন লেখাপড়া শিখেছিলেন। অতঃপর মুর্শিদাবাদে গিয়ে তালিবপুরের জমিদার-বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মাইনর ক্লাশ পর্যন্ত পড়েন। মোহ্সীন কাজী পেন্সেন নিয়ে বাড়িতে এসে পৃথগান্ন হন : তখন ইয়াসীন কাজীর ভাগে পড়ে একখানা কিছু বড় জীর্ণ-ঘর ও একখানা ছোট ঘর, আর পৈতৃক দুই-তিন বিঘা জমি। সে-সময়ে ছগীর কাজী তালিবপুরের জমিদার বাড়ি থেকে বিদায় হ'য়ে চাকুরির সন্ধান করেন ও কলকাতার দিকে রেলওয়েতে একটা ছোট-খাটো চাকরি পান, তার বেতন থেকে প্রতি মাসে পাঁচ-সাত টাকা বাঁচিয়ে বাড়িতে পাঠাতেন।[১]

চাকরি লাভের পূর্বেই সগীর কাজীর বিয়ে হয়েছিল বিত্তবান পাঁচু মোল্লার ছোট মেয়ের সঙ্গে। জানা যায়, কাজী পরিবারের শরাফতির বদৌলতেই এ বিয়ে সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীতে শ্বশুর পক্ষের সংগতি সম্পন্ন শিক্ষিত আত্মীয়-স্বজন তাঁর চাকরির জীবনের উন্নতিতে নানাভাবে সহায়ক হয়েছিলেন। সগীর কাজী ইস্টবেঙ্গল রেলওয়েতে স্টেশন মাস্টারের পদ লাভ করেছিলেন এবং দর্শনা স্টেশন মাস্টারের পদ লাভ করেছিলেন এবং দর্শনা সোদপুর হাওড়া প্রভৃতি স্টেশনের দায়িত্ব পালন করে শেষে হাওড়ার স্টেশন মাস্টার থাকাকালে স্টেশন-কোয়ার্টারেই ১৯২২ সালের দিকে মৃত্যুবরণ করেন।[২] তিনি তাঁর চাকরি-জীবনের সূচনায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে যখন হাসপাতালে' তখন আবদুল ওদুদের জন্ম হয়। আবদুল ওদুদ তাঁর অসম্পূর্ণ 'স্মৃতি কথা'য় বলেছেন ঃ

"আমি না-কি দেখতে খুব কুৎসিত হয়েছিলাম। মাথায় ছিল কতকগুলো কাটার দাগ। মা বলেছেন ঃ ছেলের দিকে তাকিয়ে মোটেই খুশী হইনি।"

www.nagorikpathagar.org

বাল্যকালে আবদুল ওদুদের ডাক নাম ছিলো ফতেহ্ কাজী। তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁর মামা বাড়িতে। তিনি জগন্নাথপুর মাইনর স্কুলে দুই বছর প'ড়েছিলেন। তাঁর ছোটো মামা নাজির উদ্দীন দারোগা হয়ে ঢাকায় চাকরি পেলে আবদুল ওদুদকে পড়াশোনার ভালো ব্যবস্থার জন্যে ঢাকায় নিয়ে আসেন। নাজিরউদ্দীন নরসিংদীতে বদলী হ'লে আবদুল ওদুদ নরসিংদী এসে তিন বছর থাকেন। তিনি নরসিংদীর শাটীরপাড়া হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত প'ড়েছিলেন। নরসিংদী থেকে পাবনা যান ১৯০৯ সালে এবং পাবনা ইনস্টিটিউশনে সপ্তম শ্রেণিতে পড়েন। পাবনা ত্যাগ করে ১৯০৯ সালের শেষে। ১৯১০ ও ১৯১১ সালে নারায়ণগঞ্জের মৃড়াপাড়া স্কুলে অষ্টম ও নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। এখানে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থটি পড়বার সুযোগ লাভ করেন। সেটি পড়ে তাঁর মনে এমনই প্রতিক্রিয়া জাগে যে, প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমিষ খাদ্য বর্জন করেছিলেন; তাতে তাঁর শরীর বেশ কৃশ হয়ে পড়েছিল। ফলে পরীক্ষায় তিনি আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারেন নি। কাজী মোতাহার হোসেন জানিয়েছেন :

'তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন; যা পড়তেন সে সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন।'

১৯১২ সালে ওদুদ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে দশম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯১৩ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। তিনি বরাবরই ভালো ছাত্র ছিলেন, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রায়ই প্রথম হতেন। দশম শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষায়ও তিনি অতিরিক্ত বিষয় সংস্কৃতসহ সকল বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। কিন্তু ফাইন্যালে সে রূপ ফল করতে পারেন নি। তবে দশ টাকার একটি ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। এর কারণ, তিনি জানিয়েছেন, তাঁর প্রিয় বাংলায় যথেষ্ট কম নম্বর পেয়েছিলেন।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তিনি তাঁর মামা নাজির উদ্দীন সাহেবের পরামর্শক্রমে কলকাতা এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এ ক্লাসে ভর্তি হন। তখন রূপগঞ্জ থানার ছোট দারোগা ছিলেন বরিশাল জেলার এক বৈদ্য ভদ্রলোক, তাঁর শ্বশুর কলকাতায় বকুল বাগানে থাকতেন ও শিক্ষকতা করতেন। আবদুল ওদুদ এই ছোট দারোগা বাবুর চিঠি নিয়ে তাঁর শ্বশুরের বাসায় এসে ওঠেন এবং তারই সহায়তায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তিনি সেই বাসায় কয়েকদিন ছিলেন, তখন দেখতেন যে, প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে শিক্ষক মহাশয় তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ভক্তিভরে রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি'র গান গাইছেন। সেই গানের কথা ও সুরের অভিনবত্ব আবদুল ওদুদের মন সহজেই আকর্ষণ করে; ফলে তিনি এক খন্ড 'গীতাঞ্জলি' কিনে এনে গানের অভ্যাস করেন এবং 'সবুজপত্রের' গ্রাহক হন। 'সবুজপত্র' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বিবেচনা ও আলোচনা' লেখাটি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে।

১৯১৫ সালে ওদুদ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই-এ পাস করেন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ এই তিন বছর তিনি সরকারি বেকার হোস্টেলে ছিলেন। এই হোস্টেলে তখন

www.nagorikpathagar.org

শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মাদ আফজাল-উল-হকও থাকতেন। তাঁরা উভয়ে মিলে তখন হোস্টেল থেকে একখানা হাতে-লেখা পত্রিকাও বের করেছিলেন। জানা যায়, এই রচনা দিয়েই বাংলা সাহিত্যে তাঁর হাতেখড়ি হয়। ১৯১৭ সালে ওদুদ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। বি. এ পাসের পর তাঁকে সরকারি বেকার হোস্টেল ত্যাগ করতে হয়; কেননা এটি ছিল আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের হোস্টেল। এ সময় তাঁর মামা নাজির উদ্দীন বেঙ্গল পুলিশের ইনস্পেক্টর হয়ে কলকাতা গমণ করেন। ওদুদ তাঁর বাসায় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়া শুরু করেন এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিটিক্যাল ইকোনমিতে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। পরে নাজির উদ্দীন সাহেব কৃষ্ণনগরে বদলি হলে ওদুদ বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য-সমিতির অফিসে গিয়ে ওঠেন। সেখানে তিনি তাঁর বন্ধু 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার আফজল-উল হকের সঙ্গে বাস করতেন। সেই সময়ে তরুণ কবি নজরুল ইসলামও সেখানে গিয়ে উঠেছিলেন। ওদুদ তখন কিছুদিন আইন পড়েছেন, কিন্তু পারিবারিক কারণে তা শেষ করতে পারেন নি। স্ত্রীর কঠিন অসুখের খবর শুনে তাঁকে দেশের বাড়ি ফিরে যেতে হয়।

ওদুদ বেড়ে উঠেছেন প্রধানত তাঁর মামাদের সংশ্রবে। সেই সুবাদে তাঁর বড় মামা আসহাব উদ্দীনের জ্যেষ্ঠ কন্যা জমিলার সাথে তাঁর সম্পর্ক হয়। আসহাব উদ্দীন সাহেব শেষ বয়সে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে নরসিংদীতে নাজিরউদ্দীন সাহেবের বাসায় অবস্থানকালে মৃত্যুবরণ করেন। এই সময় ওদুদও সেই বাসায় থেকে লেখাপড়া করতেন। পরে ওদুদ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ পড়ছেন, তখন ১৩২২ সালের ৭ ফাল্গুন তাঁর ছোট মামা নাজির উদ্দীনের আগ্রহে জমিলা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্ত্রী সম্পর্কে ওদুদ জীবন কথায় লিখেছেন ঃ 'আমার স্ত্রীর অপূর্ব স্নেহময় প্রকৃতি ও নিঃশেষে আত্মদানের ক্ষমতা থেকে আমার নতুন দীক্ষা লাভ হয় প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে।'

তাঁর সম্পর্কে সুফিয়া খাতুন জানান, 'তাঁর ভাবী ও মামাতো বোন জমিলা খাতুন খুবই সুন্দরী ছিলেন, স্কুল-কলেজে পড়েন নি-সে সময়ের সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরের মেয়েদের মতো ঘরেই লেখাপড়া করেছিলেন–তবে তিনি চৌকস মেয়ে ছিলেন।'

১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম-এ পাস করেন। এর পর শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। এ সময় কিছুদিন তিনি কলকাতার 'একটি মুসলিম সওদাগার অফিসে ঘোরায়েরা করেছিলেন।' এর পর বাড়ি থেকে স্ত্রীর কঠিন অসুখের খবর পেয়ে তিনি দেশে ফেরেন। এবং ১৯২০ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার লেকচারের পদে যোগদান করেন। পলিটিক্যাল ইকোনমিতে এম. এ পাস করেও বাংলা সাহিত্যের লেকচারার পদে নিয়ে নিয়োগ পাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ ছিল তাঁর গল্প গ্রন্থ 'মীর-পরিবার' (১৩২৫) চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে তাঁর 'বিরাজ বৌ' শীর্ষক রচনা ছাপা হয়। ১৩২৫ পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে বের হয় তাঁর "মুসলমান সাহিত্যিক" এবং ১৩২৭ বৈশাখ সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' "সাহিত্যিকের সাধনা" শীর্ষক প্রবন্ধ। "সাহিত্যিকের সাধরনা"র সপ্রংশ সমালোচনা করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সবুজ পত্রে'। ওদুদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্তির মূলে ছিল এই সব

www.nagorikpathagar.org

রচনা, ইদরিস আলীর মতে বিশেষত "সাহিত্যিকের সাধনা" ও 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত এ সমালোচনা। ওদুদ তাঁর জীবন কথায় জানান :

"১৩২৭ সালে (১৯২০) আমি ঢাকায় যাই বাংলার লেকচারার হয়ে দীনেশ বাবুর সুপারিশে। আমার 'নদীবক্ষে' ও 'মীর-পরিবার' আর মোসলেম ভারতে প্রকাশিত 'সাহিত্যিকের সাধনা' প্রবন্ধ দেখে ও শরৎবাবু, রবীন্দ্রনাথ, শশাঙ্ক মোহন সেন, প্রমথ চৌধুরীর অনুকূল মত জেনে তিনি সুপারিশ করেন। তখনও তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি।"

জানা যায়, তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের এই পদে কোনো মুসলমানকে নিয়োগ করা হবে বলে সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল; কিন্তু তখনো পর্যন্ত সারা প্রদেশে কোনো মুসলমান বাংলায় এম. এ. পাস করে নি। তাই ওদুদের সাহিত্যিক পরিচয় জেনে ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে উক্ত পদের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এক টানা বিশ বছর কাজী আবদুল ওদুদ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাঁর জীবনে এই বিশটি বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় তিনি আপন সুকুমার বৃত্তির চর্চার মাধ্যমে নিজেকে যেমন বিকশিত করে তুলেছিলেন, তেমনি পারিপার্শ্বিক সমাজের বিশেষত স্ব-সমাজের মানুষদের বিকাশ সাধনের চেষ্টাও আবুল হুসেন ও তাঁর নেতৃত্বে এবং আবদুল কাদিরের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলমান সমাজের সম্মুখে নবজাগরণের আদর্শকে তুলে ধরা।—কাজী আবদুল ওদুদের ভাষায় 'বুদ্ধির মুক্তি'-মন্ত্রকে তুলে ধরা। এর মুখপত্র 'শিখা'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল, শিখার প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন সাধন। নানা প্রতিকূলতা ও রক্ষণশীল সমাজের বিরোধীতা সত্ত্বেও মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। মূলত তখন দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এত প্রকট হয়ে উঠেছে যে, মুসলিম সাহিত্য সমাজের মতো অসাম্প্রদায়িক যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাবের প্রতিষ্ঠান অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। ইতঃপূর্বে ঢাকার নবাব-বাড়ির পক্ষ থেকে মুসলিম হলে সাহিত্য সমাজের সভানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়, তথাকথিত ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে আবুল হুসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ নিগৃহীত হন।

১৯৪০ সালের মে মাসে তিনি কলকাতায় গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে ওঠেন। ১৯৩৯ সালে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপানিদের বোমা-হামলায় কলকাতাও প্রায় অরক্ষিত; তাই ১৯৪২ সালে জাপানের আক্রমণ-ভীতিতে বাংলা সরকারের টেক্সট বুক কমিটির অফিস রাজশাহীতে নেওয়া হয়, সে সঙ্গে ওদুদ ও রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হন। রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গনেই ছিল তাঁদের অফিস। যুদ্ধ শেষে ১৯৪৫ সালে সাময়িক ভাবে স্থানান্তরিত অফিসসমূহ আবার কলকাতা ফিরে গেলে ওদুদও সে সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যান। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৫ আগস্ট থেকে উক্ত পদের সঙ্গে Registrar of publication-এর পদ যুক্ত করে দেন এবং সে পদে ওদুদ নিযুক্ত থাকেন। প্রায় পাঁচ বছর উক্ত পদে কর্মরত থাকার পর ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কলকাতার তারক দত্ত রোডে বাড়ি করে

www.nagorikpathagar.org

সেখানেই তিনি স্থায়ী ভাবে থেকে যান। সাত চল্লিশের দেশ ভাগের পর নানান সুযোগ সম্মান লাভের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও আদর্শগত কারণে ওদুদ ঢাকা তথা পাকিস্তানে ফিরে আসেন নি। জানা যায়, সে সময় পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান তাঁকে ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন; এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলীকে মন্ত্রী মহোদয় জানাতে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি (ওদুদ) যদি পাকিস্তানে আসেন তা হলে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু ওদুদ রাজি হন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর সাহিত্য-সাধনা ও স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্র তাঁর নিরাপদ স্থান নয়। ওদুদের পক্ষে পাকিস্তান যে গোরস্থানে পরিণত হতো তার প্রমাণ পেতে বেশি দিন লাগে নি; ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক বক্তৃতায় বলেন, "সোজাসুজিভাবে আমি একথা আপনাদের বলতে চাই যে আপনাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট ও বিদেশীদের সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্ট আছে এবং এদের সম্পর্কে সাবধান না হলে আপনারা বিপদগ্রস্ত হবেন।"

কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন। এরপর থেকে তিনি কলকাতার তারক দত্ত রোডের বাড়িতেই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়েছেন। নেপশনের পর 'কমিউট করে সে টাকায়' বাটিকাকে বানিয়েছিলেন। আশা ছিল সেখানেই প্রিয়তমা স্ত্রীর সান্নিধ্যে সাহিত্য সাধনার পরিকল্পিত পথে জীবনের বাকি দিনগুলো আনন্দে অতিবাহিত করবেন। কিন্তু ১৯৫৫ সালে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি অনেকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তবুও তাঁর জীবনের মহৎ আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে নিঃসঙ্গতা থেকে কিছুটা মুক্তি দিয়েছিল। দেশ ভাগের পর কলকাতা থেকে আবুল ফজলের কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি 'হযরত মোহাম্মদ (দঃ), গ্যেটে আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনটি বই' লেখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। জীবনের শেষ দুই দশকে তিনি উক্ত কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, অধিকন্তু তিনি দুখণ্ডে 'পবিত্র কোরআনে'র অনুবাদ করেন; 'বাংলার জাগরণ' এবং 'শরৎচন্দ্র ও তাঁরপর' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। এছাড়া তাঁর 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' শীর্ষক অভিধানও এ সময়ে প্রকাশিত হয়। এভাবে ১৯৬৬ সালের মধ্যে তিনি তাঁর সাহিত্যিক কৃত্য অনেকটা সম্পাদনা করেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ে। রক্তের সম্পর্কের কেউ কাছে নেই। একমাত্র মেয়ে থাকেন, স্বামীর সঙ্গে ঢাকায়, এক ছেলে বোম্বাইতে কর্মরত অন্য ছেলে কানাডায়। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ওদুদ শারীরিকভাবে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। একা চলাফেরা করতে তাঁর অসুবিধা হতো। দু এক ভার পড়েও গিয়েছিলেন; তবে এসময় ছেলেমেয়েরা তাঁকে দেখতে আসতেন এবং বন্ধু-বান্ধব- প্রতিবেশীরাও তাঁকে নিকট আত্মীয়ের মতোই সেবাযত্ন করতেন। ১৯৬৯ সালের ২৯ মার্চ তিনি আবদুল কাদিরকে লেখেন 'বোঝা যাচ্ছে, সেরে যাওয়া যাকে বলে, তা আর আমার ক্ষেত্রে সম্ভবপর হবে না।' ১৯৭০ সালের ২৭ জানুয়ারিতে লেখা এক চিঠিতে তিনি আবদুল কাদিরকে লেখেন, 'মনে হচ্ছে শরীরটা এবার ব্যাধির কবল ' কে অনেকটা মুক্তি পাবে।'

www.nagorikpathagar.org

ওদুদের শেষ বয়সের কয়েকখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি তাঁর কন্যা প্রতিম সন্ধ্যা ঘোষকে দিয়ে তৈরি করেছিলেন। তাঁকে দিয়ে তিনি 'স্মৃতিকথা' রচনার কাজও শুরু করেছিলেন। তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন আর শ্রীমতী সন্ধ্যা ঘোষ তাঁর কথার প্রতিলিখন করতেন। এভাবে ৫ মে পর্যন্ত রচনা চলে। এর পরে তাঁর সেবা-যত্নের কিছুটা ত্রুটি ঘটেছিল। ফলে তাঁর রোগের প্রকোপ বেড়ে গিয়ে কয়েকদিন প্রায় অচেতন অবস্থায় ছিলেন। ১৯ মে ১৯৭০ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সে সময় তাঁর শয্যাপাশে ছেলেমেয়েরা কেউ ছিলেন না। ঢাকা থেকে তাঁর মেয়ে এসে উপস্থিত হন মৃত্যুর পঁচিশ মিনিট পরে। কালীপূজার চাঁদা চেয়ে নাকি তাঁর গতিরোধ করা হয়েছিল। মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ সৎকারের জন্য জীবন সায়াহ্নে পাওয়া পুরস্কারের টাকাটা ছিল একমাত্র সম্বল।[৩] আজহার উদ্দিন খান লিখেছেন, 'জীবনের উপান্তে শিশির কুমার পুরস্কার (১৯৭০) ছাড়া আর কোন পুরস্কার তাঁর কপালে জোটেনি। পুরস্কারের এক হাজার টাকার কিছু অংশ দান খয়রাত করেছিলেন, কিছু তিনি নিজের ঘোর-দাফনের জন্য রেখেছিলেন। তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন একথা জানতাম, কিন্তু তিনি যে এরকম নিঃস্ব ছিলেন আমরা কেউই তাঁর জীবতকালে জানতাম না, যদি না মৃতদেহ সৎকারের সময় অর্থের প্রশ্ন উঠত।'[৪] ১৯৭০ সালের ২০ মে বুধবার তাঁকে কলকাতার গোবরা গোরস্থানে প্রিয়তমা স্ত্রীর কবরের পাশেই দাফন করা হয়।

১.২ কাজী আবদুল ওদুদের রচনাবলি

কাজী আবদুল ওদুদের রচনার প্রধান অংশ প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্য। তবে জীবনচরিত গল্প উপন্যাস নাটক স্মৃতিকথা ইত্যাদিও তিনি রচনা করেছেন। 'ওদুদের প্রথম প্রকাশিত রচনা ছিল শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসের সমালোচনা। 'বিরাজ বৌ' (১৯১৭) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার (পৌষ-মাঘ ১৩২০) সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় এবং সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও স্যার জগদীশচন্দ্র ব্যতীত অন্য কেউ উপন্যাসটির আলোচনা-সমালোচনা করেন নি।'[৫]

সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে কথাশিল্পী হিসেবেই ওদুদের আত্মপ্রকাশ। তাঁর প্রথম বই একটি গল্প সংকলন, 'মীর পরিবার' প্রকাশ পায় ১৩২৫ সালে (ইং ১৯১৮)। এর পরের বই একটি উপন্যাস, নাম নদীবক্ষে (১৯১৯)। 'মীর পরিবার' শরৎচন্দ্রের ও 'নদীবক্ষে' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিল। এরপর তাঁর আরো দুটি গল্প-সংকলন ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে 'তরুণ' (১৩৫৯) ও 'আজাদ' (১৯৪৮)। ওদুদ নাটক ও রচনা করেছেন। গল্প-সংকলন 'তরুণ'-এ 'মানব-বন্ধু' নামে একটি নাটিকা অন্তর্ভুক্ত হয়। 'পথ ও বিপথ' নামে তাঁর একটি নাট্যধর্মী রচনা প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালে। তাঁর কাব্যচর্চার নিদর্শন মেলে 'নবী-প্রশস্তি', 'দুদিনে' ও 'সুভাষচন্দ্র' শীর্ষক কবিতায়। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর আরো কিছু কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই হলো ওদুদের সৃষ্টি-ধর্মী শিল্পকর্মের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান। তাঁর গল্প-উপন্যাস সেকালে কিছু মনোযোগ ও প্রশংসা পেলেও তাঁর নাটিকা বা কবিতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর রচনা।

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতপক্ষে ওদুদের মেধা, প্রতিভা, প্রকৃতি ও প্রবণতা মননধর্মী রচনাই একান্ত উপযোগী ছিলো।

লেখক হিসেবে আবদুল ওদের প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি মূলত তাঁর প্রবন্ধ সমালোচনার জন্যে। তাঁর মননচর্চা সমাজচিন্তা ও সাহিত্য বিবেচনা এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে প্রকাশ হয়েছে। সমাজ-সমস্যার গভীরে তাঁর মরমী ও সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। তমসাপীড়িত সমাজের বিবরে আলো ফেলেছেন। স্বসমাজের মূর্খতা অজ্ঞতা মোচন করে জড় সমাজকে চালষ্ণু করতে চেয়েছেন। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করতে গিয়ে যুক্তি ও বিবেচনার আয়ুধ নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতা ও বৈরিতায় বিপর্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু পরাভব মানেননি। তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে মূলত তাঁর চিন্তামূলক মননধর্মী সমাজ'-কে আশ্রয় করে যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন চেতনার ক্ষেত্রে এই সংগঠন ও গোষ্ঠীর অবদান কম নয়।৬ সব মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার (রচনার প্রকৃতি অনুসারে) তালিকা নিম্নরূপ :

উপন্যাস-নাটক :

১. মীর-পরিবার (গল্প-সংকলন) : ১৯১৮, কলিকাতা।
২. নদীবক্ষে (উপন্যাস) : ১৯১৯, কলিকাতা।
৩. পথ ও বিপথ (একাঙ্ক নাটক) : ১৩৪৬, কলিকাতা।
৪. আজাদ (উপন্যাস) : ১৯৪৮, কলিকাতা।
৫. তরুণ (গল্প ও নাটিকা সংকলন) : ১৩৫৫, কলিকাতা।

প্রবন্ধ-সমালোচনা লিখিত ভাষণ

১. নব পর্য্যায় (প্রবন্ধ সংকলন) : ১৩৩৩, কলিকাতা।
২. রবীন্দ্রকাব্য পাঠ (সমালোচনা) : ১৩৩৪, কলিকাতা।
৩. নব পর্য্যায় (প্রবন্ধ সংকলন) : ২য় সংকলন : ১৩৩৬, কলিকাতা।
৪. সমাজ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ-সংকলন) : ১৩৪১, কলিকাতা।
৫. হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ (নিজাম বক্তৃতা) : ১৩৪২, কলিকাতা।
৬. আজকার কথা (প্রবন্ধ-সংকলন) : ১৩৪৮, কলিকাতা।
৭. নজরুল-প্রতিভা (সমালোচনা) : ১৯৪৯, কলিকাতা।
৮. Fundamentals of Islam (বক্তৃতা) : ১৯৫০, কলিকাতা।
৯. স্বাধীনতা-দিনের উপহার (প্রবন্ধ-কবিতা-সংকলন) : ১৯৫১, কলিকাতা।
১০. শাশ্বত বঙ্গ (নির্বাচিত সংকলন) : ১৩৫৮, কলিকাতা, ১৯৫১
১০.১ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ
১০.২ রস ও ব্যক্তিত্ব
১০.৩ শতবর্ষ পরে রামমোহন
১০.৪ ইকবাল

www.nagorikpathagar.org

১০.৫ সংস্কৃতি কথা

১০.৬ নজরুল ইসলাম

১০.৭ গ্যেটে

১০.৮ বাঙ্গলার জাগরণ

১০.৯ কোরআনের আল্লাহ

১০.১০ সম্মোহিত মুসলমান

১১. বাংলার জাগরণ (লিখিত অভিভাষণ) : ১৩৩৬, কলিকাতা।

১২. State and Literature (বক্তৃতা) : ১৯৫৭, কলিকাতা।

১৩. শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর (শরৎস্মৃতি বক্তৃতামালা) : ১৯৬১, কলিকাতা।

১৪. Tagore's Role in the Reconstruction of Indian thought (লিখিত ভাষণ) : ১৯৬১, আহমেদাবাদ।

১৫. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (সমালোচনা), প্রথম খণ্ড, ১৩৬৯, কলিকাতা।

১৬. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (সমালোচনা), ২য় খণ্ড : ১৩৭৬, কলিকাতা।

জীবনীসাহিত্য ও বিবিধ রচনা

১. কবিগুরু গ্যেটে (জীবনী ও সাহিত্য-পরিচয়), ১ম খণ্ডঃ ১৩৫৩, কলিকাতা।

২. কবিগুরু গ্যেটে (ঐ) ২য় খণ্ড : কলিকাতা

৩. Creative Bengal (নির্বাচিত অনুবাদ) : ১৯৫০, কলিকাতা।

৪. হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম (জীবনী ও ইসলাম প্রসঙ্গ) : ১৩৭৩, কলিকাতা।

৫. পবিত্র কোরআন (অনুবাদ), ১ম ভাগ : ১৩৭৩, কলিকাতা।

৬. পবিত্র কোরআন (ঐ), ২য় ভাগ : ১৩৭৪, কলিকাতা।

৭. ব্যবহারিক শব্দকোষ (অভিধান), দুই খণ্ড, ১৩৬০, কলিকাতা।

৮. একজন খাটিয়ে সাহিত্যের কথা (অসমাপ্ত আত্মকথা) অপ্রকাশিত।

৯. নানা কথা (দিনলিপি) : ১৩৯৭, ঢাকা।

১০. দেশের দুঃখ (সৈয়দ গোলাম হোসেন খান রচিত সিয়ার-উল-মোতা খেরীন গ্রন্থের অনুবাদ), বুলবুল পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

পাঠ্য পুস্তক

১. প্রবেশিকা (স্কুল পাঠ্য) : ১৯৩২, ঢাকা।

২. সোপান (ঐ) : ১৯৩৪, ঢাকা।

৩. সুকুমার পাঠ (ঐ) : ১৯৩৫, ঢাকা।

৪. মক্তব্য সাহিত্য (ঐ) : ১৯৩৬, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

২.১ মূল বক্তব্য

২.১.১ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

শিল্পে ও সাহিত্য সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদের ধারণা যে কত স্বচ্ছ ছিল 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উত্তরাধিকার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন কালিদাস প্রীতি। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দুই ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় কালিদাসের সশ্রদ্ধ, উল্লেখ আছে। তবু বলা যায়, তাঁর কালিদাস চর্চা পারিবারিক ঐতিহ্যের ফল নয়। তাঁর গভীর কালিদাস প্রীতির মূলে আছে প্রতিভার স্বধর্ম। কালিদাস ও বরীন্দ্রনাথ 'দুইকালের দুই মহাভাবুক ও মহাশিল্পী'। তবু যুগধর্মের কারণে রবীন্দ্রনাথ একালের বাঙালির কাছে অধিকতর প্রেয়। এ-সম্পর্কে ওদুদ এ প্রবন্ধে বলেছেন :

'বরীন্দ্রনাথ যেন সেকাল ও একালের মধ্যবর্তী সেতু। তাঁর আদর্শ যে কালিদাসের আদর্শের চাইতে ব্যাপকতর। একালের মানুষের জন্য বেশী সত্য ও সার্থক, তা সহজেই বোঝা যায়, কেননা একালের মানুষের চিন্তায় বড় ব্যাপার কোনো ধরনের 'মরমী' সাধনা তেমন নয় যেমন বিকাশধর্মী মানবতা।'

কালিদাস আজ অতীত হয়েও কালজয়ী মহিমায় মন্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বলে কালিদাসের মত সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকবেন–যদিও রসবোধের দিক থেকে এই দুই কবির পার্থক্য অনস্বীকার্য-কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। কালজয়ী কাব্য-ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে তিনি এই দুই কবির মধ্যে যে মৌলিক সাদৃশ্য উপলব্ধি করেছেন তা উদ্ধৃতি যোগ্য–

'কালিদাসের রচনায় রয়েছে অপূর্ব লালিত্য ও গাম্ভীর্য; রবীন্দ্রনাথের রচনাও তুল্যরূপে ললিত ও গম্ভীর। হয়তো এক্ষেত্রে কালিদাসই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পথ প্রদর্শক। কিন্তু বিদ্যা এক্ষেত্রে যোগ্য শিষ্যে ন্যস্ত হয়েছিল।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতা তিনি স্বীকার করেছেন। সে শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাঁর সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর অন্তরাত্মাকে তিনি যে পরম মোহন রূপে সৃষ্টি করেছেন সেখানেই তাঁর অনন্যতা-এই তাঁর বিশ্বাস।

উভয়ের সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। দুই কবিই পৃথিবীর শোভা-সৌন্দর্যের একান্ত অনুরাগী। বিশেষত, দুই কবির চোখেই পৃথিবীর মহিমা যেন অন্য নিরপেক্ষ–পৃথিবীর যিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা তাঁর কথা অনেকখানি বিস্মৃত হয়ে, এঁরা উপভোগ করেছেন পৃথিবীর শোভা-সৌন্দর্য। অন্যদিকে তাঁদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো–কালিদাস যথেষ্ট ভোগবাদী আর রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী। প্রাবন্ধিকের মতো; 'কালিদাসের সৌন্দর্যবোধ ও সরবোধের সূক্ষ্মতর, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধ।' কালিদাসের ভোগবাদ রবীন্দ্রনাথ যেন সজ্ঞানে শোধিত করে নিয়েছেন। অবশ্য প্রাবন্ধিক এও বলেছেন যে, কবি কালিদাস ভোগবাদী হয়েও আশ্চর্যভাবে ত্যাগবাদী। প্রকৃত মহত্ত্বের ছবি আঁকতে কালিদাস ও অকৃপণ। ভরত, রাজ্যলোভী না হয়ে রামের অনুপস্থিতিকালে দীর্ঘকাল রাজ্য পরিচালনা করেন। এজন্য কালিদাস তাকে

www.nagorikpathagar.org

বলেছেন, 'অসিধার ব্রত' অভ্যাসকারী প্রিয়ং 'যুবাপ্যঙ্কগতাম-ভোক্তা' অর্থাৎ অঙ্কগতা স্ত্রীকে যুবক হয়েও তিনি ভোগ করেননি। বস্তুত কালিদাসের দৃষ্টিতে সংসার ও সন্ন্যাস যেন দুই স্বতন্ত্র জগত। একটি সম্পূর্ণ বর্জন করে তবেই যেন অন্যটিতে যাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ তো সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।'

কালিদাস যেন বলতে চান, যতদিন মানুষ সংসারে আছে ততদিন সে মুখ্যত ভোগবাদী। কিন্তু কীর্তিমানরাও জীবনের কোন এক সময় ভোগ, যশ ইত্যাদির কথা বিসর্জন দিয়ে রত হন যোগে-আত্মায় পরমাত্মা দর্শনের ব্রতে।[৯] এ আত্মায় পরমাত্মাদর্শনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তরূপে কালিদাস এঁকেছেন কৈলাসে ধ্যানরত মহাদেবের মূর্তি:

মনো নবদ্বারনিষিদ্ধ বৃত্তি হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্। যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্য বলোকয়ন্তম্।।

[অর্থাৎ সংযমী মহাদেব দেহের নবদ্বার হইতে নিবৃত্ত সমাধিনিয়ন্ত্রিত মন হৃদয়-অধিষ্ঠানে স্থাপিত কারিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগণ যাহাকে অবিনাশী বলিয়া জানেন সেই আত্মাকে স্বীয় আত্মার মধ্যে অবলোক করিতেছেন।-কুমার সম্ভব, তয়সর্গ]

প্রাবন্ধিকের মতে, কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার তফাৎ এই যে 'রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত গুহ্যসাধনাবাদী মরমী নন, 'বিকাশধর্মী মানবতা পন্থী ভগবানে বা পরমাত্মায় তাঁর যতখানি আনন্দ তার চাইতে হয়ত তাঁর বেশী আনন্দ মানুষের জাগতিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনায়।'

২.১.২ রস ও ব্যক্তিত্ব

'রস ও ব্যক্তিত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ রসোত্তীর্ন রচনাকেই 'সত্যকার সাহিত্য' বলে অভিহিত করেছেন। আর রস বলতে তিনি বুঝেছেন 'মানুষের মনের বিশেষ ও গভীর অনুভূতির পরিচয়'। কিন্তু আধুনিক যুগে রসচেতনার সঙ্গে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ও পাঠক সমাজ কামনা করে। অর্থাৎ রস ও ব্যক্তিত্ব এই দুয়ের মিলনে আধুনিক কালে সাহিত্য-উপলব্ধির পূর্ণতা ঘটে।[১০] রসোত্তীর্ণতাই সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান শর্ত। অবশ্য সব শিল্প মাধ্যম সম্পর্কেই এ কথা বলা যায়। তবে শিল্প বা সাহিত্যকে রসোত্তীর্ণ হতে গেলে যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য তাঁর সাহিত্য-কর্মের সঙ্গে যুক্ত না হলে তা রসোত্তীর্ণ হতে পারে না। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর এ প্রবন্ধে সাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের বিশেষত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ব্যক্তিত্বের সজীবতা সাহিত্যের প্রানশক্তি। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হয়েছে। 'বাক্যং রসাত্মক কাব্যম' অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। ওদুদ রেনেসাঁসীয় চেতনায় সাহিত্যে প্রচলিত রসের নিষ্পত্তির সাথে ব্যক্তিত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন :

'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম, আর সাহিত্য ব্যক্তিত্বের বাণীরূপ–সাহিত্যের এই দুই সংজ্ঞাই আজ আমাদের জন্য মহামূল্য।'

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্য মহৎ ব্যক্তিত্ব সহজলভ্য নয়। এ কারণেই সাহিত্যকর্মে সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা প্রকরণকৌশলকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। রস সাহিত্যকে মনোগ্রাহী করে তোলে। কিন্তু ওদুদ সাহিত্যে 'মনোহারিতা'র সঙ্গে মহাপ্রাণতা' চান। সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সাহিত্যকে রসময় করা কিন্তু মহৎ ব্যক্তির সপ্রাণতা না থাকলে সাহিত্য মহৎ হয়ে ওঠে না। রস সৃষ্টির চেয়ে সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি আধুনিক সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের গভীর সংস্পর্শ না পেলে সাহিত্যে মহাপ্রাণতা আসে না। কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন:

'রস যত মনোহর হোক একালে আমাদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে সাহিত্যে ও শিল্পে ব্যক্তিত্বের দ্বারা, এমনকি, সাহিত্য ও শিল্পের সমস্ত মাধুর্যের সমস্ত কলা কৌশলে ব্যক্তিত্বের স্পর্শটুকু আবিষ্কার করতে না পারলে আমাদের শিল্প ও সাহিত্য উপভোগ আজ আর পূর্ণাঙ্গ হয় না।'

সাহিত্য রসের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত করে ওদুদ সাহিত্যিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মত মেনে নিয়েও তিনি নিজস্ব অভিমত উপস্থাপন করেছেন। সাহিত্যে শতাব্দী বাহিত রস নিষ্পত্তি এবং ব্যক্তিত্বের মহৎ ও প্রাণময় উপস্থিতি ওদুদের ব্যতিক্রমধর্মী আধুনিক সাহিত্যাদর্শের পরিচয়কেই চিহ্নিত করে।[১১]

২.১.৩ শতবর্ষ পরে রামমোহন

'শতবর্ষ পরে রামমোহন' প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ 'বাংলায় বা ভারতে' 'মহাগৌরবময় যুগের প্রবর্তয়িতা' অতন্দ্রিতা' 'অতন্দ্রিত জ্ঞান ও লোকশ্রয়ের পথের মহাপথিক রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। প্রবন্ধটি তিনি ১৯৪৯ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে পড়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ইতঃপূর্বে আরো কয়েকটি প্রবন্ধে যে ওদুদ রামমোহনকে নিয়ে ভেবেছেন সেক্ষেত্রে রামমোহন চর্চা অব্যাহত থেকেছে। বর্তমান প্রবন্ধে ওদুদ সদ্য স্বাধীন দেশের সামনে রামমোহনের নির্দেশের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,-'তাঁর নির্দেশ এই ঃ (ক) পৌরাণিক দেবদেবীর আরাধনার পরিবর্তে উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মার উপাসনা ও যুক্তি-যুক্ত কল্যান-কর্মের অনুষ্ঠান; (খ) প্রাচীন শাস্ত্র অশ্রদ্ধেয় নয় কিন্তু তার ব্যাখ্যা করতে হবে বিচার বুদ্ধি ও লোকশ্রেয়ের আলোকে-অনিষ্টকর আচবার প্রাচীন হলেও বর্জনীয়।'

রামমোহনের এই নির্দেশের প্রতিক্রিয়া দেশের শিক্ষিতদের ওপর দ্বিমুখী প্রভাব ফেলে বলে ওদুদ মনে করেন 'তাঁর মতে, তন্মধ্যে তাঁর বিরোধীরাই সংখ্যায় বেশি–যাঁরা বলেন 'চিরাচরিত আচার বিসর্জন সম্ভবপর নয়'; আর যাঁরা রামমোহনের অনুরাগী তাঁরা লোকশ্রেয়ে আনুগত্য ব্যতিরেকেই তাঁরা ভগবদ্‌ভক্তির আতিশয্যে মেতে উঠলেন; অথচ রামমোহনের 'ব্রহ্মানুরাগের সঙ্গে লোকশ্রেয় নিত্যযুক্ত'।

ওদুদ রামমোহনের পরবর্তী সাধক রাম কৃষ্ণের 'অচলা ভক্তি', বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণ', বঙ্গিমচন্দ্রের হিন্দুত্বের নবসংস্থাপন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখীতা, গান্ধীর সত্যপ্রীতি ইত্যাদি আলোচনা করে দেখান যে এঁদের সাধনার যথা মর্ম অনুধাবনে অধিকাংশ অনুরাগীই ব্যর্থ হন। তাই তাঁরা রামকৃষ্ণের 'অচলা-ভক্তি'র স্থানে নতুন করে

www.nagorikpathagar.org

সনাতন ধারায় প্রতিষ্ঠা নেন; বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণ' পঞ্চাশের মন্বন্তরে নিঃশেষই হলো; আর অনুরাগীরা বঙ্কিমকে দেখলেন 'হিন্দুত্বের নব সংস্থাপক রূপে-তাঁর হিন্দুত্বের অন্তরে যে ছিল সুনিবিড় মানবিকতা, সুগভীর ধর্মবোধ সে-সব তাদের দৃষ্টিতে এলো না; 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখীতার অর্থ যে সত্যমুখীতা, প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড় মৈত্রী-বন্ধন, মানুষের জন্য সুগভীর, কল্যাণ-কামনা' সে-সব তাঁদের চিন্তায় অর্থপূর্ণ হলো না এবং গান্ধীজীর 'অপূর্ব সত্যপ্রীতি, মানবপ্রীতি, জীবপ্রীতি তাঁর অনুরাগীদের অনুধাবনের বিষয় হলো না এই আব্দুল ওদুদ স্মরণ করেন মহামতী কবীদের বাণী–যেখানে দেশের হিন্দু ও মুসলমানের সৎমতি আনতে ব্যর্থ হয়ে কবী বলেছিলেন,

হিন্দু পূজে দেবতা
তুর্ক কাহু না হোঈ

ওদুদের মতে, বর্তমান জগতে মানুষের ভেতরকার আদিম বর্বর প্রবৃত্তি- ভোগও প্রাধান্য-স্পৃহা, চক্রান্ত, জিঘাংসা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে; তাই আত্মা' 'সত্য' এ সব বাদ দিয়ে দেহই তাদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কিন্তু আমরা যারা বিশ্বাস করি আত্মা, অর্থাৎ মনোজীবন, যদি সক্রিয় না হয়, সত্য যদি সম্পূজিত না হয়, তবে কোনো প্রাচুর্যেই মানুষের কল্যাণ নেই'। লোকশ্রেয়ের পথের পথিক রামমোহনের স্মরণ দিনে ওদুদ তাই অন্তরাত্মাকে সক্রিয় করে' তোলার আহ্বান জানান।' আর এর অর্থ হলো সংকীর্ণ স্বধর্ম অভিমান চরিতার্থতার পরিবর্তে সত্যপ্রীতির ও সর্বমানব প্রীতির বন্ধনে গূঢ়ভাবে আবদ্ধ হওয়া। এর অভাবেই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীজীর বিপুল অনুরাগী তাঁদের তপস্যা সক্রিয় করতে পারেন নি বলে ওদুদ মনে করেন। ওদুদ বলেন, শুধু স্বধর্ম–অভিমান কেন, 'স্বদেশ প্রীতির মতো মূল্যবান ভাবও মানুষকে সত্যকার কল্যান-পথে বেশি দূরে এগিয়ে নিতে পারে না যদি সেই স্বদেশ-প্রীতি গূঢ়ভাবে যুক্ত না থাকে সত্য-প্রীতি সর্বমানব-প্রীতির সঙ্গে। রামমোহনের নিরাকার পরমব্রহ্ম ও লোকশ্রেয়ের সাধনা স্বরূপত অতন্দ্রিত সত্য কল্যাণ-সাধনা, কোনো মোহকেই তা প্রশ্রয় দে না–না সাম্প্রদায়িক মোহকে, না অতীতের মোহকে, না অতি-প্রাকৃত মোহকে, জড়বাদ ও ভোগবাদের অন্ধতাকে ত নয়ই–তাই বহু পুরাতন ও বহু নূতন ভারতীয় জীবনের সার্থক নেতৃত্বের অধিকার তাঁরই। সদ্য স্বাধীন দেশের সম্মুখে রামমোহনের এই নেতৃত্বের অধিকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে ওদুদ মূলত জাতিকে দিক নির্দেশনাই দিয়েছিলেন। সে নির্দেশনায় শুধু ভারতবাসী কেন, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতিই পথের দিশা পেতে পারে।[১২]

২.১.৪ ইকবাল

"ইকবাল" প্রবন্ধটি কাজী আবদুল ওদুদ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে রাজশাহী কলেজের ইকবাল স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে রচনা করেছিলেন। এ প্রবন্ধে তিনি ইকবালের উপর জার্মান দার্শনিসক নাট্‌শে ও জার্মান কবি গ্যেটের প্রভাব আলোচনা করেচেন। হজরত মোহম্মদ (সঃ) ও তাঁর চিন্তা চেতনায় বিশেষ ভাবে সক্রিয় ছিল এ কথাও তিনি স্বীকার

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। এছাড়াও সর্ব ধর্মের যে মূল কথা-জীবনের ঊর্ধ্বমুখীতা এবং সেই জন্য আমিত্বের সাধনা-তাতে ইকবাল যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন। ওদুদ ইকবালের খুদী-তত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) বা আমিত্বতত্ত্ব আলোচনা করে এ ব্যাপারে তাই তাঁর মতামত জানিয়েছেন।

ইকবালের 'আস্‌বার-ই-খুদী' নামক ফার্সি কাব্যে এই 'আমিত্ব' তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। Reynold A Nicholson 'Secrets of the self' নামে গ্রন্থটির একটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করেন। 'আসরার-ই-খুদী' প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে। ইতঃপূর্বে ইকবাল ইউরোপে যান এবং কেম্ব্রিজ ও ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেন। ওদুদ বলেন ঃ

'ইয়োরোপে গিয়ে মুসলমান- দেশসমূহের দুর্দশা ও বিপদ সম্বন্ধে তিনি বেশী সচেতন হন ও স্যার আবদুল্লাহর সুহরাওয়ার্দি প্রভৃতির সঙ্গে Pen-Islam Society গঠন করেন।–দেখা যাচ্ছে ভারতের দুর্দশা, আর বিশেষ করে মুসলমান-দেশসমূহের বিপদ, তাঁকে পরিচালিত করেছে তাঁর বিপদ, তাঁকে পরিচালিত করেছে তাঁর আমিত্ব তত্ত্বের পানে। একালের মুসলমান চিন্তাশীলদের মধ্যে সৈয়দ জামালুদ্দীন আফ্‌গানীর কাছে তিনি বিশেষ ভাবে ঋণী। আফগানী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক। ধ্বংসশীল মুসলিম জগতের কানে তিনি দেন বিজ্ঞান অনুশীলনের ও রাষ্ট্রশক্তি লাভের মন্ত্র। তাঁর মন্ত্র মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে ফলপ্রসু হয়েছে। কিন্তু এই মনীষী প্রধানত গ্রহণ করেছিলেন রাজনৈতিক প্রচারের ব্রত। ইকবাল আরো গভীর করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন মুসলমানের পতনের কারণ। তিনি বুঝলেন তাদের পতনের মূলে সূফীমতের আত্ম বিসর্জন ও বৈরাগ্যবাদ–সেই আত্মবিসর্জন ও বৈরাগ্যবাদ পরিহার করে তাদের হতে হবে আত্মবিকাশশীল ও সংসারে বরেণ্য।'

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মনে করেন, বাস্তবিকই 'আস্‌রার-ই-খুদী' ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব-যাতে ইকবাল সুফীদিগের নিষ্ক্রিয়বাদকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছেন এবং পূর্ণ মনুষ্যের পরিচয় প্রদান করেছেন আর হজরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁর কাছে পূর্ণ মনুষ্যের আদর্শ রূপে গৃহীত।[১৩] এ কাব্যে ইকবালের সুফীবাদ বিরূপতার কথা ড. নিকলসনও বলেছেন।[১৪] নিকলসনের অনুরূপ ওদুদ ও ইকবালের খুদীতত্ত্বে জার্মান-দার্শনিক নীটশের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। তবে ওদুদের মতে, ইকবালে শক্তিবাদ নীটশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও এর লালনে বিশেষ সাহায্য করেছেন গ্যেটের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারা। তাঁর মতে, মানুষের আমিত্ব যে বিসর্জনের সামগ্রী নয়, লালনের ও বিকাশের সামগ্রী তা গেট্যের বহু লেখায় ও ব্যক্তিত্বে প্রকাশিত। ওদুদ বলেন ঃ

"হজরত মোহাম্মদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর এক সঙ্গী বলেছেন যে, তাঁর মুখের পানে তাঁরা চাইতে সাহস করতেননা।–আমাদের মনে হয়েছে হজরত মোহম্মদের যে বিখ্যাত বাণী "আল্লাহর গুণে বিভূষিত হও" আর মনসুর হাল্লাজের যে বিখ্যাত উক্তি "আ'নাল্ হক্" (সোহহম), এ-সবের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইকবালের নীট্‌শে-গ্যেটে-অনুপ্রাণিত ও লালিত শক্তিবাদ, আর শেষে তাঁর অবলম্বন হয়েছে হজরত মোহম্মদ, তাঁকে তিনি বলেছেন–"ইনসান-ই-কামেল"-পূর্ণ মানুষ-Superman." ওদুদ দার্শনিক-কবি ইকবালের 'বিকাশের তাড়নায় চঞ্চল' আমিত্বের সাধারণ প্রশংসা করে বলেছেন

www.nagorikpathagar.org

এশিয়া-আফ্রিকার সব চাইতে বড় প্রয়োজন যেটি সেটি হচ্ছে তার জড়তা-বিসর্জন আর প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দরতর মহত্তর করবার আগ্রহ; সেই আগ্রহ ইকবালের কাব্যে ধারণ করেছে এক প্রবল অগ্নিশিখার মতো মোহন রূপ, তাই তিনি যে এক যুগের তরুণ সমাজের-আপাতত মুসলিম, তরুণের-প্রাণের মানুষ হয়েছেন, এ অনেকটা অপরিহার্য।[১৫] সে হিসেবে, বাঙালি মুসলমান তরুণদেরও তিনি অপরিহার্য প্রাণের মানুষ।

কিন্তু সে পর্যন্তই। এর বাইরে ইকবালের আমিত্ব-সাধনার যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক-নির্দেশিকা, তার সঙ্গে ওদুদের মূলগত মত-পার্থক্য রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। কারণ ইকবাল বিশ্বাস করতেন প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর ও কাম্য, অপরদিকে ওদুদের ধারণায় তা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ওদুদ বলেন ঃ

"সে জন্য কবি ইকবালের সঙ্গে তুলনায় চিন্তানেতা ইকবাল আমার কাছে কিছু স্বল্পমূল্য এবং আমার এমন আশঙ্কাও আছে যে চিন্তানেতা নীট্‌শে যেমন পরোক্ষভাবে ইয়োরোপের বর্তমান ধ্বংসলীলার কারণ হয়েছেন তেমনি ইকবালের চিন্তাধারারও এমন অপব্যাখ্যা সম্ভবপর-এমন অপব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা হয়েছে-যার ফলে তাঁর মনুষ্যত্ব ও প্রতিভা তাঁর স্বদেশীয়দের আনন্দের কারণ না হয়ে দুঃখের কারণ হতে পারে দীর্ঘদিনের জন্য। ...ইকবাল অর্থপুর্ণ প্রভাবকে এই অবাঞ্ছিত পরিণতি থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক চিন্তাশীল কর্মীর কর্তব্য; তাঁর ভক্তদের উপরে তো এই দায়িত্ব বিশেষ ভারেই ন্যস্ত।"

বাঙালি মুসলমান সমাজে ইকবাল-ভক্তদেরও তিনি এ দায়িত্ব থেকে বাদ দেন নি। আর ওদুদের আশঙ্কার পরিণাম যে উপমহাদেশে কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।[১৬]

সবশেষে ইকবালের ইউরোপ-বিমুখতা সম্পর্কে ওদুদের মন্তব্য হলো ঃ 'সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অকুণ্ঠিত মানব-কল্যাণ-জিজ্ঞাসা মানুষে জন্য শ্রেষ্ঠ আত্মিক সম্পদ,-প্রাচ্যের আমিত্ব সাধনের বা প্রশান্তি সাধনের চাই তার পরিপূরক-প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।'

কাজী আবদুর ওদুদ ইকবালের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতার অভাব এবং প্রাচ্য প্রীতির আধিক্য লক্ষ্য করেছেন। তিনি মনে করেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও অকুণ্ঠিত মানব-কল্যান-জিজ্ঞাসার সঙ্গে প্রাচ্যের আমিত্ব সাধনের বা প্রশান্তি সাধনের সমন্বয় হলে তবেই মানুষের আত্মার প্রসার ঘটা সম্ভব।

২.১.৫ সংস্কৃতির কথা

'সংস্কৃতির কথা' প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদের সংস্কৃতি চিন্তার ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছে। এখানে তিনি সংস্কৃতির সংজ্ঞা দান করেছেন-মুসলমান সমাজ কিভাবে সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে তা বর্ণনা করে এবং কিভাবে গ্রহণ করলে তাদের জন্য মঙ্গল হত তার উল্লেখ করে। এ প্রবন্ধে ওদুদ ১৯৪১ সালে বলেছেন,-ভারতবর্ষের এ কালের সংস্কৃতিক চিন্তার

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসে বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র ও পাঞ্জাবের ইকাবলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এঁদের চিন্তায় সনাতন স্থিতিশীলতার সঙ্গে কিছু গতিশীলতা মিশেছে, তা-ই হয়ত তাঁদের জনপ্রিয়তার রহস্য। কিন্তু ওদুদের মতে, "সেকালের ধর্মের মতো একালের সংস্কৃতিরও মূল কথা হওয়া চাই সামাজিক উৎকর্ষ লাভ। আর যেহেতু সমাজের অর্থ একদিকে বিশ্বমানব-সমাজ অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ দেশগত বা রাষ্ট্রগত সমাজ, সে জন্যে সংস্কৃতিও মূলত বিশ্বসামাজিক ও রাষ্ট্রিক। অন্য কথায়, যে চিন্তা জগতের অনেকের মনে অনুরণ জাগায় না এবং যার রাষ্ট্রিক সার্থকতা কম তা বাস্তবিকই স্বল্পমূল্য"। সে দৃষ্টিতে হিন্দু সংস্কৃতি মুসলিম-সংস্কৃতি আর্য সংস্কৃতি ইত্যাদির মূলেও সুচিন্তা কার্যকরী বলে ভাবা যায় না। তাই হিন্দু ও মুসলমানের রাষ্ট্রিক জীবন যদি সম্মিলিত হয় তবে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনও অভিন্ন হবে, তা না হলে সংস্কৃতির যে একটি প্রধান লক্ষ্য সামাজিক অর্থাৎ রাষ্ট্রিক উৎকর্ষ লাভ তাই ব্যাহত হবে।[১৬]

ওদুদের কাছে সংস্কৃতি দেখা দিয়েছে অতীতের শ্রেষ্ঠ ভাব সম্পদের সমাহার হিসেবে। বিশ্বের সমন্বিত জ্ঞান ও কল্যাণ অন্বেষা সংস্কৃতির অন্তর্গত। সেদিক থেকে সংস্কৃতির প্রসঙ্গে বিশ্বজনীনতার কথা তোলা হয়। ওদুদ মনে করেন চিন্তা সব সময়ই বিশ্বজনীন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ নানা কারণে একে অপরের কাছাকাছি এসেছে। চিন্তার ক্ষেত্র নতুন নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। মানুষ জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে নতুন ভাবনাকে মনে স্থান দেয়:

'সংস্কৃতি মানুষের সৌখীন পোশাক-পরিচ্ছদ নয়, তা তার জীবন-যুদ্ধের অস্ত্র-আর অস্ত্রের প্রাচীনতাই তার গৌরবের বিষয় নয়।'

ওদুদ জীবনচর্চায় প্রগতিশীল, চিন্তাচর্চা, জ্ঞানের সমন্বয়, সংস্কৃতি জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিবেচনাশীল। তিনি প্রাচীন ঐতিহ্য বিবেচনার মাধ্যমে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। ঐতিহ্যের সঙ্গে মানব কল্যাণ সংযুক্ত। যুগসংক্রান্তির এবং সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রাচীন চিন্তাকে ওদুদ যুগোপযোগী করতে প্রয়াসী। পুরনো ঐতিহ্য কালোপযোগী না হলে ওদুদ তাকে অচল ও অগৌরবের বলে চিহ্নিত করেন।

সংস্কৃতি বলতে ওদুদ সুন্দরের সাধনা বুঝতেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাদের ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রবণতা আছে, তারা ভদ্রলোক হওয়া কিংবা একটি ভদ্র পরিবার গড়ে তোলাকেই সৌন্দর্য ভাবতে পারেন। উন্নত, পরিস্রুত জীবনচেতনার সাথে সংস্কৃতি সম্পৃক্ত। কিন্তু এই সংস্কৃতিবান, ভদ্রোচিত পরিবার গড়ে তোলাই সংস্কৃতির মূল তাৎপর্য নয়। ওদুদ মনে করেন, সুন্দর কেবল মোহকর নয়, তাকে অবশ্যই সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। সত্য ও কল্যাণ প্রচেষ্টার সাথে যারা যুক্ত তারাই সার্থকতার দিকে অবিযাত্রা করে:

'সত্যাশ্রয়িতা, অর্থাৎ সত্য উপলব্ধির চেষ্টা আর সার্থক হবার আকাঙ্ক্ষা, যাঁদের অন্তরের ধর্ম নয় তাঁরা জ্ঞানী ও নন কর্মীও নন।'

বুদ্ধিমান অথচ দ্বিধান্বিত ব্যক্তি সংস্কৃতিমনস্ক হতে পারেন না। নতুন নতুন চিন্তাভাবনা কালের প্রয়োজনে গ্রহণ করার মতো মানসিকতা থাকতে হয়। স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত মনোভূমি থেকে উৎসারিত জিজ্ঞাসাকাতর, সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিই সুন্দরের সাধনা করতে পারেন।[১৭]

www.nagorikpathagar.org

বাংলার মুসলমানদের আগমন হয়েছিল প্রায় সাত শতাব্দী আগে। বাংলার মুসলমান সমাজ বিচিত্র ধর্মগত ও জাতিগত উপাদানে গঠিত। ওদুদ মনে করেন, মুসলমানের নানামুখী দৈন্য থাকলেও তাদের মূলত ভাবের এবং সঙ্কল্পের দৈন্য ছিল; যে দৈন্য আর্থিক দৈন্যের চেয়েও বিড়ম্বনাপূর্ণ। মুসলমানদের স্বীকার করা উচিত সজাগ-মানবজীবন অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমের জীবন। মুসলমান সমাজ অতীতমুখিতার বদলে বর্তমানের প্রয়োজনে জাগ্রত মনোভাব গ্রহণ করেছে। জগতের সবাই জ্ঞান ও প্রেমের জীবনকে গ্রহণ করেছে। ফলে রাষ্ট্রিক ও সামাজিকভাবে মানুষের পরস্পরের নৈকট্যে আসা অনিবার্য। জাতিসত্তা ও সমাজের প্রাণমূল থেকে সংস্কৃতির বৈচিত্রের, বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান চলছে যা থেকে সম্ভব হবে জাতিতে, সমাজে সমাজে, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও মঙ্গলজনক ভবিষ্যৎ :

'মানুষের বিচিত্র সংস্কৃতির সেই প্রাণশক্তি আজ চিন্তার ক্ষেত্রে নাম পেয়েছে বৈজ্ঞানিকতা ও মানব-হিত আর কর্মের ক্ষেত্রে নাম পেয়েছে সুব্যবস্থিত রাষ্ট্র জীবন। একালে বাংলার মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনও প্রতিষ্ঠিত হবে সেই বৈজ্ঞানিক মানব-হিত ও সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রের ভিত্তির উপরেই।'

বর্ণ বিভাজিত হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজের মধ্যে, সামাজিক সম্পর্ক রহিত, আশরাফ ও আতরাফ' শ্রেণী, দীর্ঘকাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পাশাপাশি বসবাস করছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগত কিংবা ধর্মাশ্রিত সংহত জীবনচেতনা মুখ্য ভূমিকা ও বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেছেন হিন্দু-মুসলমানের পৃথক রাষ্ট্রজীবন ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান নেই। ওদুদ মনে করেন রাষ্ট্রজীবনের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রভূত ক্ষমতা সমন্বিত সংহত জীবন। কিন্তু ভারতবর্ষে একীভূত চেতনা খুব কমই অনুভূত হয়। ওদুদ অনুভব করেছেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের সম্প্রদায়গতভাবে সম্মিলন অনিবার্য :

'বলাবাহুল্য, এই সম্মিলন বৈচিত্র-হীন হতেই পারে না-কিন্তু বৈচিত্র্য যেন কদাচ বিপন্ন না করে একত্বকে।'

অতীত ও বর্তমানের সমস্ত চিন্তাস্রোত, সমন্বিত, সংহত এবং সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত, জীবনের সুনির্দিষ্ট অভীষ্টে নিবেদিত। ওদুদ ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। "যত মত তত পথ" অথবা "যত পথ তত মত" তত্ত্বের সূত্রে ভারতের সমাজ জীবনে কিছুটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও ওদুদ তাতে লক্ষ্য করেছেন, সচেতনতার অভাব। উপমহাদেশের সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য অন্বেষাকে, ওদুদ সামাজিক অর্থে গ্রহণ করতে উৎসাহী। তিনি অনুভব করেছেন, অনন্ত বৈচিত্রের ভিতরে একত্বের সন্ধান কেবল মননগত ব্যাপার নয়, সামাজিক সত্য।[১৮] ওদুদ সে সময়ের অসার্থক সংস্কৃতি চিন্তার স্তর থেকে সার্থক সংস্কৃতি চিন্তার স্তরে উপনীত হতে কিছু প্রস্তাবনা নির্দেশ করেছিলেন, যা নিম্নরূপ :

১. দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না।
২. একান্ত বীভৎস না হলে কোনো সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে যে-যা প্রাচীন তা প্রাচীন বলেই বরণীয় নয়, বরণীয় তার বর্তমান কার্যকারিতার জন্যে।

www.nagorikpathagar.org

৩. হিন্দু-মুসলমানের পোশাক ও নামের ব্যবধান থাকবে না অথবা অস্বীকার করা হবে।
৪. সামাজিক আদান-প্রদান-বিবাহ-আদি সমেত-সর্বত্র সহজ হবে।
৫. আইন সমস্ত দেশের জন্য এক হবে।

বলাবাহুল্য ১৯৪১ সালে রচিত ওদুদের এ নির্দেশিকা ছিল অত্যন্ত বৈপ্লবিক, অখণ্ড বাঙালি জাতির রাজনৈতিক কর্মসূচি তুল্য। অখণ্ড বাঙালি সমাজ কিংবা আজকের বাংলাদেশের প্রশ্নেই যেন দূরদর্শী ওদুদের এই কর্ম-চিন্তা উৎসারিত হয়েছিল। তাই এ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'চিন্তা চিরদিনই বিশ্বজনীন।' এর অনুকরণে বলা যায়, ওদুদের সংস্কৃতিচিন্তা সমন্বয়ধর্মী ও বিশ্বজনীন।

২.১.৬ নজরুল ইসলাম

কাজী আবদুল ওদুদ 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে নজরুলের সাহিত্যিক-জীবনকে চারটি ভাগে ভাগ করেছে। এর প্রথম ভাগ নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা থেকে "বিদ্রোহী" প্রকাশের পূর্ব-পর্যন্ত, দ্বিতীয় ভাগে "বিদ্রোহী" প্রকাশের পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান পর্যন্ত, তৃতীয় ভাগে সঙ্গীত-রচনার যুগ-বিশেষত গজল রচনার যুগ এবং চতুর্থ ভাগ তাঁর যোগী জীবন। সব কটির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ওদুদ করেন নি; তিনটি স্তরে নজরুল প্রতিভার পূর্বাপর একটি আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে নজরুলের যুগ মানব সত্তার পরিচয়ই বড় হয়ে ফুটে উঠেছে; এবং সে সঙ্গে কবি-প্রতিভার শক্তি ও সীমাবদ্ধতার পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।[২০]

'বিদ্রোহী' পূর্ব যুগে নজরুল-মানসে ওদুদ লক্ষ্য করেছেন কবির দায়িত্বহীন ভবঘুরে জীবনের ভাববিলাস, অভিমান এবং ব্যর্থ প্রেমের আর্তি-জনিত কারুণ্য। এ পর্যায়ে নজরুল আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতে, সত্যেন্দ্রনাথ এবং ইরানের কবিতিলক হাফিজের কবিতায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার সন্ত্রাসবাদী দলের প্রতি কবির ছিল গভীর শ্রদ্ধা।২১ এ সময় নজরুলের কবিতায় পরিলক্ষিত হয় নবীনতা, উদ্দামতা ও ছন্দ সামর্থ্য যা নজরুলের সুপরিচিতি ও সাহিত্যিকদের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণের মূল কারণ।

কাজী আবদুল ওদুদ বিদ্রোহী যুগের নজরুলকে সনাক্ত করতে গিয়ে একটি নতুন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছেন। বিদ্রোহী পর্বে নজরুল ' যেন এক নতুন জীবন নিয়ে জেগে ওঠেন, নিজেকে ও জগৎকে দেখতে আরম্ভ করেন এক নতুন দৃষ্টিতে।' রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' অথবা 'এবার ফিরাও মোরে'র মতো নজরুলের 'বিদ্রোহী'তেও 'জীবন হঠাৎ একটি বৃহৎ চেতনার আবির্ভাবের গৌরব, বিধৃত। এই প্রচণ্ড জীবনাবেগের প্রভাবে নজরুল যেমন 'বিদ্রোহী'তে নিজের ভিতরে অনুভব করেছেন সাইক্লোনের শক্তি অন্যদিকে তেমনি তিনি মুগ্ধ হয়েছেন চপল মেয়ের ভালবাসায়। "তবু একথা সত্য যে, 'বিদ্রোহী'র আকর্ষণ কবিকে বাস্তবিকই ঘর ছাড়া করেছিল। সেই দিনে তাঁর সাম্যবাদ প্রচার আর বেপরোয়া শিকল-ভাঙার গানের কথা যাঁদের মনে আছে তাঁরা স্মরণ করতে পারেন–প্রচণ্ড ধূমকেতুর মতো কি এক ভীষণ

www.nagorikpathagar.org

মনোহর জীবন কবির ভিতরে সূচিত হয়েছিল।" এবং তা অনেকটা তাঁর সমাজের জড়তার প্রতিবাদেই যেন।

'বিদ্রোহী' রচনার পূর্বে নজরুল রচনা করেছিলেন 'শাতিল আরব', 'মোহররম, 'কোরবানী' প্রভৃতি কবিতা। ওদুদের বিবেচনায় বিদ্রোহীর চেতনা-সূত্র নজরুল-মানসে হঠাৎ আবির্ভূত হয় নি। এটি বাংলা সাহিত্যের আগন্তুক কোনো সৃষ্টি নয়। ব্রিটিশ উপনিবেশের সামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তো ছিলই; সেই সঙ্গে শৈল্পিক দৃষ্টান্তও ছিল। ওদুদের মতে, বিদ্রোহীর চেতনা মূলত রবীন্দ্রনাথের বলাকা-পর্বের কবিতা থেকেই অনুভূত হয়েছিল। সেটি চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গরূপ পেয়েছে নজরুলের কাব্যে।

রবীন্দ্র-ভাব বলয়ে নিমজ্জিত যুগে নজরুল ছিলেন বেসুরো এক শৈল্পিক অসঙ্গতি। বরীন্দ্রচেতনায় নয়, বরং রবীন্দ্রনাথের অপর পিঠেই অবস্থান ছিল তাঁর। রবীন্দ্রমুগ্ধ ওদুদও স্বীকার করে নিয়েছেন নজরুলের প্রতিস্বিকতা।

'নজরুলের 'বিদ্রৌহী'-যুগের অনেক কবিতায় দেখা যাবে "'বিদ্রেহী' ও সে-সবের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাবের একত্র সমাবেশের সঙ্গতি সুষমা অথবা যৌক্তিকতা বিষয়ে কবি বেশ উদাসীন হয়েছেন। কিন্তু এত ত্রুটি সত্ত্বেও এমন একটা প্রাণশক্তির ছাপ তার 'বিদ্রোহী' যুগের অনেক কবিতায় মুদ্রিত হয়েছে যার জন্য তাঁর" মাহাত্ম-স্বীকার না করেও উপায় নেই। কাজী আবদুল ওদুদ নজরুলকে বিবেচনা করেছেন ঐতিহাসিক পটভূমিতে। এ কারণে শিল্পের চেয়ে নজরুলের মানব মহিমাই তাঁর চোখে বড় হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন,

'কবি তিনি যত বড় তার চাইতেও বড় তিনি যুগ-মানব। যুগের বেদনা ও উন্মাদনা তাঁতে এত প্রবল যে কবির কল্পনালোকে অবস্থান তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ ইসলামী কবিতা 'খালেদ'। খালেদের মহিমা উদাও কণ্ঠে গাইবার চেষ্টাই তিনি করেছেন; কিন্তু দেখা যাচ্ছে খালেদের বীরমূর্তি পূর্ণভাবে রূপায়িত করার চাইতে তাঁর মনে প্রবলতর তাঁর সমসাময়িক মুসলমান সমাজের জন্য বেদনা অথবা অস্থিরতা। অবশ্য কবির দৃষ্টি আকাশ-কুসুম নয় কখনো, কবির কাব্য-ফুল মাটির গাছেরই ফুল, অন্য কথায়, যুগধর্মের বেদনায় কবি-মানস লালিত ও গঠিত।

নজরুল-বিবেচনায় কাজী আবদুল ওদুদ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিশীলতা তাত্ত্বিক সূত্র উন্মোচন করেছেন। তাঁর মতে, নজরুলের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভারতীয় ও পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যে যুগপৎ বিচরণ যে কারণে সম্ভব হয়েছে তার তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো 'লীলাবাদ'-ইংরেজিতে যা সাধারণত Pantheism নামে পরিচিত। এই তত্ত্বকে বলা যায় একই সঙ্গে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ওদুদের মতে,

'এই হিন্দু-মুসলমানের মাথা ভাঙাভাঙির দিনেও নজরুল যে অবলীলাক্রমে শ্যামাসঙ্গীত ও বৃন্দাবন গাঁথা রচনা করে চলেছেন, তৌহদের (একেশ্বর-তত্ত্বের) শক্তিশালী ব্যাখ্যা দিতে পারছেন, তার রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর এই মূল বিশ্বাসের ভিতরে।'....এই লীলাবাদ তাঁর জন্য এক ধরণের আত্মবিস্মৃতি এনে দিয়েছে, তাঁকে আশ্চর্যভাবে নিরহংকার ও সৌন্দর্য পিপাসু করেছে, কিন্তু কবিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে

www.nagorikpathagar.org

এটি এই বাধা উপস্থিত করেছে যে এর ফলে বর্হিমুখী না হয়ে অন্তর্মুখী তিনি হয়েছেন অনেক বেশি; রূপ- বৈচিত্র্য অঙ্কনের চাইতে Type বা প্রতীক সৃষ্টির দিকে তাঁর মন ঝুঁকছে।'

'বিদ্রোহী' সম্পর্কে ওদুদের অভিমত হলো, বিদ্রোহীর চেতনায় কবির "অন্তরে জাগে অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়, অন্যদিকে তিনি নিজেকে জ্ঞান করেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে দুঃস্থ মানবতার অগ্রনায়ক" হিসেবে। ওদুদ 'বিদ্রোহী' কবিতায় আশ্চর্যজনক ভাবে কবির প্রতিবাদ কিংবা বিদ্রোহের চেয়েও তাঁর মতে, "আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন এটিও ঠিক বিদ্রোহ-বাণী নয় বরং এক হিসেবে গভীর ঈশ্বর নির্ভরতার বাণী।"

কবি নজরুল এবং গীতিকার নজরুল, এ দুটি পরিচয়ের ভেতর কাজী আবদুল ওদুদের চোখে দ্বিতীয় নজরুলকেই অধিকতর সার্থক বলে মনে হয়েছে। কাব্যে বিদ্রোহীরূপে খ্যাতিমান করলেও নজরুল জনপ্রিয় হলেন অজস্র প্রেম-সঙ্গীতের রচয়িতারূপে। এর পশ্চাতেও রয়েছে শিল্পের ঐতিহাসিক নিদর্শন। কাজী আবদুল ওদুদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য' বীর রসে আরম্ভ করলেও পরিণতিতে তা করুণরসের কাব্য হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, 'করুণ রস, বিরহ, এ-সব বাংলায় জমে ওঠে যেন সহজে।' এ ক্ষেত্রে বাংলার আবহমান প্রাণধারার সঙ্গে নজরুলের শিল্পী আত্মার ছিল নিবিড় যোগাযোগ।

ইসলামী সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, বৈষ্ণব সঙ্গীত-এ তিনধারার রচনাতে নজরুল সিদ্ধ হস্ত হলেও ওদুদের মতে, ইসলামী সঙ্গীতের চাইতে শ্যামা সঙ্গীত রচনায় নজরুল সার্থকতা অর্জন করেছেন অনেক বেশি।২৩ তাঁর বিবেচনায়, 'নজরুলের কোনো কোনো শ্যামা সঙ্গীতে উপবোগ্য কবিতা হয়েছে।' সবচেয়ে বড় কথা নজরুলের শিল্প-সাধনার মূলে ওদুদ লক্ষ্য করেছেন প্রেম সাধনা। এই প্রেম- যা সব মানুষকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়। ওদুদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন তাই এরকম।

"-যে বৃহৎ জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের চেতনা দেশে অনুভূত হয়েছে তাতে তাঁরও প্রতিভার স্পর্শ লেগেছে। এই জন জাগরণের দিক দিয়ে দেখলে সহজেই চোখে পড়ে নজরুলের ঐতিহাসিক মর্যাদা কত বড়।"

ওদুদ নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের চতুর্থ স্তর অর্থাৎ যোগী জীবন সম্পর্কে বেদনাহত হৃদয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় প্রয়াসী হননি।

২.১.৭ গ্যেটে

প্রথম জীবনে কাজী আবদুল ওদুদের চিন্তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল গ্যেটে। কারণ গ্যেটের অসামান্য প্রতিভা তাঁর মানসলোকের পরিমার্জনে সহায়ক হয়েছিল। আধুনিক জগতের সমস্ত চিন্তাশীলের গুরু বলে স্বীকৃত গ্যেটের পরিচয় দিতে গিয়ে 'গ্যেটে' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,-

'.......গ্যেটে শুধু কবি নন, তিনি বিজ্ঞানবিৎ (বিজ্ঞানে তাঁর দান স্বীকৃত হয়েছে) চিত্র সমঝদার, শেষ বয়সে সঙ্গীত-সমঝদার, ধর্ম-তত্ত্বজ্ঞ, এমন-কি মরমী-সাধনার সঙ্গেও সুপরিচিতি।'

www.nagorikpathagar.org

তাই তাঁর মনে হয়েছে,–

'গ্যেটে সমুদ্রে হাওয়া মানস-স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য।'

আঠার শতকে ইউরোপে নব মানবিকতার সাধনার পরিণতি পরিলক্ষিত হয় গ্যেটের জীবনে ও সাহিত্যে। গ্যেটের মনীষা ও কাব্য সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের পর ক্রোচে তাঁর 'গ্যেটে' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন,–

'গ্যেটের কাব্যে, তাঁর সমৃদ্ধ বৈচিত্র বিলাসী রূপগ্রাহী ও প্রখরবোধ চিত্তে প্রথম স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল আধুনিকতার বহুদিক।'

জোহান ভোলফগাঙ গ্যেটে ১৭৪৯ সালের ২৮ আগস্ট জার্মানির ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকে তাঁর ছিল প্রখর সৌন্দর্যবোধ, শিশু বয়সে কুৎসিত শিশু দেখলে নাকি তিনি কান্না করতেন। ষোল বছর বয়সে গ্যেটে লাইপৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বেচ্ছায় সাহিত্য নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবে, অথচ তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল তিনি আইন পড়ুন। অল্পদিনেই গ্যেটে অধ্যাপকদের বক্তৃতায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে ক্লাসে অমনোযোগী হন। তবে ক্লাসে অমনযোগী হলেও তাঁর মানস-উৎকর্ষ ব্যাহত হয় নি। অধ্যাপক বোম্যে'র বিদুসী পত্নী তাঁকে স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক, কবি যশঃ প্রার্থীদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। ছেলেবেলা থেকে গ্যেটে সবার অযাচিত প্রশংসা পেয়ে এলেও এই গুরু-পত্নীর কঠোর সমালোচনা থেকে নিস্কৃতি পেলেন না। এ-সময়ে তাঁর শৈশব-রচনা চুলাতে নিক্ষেপ করলেন। এ-সময়ে জার্মান সাহিত্যিক লেসিঙের বিখ্যাত শিল্প সমালোচনা 'লাওকোত্তন' পড়ে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্প-সমৃদ্ধ স্বচক্ষে দেখার জন্য ড্রেসডেন গিয়েছিলেন। লাইপৎসিজে গ্যেটে আনা কাতারীনী নামের এক হোটেল-মালিক কন্যার প্রেমে পড়েন; তাঁর প্রথম দিকে রচনা 'খেয়ালী প্রেমিক' এরই ফল। এখানে তিনি 'সম-অপরাধী' শীর্ষক আর-একখানা নাটকও রচনা করেছিলেন। তাঁর এই বাল্য-রচনাদ্বয়কে সমালোচকরা তেমন গুরুত্ব না দিলেও লুইসের মতে, 'দুটিতে গ্যেটের বিশিষ্টতার পরিচয় রয়েছে'। লাইপৎ-সিগে তিনি তিন বছর ছিলেন, কঠিন অসুস্থতার কারণে আর বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি।[২৪]

গ্যেটে মাতৃভাষা ছাড়া ল্যাটিন, ইতালীয়, হিব্রু, গ্রীক, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা শিখেছিলেন, এর উপর চিত্রাঙ্কন, নৃত্যগীত, অসিচালনা, উদ্যান রচনা ইত্যাদিতেও অভ্যস্ত হয়েছিলেন। পিতার ইচ্ছানুযায়ী আইন অধ্যায়ন করেন 'কিন্তু তাঁর প্রাণের সামগ্রী বরাবরই ছিল কাব্যচর্চা ও চিত্রাঙ্গন।' সাহিত্যানুবাদের বাইরে তাঁর বিজ্ঞানানুরাগও ছিল। এ সূত্রেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও সর্বব্রহ্মবাদী ব্রুনোর রচনার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। যদিও গ্যেটে আগে থাকতেই নৃত্য জানতেন, তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি একজন ফরাসি শিক্ষকের কাছে নৃত্য শিখতে আরম্ভ করেন। নৃত্য শিক্ষকের দুই কন্যা লুসিন্দা ও এমিলিয়া'র সঙ্গে গ্যেটে নাচতেন ও গল্প করতেন। দুই কন্যার পরিচয় ও প্রেম শেষ পর্যন্ত বিষাদময় বিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়। এর পরে গ্যেটের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ওয়েকফিল্ডের যাজক পরিবারের। জেজেনহাইম-এর যাজক-পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যা ফ্রীডেরিকার মাধুর্যের প্রতি গ্যেটের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। ফ্রীডেরিকার কাছ থেকে শেষ

www.nagorikpathagar.org

বিদায়ের ছবিটি তিনি 'বরণ ও বিদায়' কবিতায় অমর করে রেখেছেন। গ্যেটের তরুণ প্রতিভার সান্নিধ্যে এসেছিলেন তখনকার দিনের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। 'কিন্তু তাঁর কাব্যের সত্যকার উৎস তার এই গুরুদের প্রেরণা তত নয় যত তাঁর নিজের প্রণয় ব্যাপার। সেই প্রেমের দহন তিনি সারাজীবন ভোগ করেছেন। বাস্তবিক, গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে দুই অদ্ভুত ধারা যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য একটি জ্ঞানান্বেষণ, অপরটি প্রেমবিধুরতা।'

ওদুদের শিল্প মানস গঠনে গ্যেটের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ওদুদ জ্ঞান ও প্রেমকেই মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করতেন। গ্যেটের চিন্তাধারাই তাঁর মধ্যে এত চেতনা জাগ্রত করেছিল।[২৫] এ সম্পর্কে ওদুদ বলেন,

"গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে প্রেমবিধুরতা ও জ্ঞানান্বেষণ বিদ্যমান এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলবার আছে,–গ্যেটে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের এটি বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। প্রেমে তিনি যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েন আর তাঁর আর একটি চেতনা যেন বসে বসে তাঁর মত্ততার কাহিনী সংগ্রহ করতে থাকে। এই আশ্চর্য বাস্তব প্রীতি, এই যেন গ্যেটে-প্রতিভার সবখানি কথা।"

যৌবনেই গ্যেটে ঘোষণা করেছিলেন : 'আমি প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম হব, ভাল হব, মন্দ হব, তোমাদের কোনো আদর্শ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।' বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময় গ্যেটে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সৃজনশীল ও মৌলিক কাজে। সৃজনশীলতার বিকাশ ও বৈচিত্রে গ্যেটে কবি, দার্শনিক, সাধক, বৈজ্ঞানিক, প্রশাসক, রোমান্টিক ও ক্লাসিক, লোকায়ত ও অভিজাত, প্রেমিক ও পূজারি। 'এই বহুমুখী জীবনানুভবের সামঞ্জস্য গ্যেটের ব্যক্তিত্বে সঞ্জীবিত করেছে মনুষ্যত্বের মহিমা।' তাঁর শিল্পচেতনায় সমান্তরালভাবে উপস্থিত ছিল প্রেমবিধুরতা ও জ্ঞান অন্বেষণ। 'গ্যেটের প্রতিভা ছিল প্রকৃতির মতো অপরিসীম বীর্যবন্ত, তাই তাঁর ভিতরকার সমস্ত দুঃখ-বিপত্তি বেদনা বিক্ষোভ আত্মগোপন করেছিল এক পরম রমণীয় প্রফুল্লতার অন্তরালে।' ওদুদ গ্যেটের ঋণ প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করেননি তবে তাঁর গ্যেটে চর্চার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতিতে অনুভব করা যায় কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল গ্যেটে তাঁর চিন্তা ও মননে। গ্যেটে প্রতিভার অমোঘ প্রভাব সম্পর্কে John Macy মন্তব্য করেছিলেন, 'আমরা সবাই গ্যেটের শিষ্য তা আমরা জানি আর নাই জানি; যে কোন উদার চিত্ত ব্যক্তি এই গুরুর সংস্পর্শে এলেই সেই অবসম্ভাবী শিষ্যত্বের কথা বুঝবেন।' গ্যেটে নিজেও বলেছেন, "যদি প্রকৃতই আমার রচনা ও চরিত্রের মর্মগ্রাহী হয়েছে তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে তার ফলে তিনি এক প্রকার চিত্তের অবন্ধন লাভ করেছেন।"

'প্রচলিত ধর্মে আস্তাবান না হয়েও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি বলেছেন বাস্তবিকই বিস্ময়কর ভাবুকের জন্য আনন্দের অফুরন্ত প্রসবন।' তাঁর আর একটি উক্তিও প্রনিধানযোগ্য– 'যাঁরা ধর্মপ্রাণ সৃষ্টি শুধু তাঁদের দ্বারাই সম্ভবপর'। তবে 'গ্যেটের ভিতরে স্বজাতিপ্রেমের তীব্রতা ছিল না।' এজন্য তাঁকে কিছু কম নিন্দা ভোগ করতে হয় নি। গ্যেটে চর্চার মাধ্যমে ওদুদের জীবনদর্শনের নানা প্রবণতা স্বচ্ছ ও স্ফটিকায়িত হয়েছে। প্রকৃতির কৃত্রিমতা ও মানুষের নিরন্তর অনুসন্ধান সমীকৃত হয়েছে গ্যেটের

www.nagorikpathagar.org

শিল্পচৈতন্যে। ওদুদ ভেবেছেন মধ্যযুগে মানুষকে জ্ঞান করা হতো ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব হিসেবে। প্রত্যেক মানুষ এখন ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব কি না তা বির্তক ও বিচারসাপেক্ষ হলেও গ্যেটে যে একটি ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব তা তিনি যথার্থ বলেই মনে করেন। সর্ব যুগে, সর্বকালে গ্যেটে প্রতিভা মানস উৎকর্ষের সমুন্নতিতে সমুজ্জ্বল থাকবে।'[২৬] তবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গ্যেটে সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ধারার সামগ্রিক প্রকাশ না ঘটায় তিনি অতৃপ্ত হয়ে উপসংহারে বলেছেন :

"গ্যেটে সম্বন্ধে যে ক'জন আলোচকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁদের কেউই কয়েকশত পৃষ্ঠার কমে তাঁদের বক্তব্য শেষ করতে পারেন নি। তবু তাঁদের লেখা ফেলানো লেখা নয়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী, তাঁর কাব্যের কিছু কিছু পরিচয়, আপাতত অকথিতই রইল।

গ্যেটে-সমুদ্রের হাওয়া মানস-স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য, এই একটি কথাই বলতে চেষ্টা করেছি হয়ত।"

সর্বগুণের উর্ধ্বে গ্যেটের মানবিক বোধ, যা প্রায় সকল সার্থক ও সাহিত্যিকেরই প্রধানগুণ হিসেবে বিবেচিত। তাই সমকালে খুব বেশী সমাদর লাভ না করলেও পরবর্তীতে তাঁর প্রতিভা হয়েছে বিশ্বনন্দিত।

২.১.৮ বাঙলার জাগরণ

ভারতের নবজাগরণের উদ্ভাবক ও হিন্দু মুসলমান সমস্যার প্রতিকার প্রয়াসী–এই দুই রূপে কাজী আবদুল ওদুদ রামমোহনের সাধনাকে অনুধাবন করেছেন। পশ্চাৎমুখী বাঙালি সমাজের কাছে বাঙালি সভ্যতার উদ্‌গাতা রামমোহনের ভূমিকা নির্ণয় করে 'বাঙলার জাগরণ' প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন। প্রবন্ধের প্রথম দিকে আবদুল ওদুদ স্বীকার করেছেন,–'রামমোহন থেকে আমাদের দেশে যে নবচিন্তা ও ভাবধারার সূচনা হয়েছে পরে পরের চিন্তা ও কর্মধারা কেবল যে তা'র পরিপোষক হয়েছে তা নয়, এমন কি প্রবলভাবে তার বিরুদ্ধাচারীই হয়েছে বেশী।' ১৩৩৪ সালে লিখিত এ প্রবন্ধটি ওদুদ মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পড়েছিলেন। এতে রাজা রামমোহন রায়কে বাংলার নবজাগরণের 'প্রভাত সূর্য' রূপে উল্লেখ করে ওদুদ বলেন, 'এই শত বৎসরেও আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেননি যার আদর্শ রামমোহন আদর্শের সঙ্গে তুলিত হতে পারে।' ওদুদের বিশ্বাস, এই শত বৎসরে এদেশে যে সমস্ত ভাবুক ও কর্মী জন্মেছেন তাঁদের প্রয়াসকে পাদপীঠরূপে ব্যবহার করে এর উপর রামমোহনের আদর্শের নব প্রতিষ্ঠা করলে দেশের জন্য সত্যকার কল্যাণের কাজ হবে।

রামমোহনের জীবনকথা তুলে ধরে ওদুদ বলেন, যৌবনে তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংশ্রবে আসেন; পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। তাঁর আগে তিনি আরবি-ফারসি-সংস্কৃত অভিজ্ঞ হয়ে পিতা ও অন্যান্যের সঙ্গে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বাদানুবাদ করেছেন, ঘর ছেড়ে তিব্বত উত্তর-ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং নানক কবীর প্রমুখ ভক্তের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। মোতাজেলা সুফী প্রভৃতি প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি হিন্দুর সঙ্গে তর্ক করেছেন

www.nagorikpathagar.org

বেদ উপনিষৎ রামায়ণ মহাভারত পুরাণতন্ত্র সংহিতা ও সে-সমস্তের টীকা নিয়ে, মুসলমানদের সঙ্গে তর্ক করেছেন কোরআন হাদিস ফেকা মন্তেক ইত্যাদি নিয়ে, আর খ্রিষ্টানদের সঙ্গে তর্ক করেছেন ইংরেজি গ্রিক হিব্রু বাইবেল ও বড় বড় খ্রিস্টান পণ্ডিতের মতামত নিয়ে। তিনিই আবার সতীদাহ নিবারণের জন্য লড়েছেন; মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, চীনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য, নারীর দায়াধিকার, বাংলা ব্যাকরণ রচনা, ইংরেজ শাসনের সমালোচনা ও সে- ক্ষেত্রে পথনির্দেশ প্রভৃতি তাঁর কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ওদুদ বলেন, 'এই বিরাট পুরুষের জীবন-কথা ও বিভিন্ন রচনা আলোকে পথের পথিক দেশের তরুণ-সম্প্রদায়ের নিত্য-সঙ্গী হবার যোগ্য। অর্থাৎ ওদুদ বাঙালি তরুণ সমাজকেও রামমোহনের জীবন ও রচনা থেকে অনুপ্রাণিত হতে বলেছেন। দেশের সামনে রামমোহনের নির্দেশ প্রসঙ্গে ওদুদের বক্তব্য হলো,–

'ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ এক নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনা, লোকশ্রেয়ঃ ও বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র, সেইজন্য পরে পরের উপশাস্ত্রসমূহ প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যাবর্তন মূল শাস্ত্রসমূহে;– ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ অনুশীলন; সমাজের ক্ষেত্রে- লোকহিতকর অনুষ্ঠানসমূহের প্রবর্তনা, যা অনিষ্টকর তা প্রাচীন হলেও বর্জনীয়; আর রাজনীতির ক্ষেত্রে Dominion Status-এর মতো একটা কিছুর আশা রাখা।'

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে রামমোহনের অবদান অনস্বীকার্য। ডিরোজিও ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগুরু। ডিরোজিও এর ভাবশিষ্যরা পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্ব, বিদ্যা ও সত্যানুরাগের ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। ডিরোজিওর দলের অনেক ব্যক্তিত্ব পরবর্তীকালে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসমাজের নেতা ও কর্মী হিসেবে ছিলেন খ্যাতিমান। কোনো কোনো সাহিত্যিক ডিরোজিও পন্থীদের রামমোহনের বিরোধী দল ভাবলেও ওদুদের বিবেচনায় এরা রামমোহনের বিরোধী দল নয়,[২৭]–

"রামমোহন ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞানের স্বাদ বাঙালি প্রকৃত প্রস্তাবে পায় ডিরোজিওর কাছ থেকে। ....তাছাড়া সাধারণত বিদ্যানুরাগী বাঙালি হিন্দু এই ডিরোজিওর প্রদর্শিত পথে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।"

ওদুদ রামমোহনের উত্তরাধিকার হিসেবে একে একে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের অবদান পর্যালোচনা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অভিমত, 'সংসারনিষ্ঠা জ্ঞানানুশীলন সৌন্দর্যস্পৃহা সমস্তের ভিতরে ঈশ্বর প্রেমই ছিল তাঁর অন্তরের অন্তরতম বস্তু।' সে জন্যে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনকে মুখ্যত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারক রূপে দেখেছেন। অপর দিকে অক্ষয় কুমার মত প্রকাশ করেছেন রাজা রামমোহনের বিশেষ উদ্দশ্য ছিল দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার; জ্ঞানানুশীলন ভিন্ন অন্য রকমের প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। তাঁর বিখ্যাত সমীকরণটি এই :

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য
পরিশ্রম = শস্য
সুতরাং প্রার্থনা = ০

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ কৃষক প্রার্থনা করে নয়, বরং পরিশ্রম করে সফল উৎপাদন করে থাকে। জ্ঞানানুশীলন উৎসারিত অক্ষয় কুমারের আধুনিক মনোভাব দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি। রামমোহনের পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যাই ব্রাহ্মসমাজে কার্যকর ছিল। ওদুদের বিবেচনায় এ মানসিকতা মধ্যযুগীয়। এই মধ্যযুগীয় চেতনার ধারাবাহিকতা অনুসৃত হয়েছে কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দের জীবন ও সাধানায়। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তা ধর্মতত্ত্বও ও কৃষ্ণচরিত্র রূপায়ণে আত্মনিবেদিত হলো। তাঁর স্বদেশপ্রেম প্রগাঢ় হিন্দুত্বে জারিত হলো বলে তিনি ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালনে সমর্থ হলেন না।

রামমোহন যে জীবন অন্বেষণ করেন তা কেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চেতনার মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হলো। এই বিরোধ সামঞ্জস্যে উপনীত হবার সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে যায়। উনিশ শতকে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় চেতনা রেনেসাঁসের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে। কিন্তু ক্রম বিকশিত সাহিত্যকর্মে এই ক্রটি মোচনের প্রচেষ্টা ছিল। রেনেসাঁসের সুফল মধুসূদনের রচনায় প্রতিফলিত,–

'বাংলা নবাসাহিত্যের নেতা মধুসূদন আশ্চর্য উদার ব্যক্তি চিত্ত নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; জাতি ধর্ম ইত্যাদি সঙ্কীর্ণতা যেন জীবনে ক্ষণকালের জন্যও তাকে স্পর্শ করতে পারে নি; আর এই উদারচিত্ত কবি ইয়োরোপের ও ভারতের প্রাচীন কাব্য কলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যেভাবে অবলীলাক্রমে আহরণ করে তাঁর স্বদেশ বাসীদের উপহার দিয়েছেন সে কথা বাঙালি চিরদিনই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।'

মধুসূদনের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তা উগ্র হিন্দু জাতীয়তায় সমপির্ত হলে জাতির সামগ্রিক কল্যান প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বঙ্কিমী জাতীয়তার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। যদিও জাতীয় জীবনের বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়ত্বের আদর্শ প্রভাব সঞ্চারী ছিল তবুও রবীন্দ্রচেতনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। 'রবীন্দ্রনাথ কবি, তাও আবার সূক্ষ্ম শিল্পী গীতিকবি, তাই যে মহা মানবতার গান তিনি গেয়েছেন আমাদের স্থূল-প্রকৃতি জন-সাধারণের কত দিনে তার স্পন্দন জাগবে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।'

ওদুদের আলোচনায় ব্যক্ত রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্যই বাংলার রেনেসাঁসকে শেষ পর্যন্ত সমগ্রতাস্পর্শী ও পরিব্যাপ্ত করেছিল।[২৮] নুরুল আমিন বলেছেন, 'যদিও বাংলার জাতীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থূল জাতীয়ত্বের আদর্শই জনসাধারণের ওপর অধিক প্রভাব বিস্তার করেছে, রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম মানবতার বাণী তাদের জীবনে তেমন ফলপ্রসূ হয় নি।'[২৯]

কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, হিন্দুর নিজের ভিতরেই যখন মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সংগ্রামের এই চেহারা, তখন দেখা দিয়েছে আরেক সমস্যা- হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এর পেছনে উভয়ের আচ্ছন্ন দৃষ্টি। ওদুদের মতে, বাঙালির জীবনে প্রাচীন সংস্কার এমন বদ্ধমূল যে, চোখ খুরে জগতকে দেখতে সে নারাজ। অনেকটা এ জন্যও বাঙালি তার চোখ খোলার সাধনার বড় সাধক রামহোমনকে মোটের উপর প্রত্যাখ্যান

www.nagorikpathagar.org

করে এসেছে। তারা সাধারণত ভাবপ্রবণ, আর রামমোহন আগোগোড়া নিরেট কাণ্ডজ্ঞান এবং তিনি বাঙালি হিন্দুর পরম আদরের প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে বেশ উঁচু গলায় কথা বলেছেন, যে জন্য তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু তাঁরা যদি তাঁর আদর্শে 'বাহির মুখো' হওয়ার সাধনায় বিশ্বজগতের দিকে ফিরে তাকাতো তবে দেখতে পেত 'তাঁর পথ-নির্দেশই অনেক পরিমাণে কল্যাণ-পথের নির্দেশ।' তাঁর মতে, 'এই বাহিরমুখো হওয়ার সাধনাই হয়ত বর্তমানে বাঙালি জীবনে বড় সাধনা হয়ত এরই সাহায্যে সবলতর কাণ্ডজ্ঞান শ্রেষ্ঠতর পৌরুষ ইত্যাদি কল্যাণ-পথের সম্বল আহরণ-তার পক্ষে সহজ হবে।' ওদুদের ভাবনায় এই যে বাঙালি জীবন, মূলত তা থেকে বাঙালি মুসলমানের জীবন বাদ পড়ে না। তাই প্রবন্ধের শেষে তিনি বলেছেন,-

'এরই সঙ্গে মুসলমানের জাগরণ যদি সত্য হয়, তাহলে কিছু বেশী সুফল লাভের সম্ভাবনা। যে গুরু তাকে উপদেশ দিয়েছেন- ক্ষুধা লাগলে খেয়ে নামাজ পড়ো, তাঁর অনুবর্তিতায় বস্তুতন্ত্র হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। আবার সেই জন্যই বস্তুর শিকলে বন্দী হওয়াও তার পক্ষে কম স্বাভাবিক নয়। ফলে মুসলমানের হয়েছেও তাই।-এই মনের বন্ধন সহজভাবে চুকিয়ে দিয়ে মুসলমান নব-মানবতার ধ্বজা বহন করবার যোগ্য হবে কি না, অথবা কতদিনে হবে, জানি না, যদি হয়,তবে বাংলার ধর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে তার দান কম হবে না; তাহলে স্বাপ্নিক হিন্দু ও বস্তুতন্ত্র মুসলমান এ দুয়ের মিলনে বাংলার .....অভিনব জাতীয় জীবন গঠিত হবে......

বস্তুত বাংলার জাগরণ প্রসঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের কথা কখনো বিস্মৃত হন নি, তার প্রমাণ 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থের আলোচনায় আরো বেশি করে পাওয়া যাবে।

২.১.৯ কোরআনের আল্লাহ

কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর ' কোরআনের আল্লাহ' প্রবন্ধে মানুষের প্রতিদিনের জীবনে কোরআন বর্ণিত আল্লাহর স্থান নির্ণয় করতে চেয়েছেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ভালোমন্দের সঙ্গে আল্লাহ্ যে কিভাবে যুক্ত হয়ে আছেন সে সম্পর্কে ও তিনি মতামত তুলে ধরেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্কে সকল শ্রেষ্ঠ গুণের আধার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই সকল গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠার জন্য মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজ ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর পালনে ও আল্লাহ্র নিরানব্বইটি নামের উচ্চারণের মোহে ইসলাম ধর্মের ও আল্লাহর গুণাবলীর মমার্থ গ্রহণের দিকে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে বলে তিনি মনে করেছেন।

আল্লাহর স্বরূপ উপলব্ধিতে ওদুদ মনে করেন, তাঁর স্বরূপ জিজ্ঞাসা কোরআনের অনভিপ্রেত; তবে তাঁর অনন্ত মহিমা ও গুণের কথা কোরআনে ভরপুর; ধর্মপ্রাণ মুসলমান দৈনন্দিক তস্‌বিতে তা স্মরণ করেন, 'কিন্তু এই স্মরণ করার অর্থ যে শুধু মুখে উচ্চারণ করা নয় মন দিয়ে উপলব্ধি করা ও চরিত্রের এ-সবের প্রভাব ফুটিয়ে তোলা, সেই বড় কাজটাই চাপা পড়ে গেছে।' প্রসঙ্গক্রমে ওদুদ স্মরণ করেন হজরতের বিখ্যাত বাণী: আল্লাহর গুণাবলীতে বিভূষিত হও, 'অর্থাৎ আল্লাহ্ বলতে যে-সব শ্রেষ্ঠ গুন তোমার চিন্তায় আসে সে-সব নিজের ভিতরে সৃষ্টি কর।' দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন,

www.nagorikpathagar.org

'আল্লাহ্ পরম সুন্দর এই ভাবনা আমার ভিতরে দিন দিন এনে দিচ্ছে আমার নিজের সমস্ত কাজে ও চিন্তায় সুন্দর হবার তাগিদ। তেমনি ধরুন–তাঁর করুণাময় নাম, তাঁকে করুণার শ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপে বুঝে আমি চেষ্টা করছি সেই করুণার ভাব আমার মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলতে।' এ-ভাবে ওদুদ আল্লাহর ধারণাকে জীবনে এক অন্তহীন অগ্রগতির তাগিদ হিসেবে বুঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন। ওদুদ বলেন,–আল্লাহকে যদি এইভাবে শ্রেষ্ঠ গুণের সমষ্টি বোঝা যায়, তবে আল্লাহ বাস্তবিকই আমাদের আকর্ষণ স্থল হয়ে দাঁড়ান–আমাদের বহু ব্যর্থতাময় দৈনন্দিক জীবনে তিনি হয়ে ওঠেন গভীরভাবে অর্থপূর্ণ। তখন মুসলমানের এই যে প্রতিদিনের প্রার্থনা আমাদের সোজা পথে চালাও–সেটি প্রার্থনাকারীর হৃদয় মনকে সত্যকারভাবে উদ্বোধিত করে,....জীবনের অর্থ এইভাবে অনেক খানি পরিষ্কার হয়ে উঠলে ধর্মের বিধি-বিধানের তাৎপর্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে; তখন বুঝতে দেরী হয় না, ধর্মের বিধি-নিষেধ কোনো নিষ্ঠুর প্রভুর কষ্টদায়ক হুকুম নয়, বরং সে-সব হচ্ছে জীবনকে উন্নতির দিকে পরিচালনার নিয়ম-শৃঙ্খলা-নদীর ধারাকে পরিচালনা করার জন্য তার দুই তীর।......তাই ধর্ম যা জীবনের বিকাশের সহায়ক আর তাই অধর্ম যা তেমন সাহায্য করে না, যেমন তাই খাদ্য যা বল দেয়, তা খাদ্য নয় যা বল দেয় না।'

এভাবে ওদুদ কোরআনের আল্লাহর ধারণাকে মানুষের দৈনন্দিক জীবনের বিকাশ ও অগ্রগতির সহায়ক করে তুলেছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মের যে রূপ চর্চায় তার যে বড় লাভ হবে, তা বলাই বাহুল্য।[৩০]

তাই প্রবন্ধে সর্বশেষ উক্তি:

'পরম দুর্জ্ঞেয় আল্লাহ্‌কে কোরআনের যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমন ব্যবহারযোগ্য করেছেন এ মানুষের এক বড় লাভ।'

২.১.১০ সম্মোহিত মুসলমান

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর লেখকগণ হজরত মোহাম্মদের (৫৭০-৬৩২) মানবীয় গুণাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে জীবনের পাথেয়রূপে সেই গুণাবলীর চর্চার কথা বলেছেন। অথচ বাংলার মুসলমান সমাজ হজরত মোহাম্মাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে ও মাহাত্ম্যে সম্মোহিত হয়ে তাঁকে প্রাত্যহিক জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাঁকে অলৌকিকত্বের মোড়কে আবৃত করে সাধারণ মুসলমানের কাছে আলেম সমাজ উপস্থিত করেছিলেন বলেই 'সম্মোহন' সম্ভব হয়েছিল। হজরত মোহাম্মাদকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজে যে ভ্রান্তির দুর্গ গড়ে উঠেছিল, সেই দুর্গপ্রকোরে সর্বপ্রথম আঘাত করলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তাঁর 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধটি দীর্ঘদিনের অচলায়তনে মুক্তির বাণী বয়ে আনলো।[৩১] নুরুল আমিন বলেছেন, 'রক্ষণশীল মুসলমান ও প্রগতিশীল মুসলমান সমাজের মধ্যে আলাদা বিভেদ রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রবন্ধে ওদুদ জড়তাগ্রস্ত মুসলমান সমাজকে একটু বেশি করে ঘা দিয়ে জাগাবার যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সেটিকে রক্ষণশীল দল হাতিয়ার হিসেবে অপপ্রয়োগ করার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁদের অপপ্রয়োগ যে কত যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন তা কালই প্রমাণ করেছে।'[৩২]

www.nagorikpathagar.org

আসলে ওদুদ এ প্রবন্ধটিতে যা বলতে চেয়েছেন তা সত্যিই ভেবে দেখবার মতো। মুসলমান সমাজ, বিশেষত বাংলার মুসলমান সমাজকে চরম অধঃপতন ও পশ্চাৎপদতার ভীতিপ্রদ অবস্থা থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে ওদুদ এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের গোড়ার দিকে ওদুদ যখন এ বিষয়ে ভাবছেন, তখন তিনি দেখতে পান সে সমাজে অনুসন্ধিৎসা বন্ধ, যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ অন্তর্হিত, মনুষ্যত্ব অর্জনের চেষ্টাই নেই; উপলব্ধিহীন অন্ধ অনুবর্তিতা, দুরুদ পাঠ, কোরআন-চুম্বন, শাস্ত্র নিয়ে আন্দোলন এ-ই হয়েছে তাদের ধর্ম। ওদুদ মনে করলেন, তাঁরা সম্মোহিত, বশীভূতের মতো তাঁদের বিচার-বিবেচনা-শক্তি লোপ পেয়েছে। তাঁর ভাষায়, "সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতারও চরম দশা বলা যেতে পারে,-তার মানব সুলভ সমস্ত বিচার-বুদ্ধি, মানস-উৎকর্ষ, আশ্চর্য ভাবে স্তম্ভিত। বর্তমান তার জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন, দিগদেশবিহীন, অতীত ভবিষ্যৎ তার নেই।" অথচ "জীবনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করবার দুর্নিবার প্রয়াসের মুখেই যে উচ্ছিত হয় যুগে যুগে মানুষের বীরত্ব, ত্যাগ, শাস্ত্রজ্ঞান, মনীষা, তার প্রাচীন ইতিহাসে এর যোগ্য প্রমাণের অভাব নেই। হজরত ওরম ও ইবনে জুবেরের মতো বীর-কর্মীদের, সাদী-ওমর খাইয়ামের মতো মনীষীদের, গাজ্জালী-রুমির মতো সাধকদের জীবনের অন্তস্থলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। জীবন রহস্যের সেই গহনে উঁকি দেয়, এই সম্মোহিতের কাছ থেকে তা আশা করা কত দুরাশা! এ সমস্তই যে তার কাছে শুধু নাম-পঠন-অযোগ্য অক্ষরের মতো কালের পটে কতকগুলো আঁচড়। তার জন্য একমাত্র সত্য শাস্ত্রবচন। অথবা তাও ঠিক নয়; শাস্ত্রবচনের পিছনে যে সত্য ও শ্রেয়ঃ অন্বেষী মানবচিত্তের স্পন্দনের অপূর্বতা রয়েছে শাস্ত্রবচনের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির সেই দ্বার তার জন্য যে রুদ্ধ। প্রকৃত সম্মোহিতের মতো তার জন্য একমাত্র সত্য প্রভুর হুকুম-স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী প্রভুর হুকুম।" এবং সে হুকুমে সে কখনো স্বপ্ন দেখে প্যান-ইসলামের, কখনো বর্তমান পরিবেষ্টনের কথা বিবেচনা ব্যতিরেকেই পূর্বেকার শাস্ত্রবাক্যের হুবহু প্রবর্তনার।

ওদুদের মতে, এই যে মুসলমান সমাজে সম্মোহনের ভয়ংকর রূপ দাঁড়িয়েছে, সে সম্মোহন অনেক পূর্বেও ছিল; তবে সেটির গ্রহণযোগ্যতা ভিন্ন দিক থেকে। তিনি বলেন, "মনে হয়, এ সম্মোহনের এক বড় কারণ হজরত মোহম্মদের মহাজীবনই। সে জীবন তপস্যায়, প্রেমে, কর্মে বিচিত্র ও বিরাট নানা দুঃখ দহনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার ফলে প্রখর তার ঔজ্জ্বল্য; তার উপর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মানুষের হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো চিরকালই পৌত্তলিক; কিন্তু হজরত মোহম্মদের ব্যক্তিত্বের এই প্রখার্যের জন্যই হয়ত মুসলমান-ইতিহাসের অনেক শক্তিধর পুরুষও তার সম্মোহনের নাগপাশ এড়িয়ে যেতে পারেন নি।" প্রসঙ্গক্রমে ওদুদ হজরত ওমর ও ইমাম গাজ্জালির কথা উল্লেখ করেছেন এবং এঁরা যে তাঁদের বীর্যবত্তা ও সাধনার পরিপূর্ণতা সত্ত্বেও চূড়ান্ত আদর্শ সর্বসাধারণের জন্য নিরাপদ ভেবেছিলেন তার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েও ওদুদ গাজ্জালির মৃদু সমালোচনা করেছেন। গাজ্জালি সর্বসাধারণের দর্শন চর্চাকে বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন। ওদুদ বলেন, 'গোটা

www.nagorikpathagar.org

দর্শন চর্চার বিরুদ্ধে তাঁর যে প্রতিবাদ তাকে অত্যন্ত দোষাবহ বলা ভিন্ন উপায় নেই। যুক্তি বিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবনপথে বাস্তবিকই এ যে মানুষের এক অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটলে পূর্বানুবর্তিতা পাষাণভারের মতনই মানুষের জীবনের উপর চেপে বসে, দেখতে দেখতে তার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম প্রবাহ শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে আসে।" মূলত এর মাধ্যমে ওদুদ বাঙালি মুসলমান সমাজে যুক্তি, বিচার ও বুদ্ধির চর্চার প্রসার ঘটানোকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং শাস্ত্রানুগত্য ও পূর্বানুবর্তিতাও যেন যথাসম্ভব এর ভেতর দিয়ে আসে, তা কামনা করেছেন।[৩৩] এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট বলেছেন,

'মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। বরং ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ইসলামের যে প্রাণভূত তৌহীদের সাধনা, মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আল্লাহকে যে জানতে চায়, তার চিত্তে ভিন্ন বিচার, কাণ্ডজ্ঞান অপরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুক্তির লক্ষণ আর কোথাও যোগ্যভাবে বিকাশিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া ইসলামের তৌহীদের সাধনা জগতে কল্যান ও মুক্তির সহায়তা করে এসেছে, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।"

এ প্রসঙ্গে তিনি তৌহীদে বিশ্বাসী দার্শনিক ইবনে রোশদ, নানক, কবীর, মাহাত্মা রাজহা রামমোহনের কথা বলেছেন, তাঁর ধারণা 'হজরত মোহম্মাদের সাধনা থেকে,–তাঁর প্রচারিত তৌহীদ, সাম্য নরনারী নির্বিশেষে সবারই জীবনের মর্যাদাবোধ আধুনিক যুগের এই মহাপুরুষের কল্যাণে ও মুক্তির পথে অমূল্য পাথেয়েরই কার্য করেছিল।'

ওদুদ বলেন, সেই ইসলামের অনুবর্তীরাই কেন আজ 'সমস্ত রকমের মুক্তির সঙ্গে 'অপরিচিত, তার কারণ তাঁরা 'সত্য ও সত্য সাধকের মহৈশ্বর্যময় প্রকাশের সামনে' চকিত সম্মোহিত'। তাদের কাছে, যাঁরা গভীর শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইসলাম ও হজরতের পানে চেয়েছেন, তাঁদের শান্তোজ্জ্বল দৃষ্টান্তের–চেয়ে যারা ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদের দীপ্তিতে অন্ধ হয়ে সম্মোহিত ভাবে আসফালন করেছেন তাঁদের প্রচণ্ডতার আকর্ষণই বেশি। কিন্তু 'কোনো সাধনার উত্তরাধিকার বংশসূত্রে নির্ণীত হয় না, গতানুগতিক শিষ্যত্ব সূত্রে ও নির্নীত হয় না, হয় সাধনা সূত্রেই।' এবং যে বেদনায় ও শ্রদ্ধায় সেই সাধনাকে বহন করে নব নব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে সার্থকতা দান করতে পারে, সেই পরম সৌভাগ্যে অধিকারও তাঁর জন্য। সেই সাধনার দ্বারা শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের কথা বিস্মৃত হয়ে মুসলমান তথা বাংলার মুসলমান সমাজ "হজরত মোহম্মদের বিরাট তপস্যাকে বহন করতে গিয়েছিল শুধু অন্ধ অনুবর্তিতার লাঠিতে ভর দিয়ে।" ওদুদের মতে তাই তাদের মস্তিষ্কে যে অবসাদগস্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বলেন, 'আল্লাহর এ জগৎ বিরাট, অনাদ্যন্ত হর্ষে, ক্ষোভে, ব্যথায় আনন্দে এ বিচিত্র, এই বিরাট বাস্তবতার সঙ্গে যে যোগযুক্ত নয় জীবনে শ্রেয়োলাভের আসল দরজা তাঁর জন্য বন্ধ,–নূতন করে এই সত্য আমাদের চিত্তে প্রেরণ সঞ্চার করুক; আমাদের দেহকোষানুসমূহ অক্সিজেন সংস্পর্শে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ ও পুনর্গঠিত হয়, এমনি করেই দেহ সবল ও কার্যক্ষম থাকে, আমাদের চিত্তকেও তেমনিভাবে নব নব জ্ঞান ও প্রেরণার

www.nagorikpathagar.org

দহনে নিরন্তর দগ্ধ ও সঞ্জীবিত করতে হয়, নইলে জড়তার আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে তা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ও জীবনের পক্ষে অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়ায়, নূতন করে এ জ্ঞানের দহনে আমাদের সমস্ত জড়তা ভস্মীভূত হয়ে যাক; আর আমাদের চিত্তে বল সঞ্চার করুক এই নব বিশ্বাসে যে মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাঁধনে রাজপথ নেই, জগৎ যেমন এক স্থানে বসে নেই মানুষও তেমনি তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে এক স্থানে স্থির হয়ে নেই–আর এই পরিবর্তনশীর পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিকার নয়, সদ্যজাগ্রত চিত্ততার। তাহলে আমাদের চোখের সম্মোহন ঘুচে যাবে। তখন জগতের সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের পর্যায়ের অবসান হবে।'

এভাবে সাধনার পথে বাঙালি মুসলমানও আধুনিক বিশ্বের 'দৃঢ়- মেরুদণ্ড সমন্বিত অকুতোভয় সৈনিকে রূপান্তরিত হোক, এই ছিল ওদুদের কাম্য। তিনি আশা করেছিলেন, 'ভবিষ্যতে ভীত সম্মোহিত মুসলমানদের পরিবর্তে মুক্তদৃষ্টি ভুমার প্রেমিক মুসলমানকে জগৎ পাবে'।

২.২ মুক্ত বুদ্ধির চেতনা

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান লেখক, তিনি এ প্রতিষ্ঠানকে নবজাগরণের আদর্শে উজ্জীবিত করে বাঙালি মুসলমান সমাজকে মুক্তবুদ্ধির চেতনা জাগ্রত করতে আজীন সাহিত্য সাধনার ব্রত গ্রহণ করেন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য ছিলো বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রধানত মুক্তবুদ্ধির উদ্বোধন ও সাহিত্য-অভিরুচির উৎকর্ষ সাধণ করা। জ্ঞানের রাজ্যে-মুসলিম সমাজের যুগ যুগান্তরের আড়ষ্ট বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে সাহিত্য-সমাজে তাঁদের একটা মর্যাদাপূর্ণ আসলে প্রতিষ্ঠিত করার সৎ বাসনা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করে। সমাজ বিন্যাসে প্রাগ্রসর চিন্তাচেতনা ও ধর্মীয় বিষয়ে কুংসস্কারমুক্ত ও যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্গণ তখন তাঁদের অভিমত প্রত্যয়-সিদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেন।'[৩৪]

ধর্মীয় গোড়ামি ও মুক্তচিন্তার অভাবহেতু আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রক্ষা করে মুসলিম সমাজ তখন এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। তাই দেখা যায় আধুনিক জীবনচেতনার নতুন বিন্যাস ও সাহিত্য সংস্কৃতির অভিনব বিকাশের একটা সুবর্ণ সময়েও ইংরেজি শিক্ষাবর্জিত অর্ধশিক্ষিত মুসলমানগণ বহুদনি পর্যন্ত আলোক বঞ্চিত স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ায় লালিত গতানুগতিক জীবনের ধারাকে ধারণ করেই তাঁদের মিলন ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। সুস্থ জীবন ধারা থেকে বঞ্চিত তৎকালীন এই মুসলিম সাহিত্য চিন্তার জড়তা থেকে মুক্ত করার আড়ষ্টতা, অন্যদিকে সাহিত্য-চিন্তার জড়তা থেকে মুক্ত করার প্রয়াসেই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর অভিলক্ষকে আবদুল ওদুদ বুদ্ধির মুক্তি রূপে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "বুদ্ধির মুক্তি, অর্থাৎ বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে

www.nagorikpathagar.org

মুক্তিদান–বাংলার মুসলিম সমাজে (হয়ত বা ভারতের মুসলমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।"

এই 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র অন্যতম উদগাতা হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদ সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন প্রধানত তৎকালীন জাতীয় জীবনের অনগ্রসরতা লক্ষ্য করে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়ে যখন উত্তরোত্তর উন্নত জীবনে স্বাদ আস্বাদন করছে, তখন মুসলিম জাতি ক্রমান্বয়ে তার থেকে পিছিয়ে পড়ছে–মুক্ত বুদ্ধির অভাবহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বজাতির এই পশ্চাদপদতা কাজী আবদুল ওদুদকে পীড়িত করে। এই বেদনা বোধ থেকে তিনি যেসব প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাতে উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর বিচার বুদ্ধির তীক্ষ্মতা, চিন্তার গভীরতা, সাহিত্য-মনস্কতা এবং মননশীল ও যুক্তিবাদী সত্যানুসন্ধান প্রয়াস। সত্যের খাতিরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁকে কখনো কখনো তার্কিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কিন্তু তাতে তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতাই প্রতিফলিত হয়। অজ্ঞানতার কঠোর সমালোচনা করতে তিনি মোটেই দ্বিধান্বিত হতেন না।

কাজী আবদুল ওদুদের 'শাশ্বত বঙ্গে' অন্তর্ভুক্ত মুক্তচিন্তার পরিপোষক কতকগুলো প্রবন্ধে জড়তা ও অন্ধ সংস্কারের আক্রমণ থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার জন্য কিছু উপদেশ বাণী বর্ষিত হয়েছে। 'শাশ্বত বঙ্গে'র লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, তথাকথিত শাস্ত্রবেত্তারা জ্ঞানেই হোক, কি অজ্ঞানেই হোক, সাধারণ লোকদের চোখ রাঙিয়ে শাসন করেন। অর্থাৎ তাদের মূঢ়তার সুযোগ নিয়ে সম্মোহিত করে রাখেন। সাধারণ লোকের দৌর্বল্য এই যে, তারা শাস্ত্র বোঝে না, তবে শাস্ত্রীয় কথা শুনতে ভালোবাসে, তাতে মনগড়া উপস্থাপনা থাকলে তো কথাই নেই। মানুষকে বশ করার সম্মোহনী প্রভাবের মধ্যে মানব কল্যাণ কতখানি সাধিত হয়, অথবা মানববুদ্ধি তাতে কতখানি প্রসারিত হয়, সে বিষয়ে একজন Free thinker উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু একজন অজ্ঞানের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। কুসংস্কার এভাবেই সাধারণ মানসে প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মের গোঁড়ামির দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি ও সেই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। বস্তুত মুক্তমন নিয়ে মুক্তবুদ্ধির প্রকাশ আনতে তখনকার অনেক বিবেকবান সাহিত্যিকই জোর ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। যা চিরকালের সত্য তাকে প্রকাশ করতেও মুক্তবুদ্ধির প্রসার প্রয়োজন, এবং মুক্তবুদ্ধির প্রসার ঘটলে যুগধর্মই যে তাতে দীপ্যমান হয় তা বলাই বাহুল্য এবং একথাও খুবই সত্য যে যুগধর্মের মধ্যেই বিকাশলাভ করে চিরন্তন ধর্ম।[৩৫] আবদুল ওদুদের কণ্ঠে যার প্রতিধ্বনি শুনি–"যুগধর্ম বাদ দিয়ে চিনার ধর্ম হয় নাই।" ইসলামকে যদি মুক্তচিন্তার অভিব্যক্তি দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে ইসলাম হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে আত্মার মুক্তি এবং এই আত্মার মুক্ত বিহারের জন্য প্রয়োজন কুসংস্কার বর্জিত মানবচেতনা, যা মানুষকে মুক্তি দেয় সামাজিক বা ব্যক্তিক জীবনে উৎকর্ষ ভূমে। জীবন ও জগৎ এক জায়গায় থেমে নেই, কাজেই মানুষের মুক্তির পথে সময়ের চলমান গতিকে রুদ্ধ না করে তাকে এগিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কাজী আবদুল ওদুদ এই চিন্তাকেই মানবাত্মার মুক্তির উপায় মনে করেছেন।[৩৬]

www.nagorikpathagar.org

ওদুদ ছিলেন ভাবযোগী পুরুষ এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজকে মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন করে তোলা। তাই তিনি বাংলার ধর্ম ভীরু ও বিচার বিচার বিমুখ মুসলমানের দৃষ্টি ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যের দিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। "সম্মোহিত মুসলমান" প্রবন্ধে তাঁর এ প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

"মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের কিছু মাত্র বিরোধ নেই। বরং ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ইসলামের যে প্রাণভূত তৌহিদের সাধনা, মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে-বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আল্লাহকে যে জানতে চায়, তার চিত্তে ভিন্ন বিচার, কাণ্ডজ্ঞান, অপরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা, প্রভৃতি মুক্তির লক্ষণ আর কোথায় যোগ্যভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া, ইসলামের তৌহিদের সাধনা জগতে কল্যাণ ও মুক্তির সহায়তা করে এসেছে, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। তৌহিদের বিশ্বাস দার্শনিক ইবনে রোশদের (Averroes) লেখা থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় চিত্তে শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় সন্দেহ জন্মেছিল, প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন থেকে বুদ্ধির এই মুক্তির স্থান ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসে অনেকখানি; মধ্যযুগের ঘোর তামসিকতা ভিতরে নানক কবীর প্রভৃতি ভক্ত সত্যকার আধ্যাত্মিকতার দীপ ভারতে পুনঃপ্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তাঁদের সামনেও শিখারূপে জ্বলেছিল ইসলামের তৌহিদ ও সাম্যবাদ, আর বাঙালী মুসলমানের জন্য সব চাইতে বড় সুসংবাদ এই যে, ভারতের নবজাগরণের যিনি আদি নেতা সেই মহাত্মা রাজা রামমোহনের উপর ইসলাম আশ্চর্যভাবে কার্যকরী হয়েছিল।"

'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধের শুরুতে ওদুদ বলেছেন, 'হজরত মোহম্মদ যে একজন মহাপুরুষ অর্থাৎ সত্য তিনি শুধু কথায় প্রচার করেন নি তা তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতরে এক আশ্চর্য দৃঢ় রূপ লাভ করেছিল'। এর পরেই ওদুদ বলেন, মহাপুরুষ 'সর্বজ্ঞ নন, মানুষের সর্বময় প্রভু নন, মানুষের জীবন-সংগ্রামে তিনি একজন বড় বন্ধু মাত্র', 'তাঁর কথা ও চিন্তার দ্বারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে একথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে' 'চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কেননা, সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য সেই আল্লাহ্‌র উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়–যে আল্লাহ চিরজাগ্রত, চিরবিচিত্র, বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন শুভ চেষ্টায় যাঁর মহিমা প্রকটিত হজরত মোহম্মদের অনুবর্তীরা সেই প্রাণপদ সদাস্মর্তব্য কথা অদ্ভুতভাবেই মন থেকে দূর করে দিয়েছিলেন'। অর্থাৎ 'মানব-মুকুট' আলোচনা প্রসঙ্গে ওদুদ যেমন মানুষরূপে হজরতের সাধনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এখানেও একই কথা। এর অতিরিক্ত হজরতের 'প্রেরিতত্বে' সম্মোহিত মুসলমানের যে ভয়বিহ্বল অবরুদ্ধতা, সেটিকে তিনি এ প্রবন্ধে 'এক প্রকাণ্ড প্রতিমার সামনে নতদৃষ্টি হয়ে' জীবনপাত বলে মনে করেছেন। কেননা তাঁর দৃষ্টিতে এটি হজরতের আদর্শ নয়। ওদুদ বলেন,–

'মানুষের সাষ্টাঙ্গ প্রণামকে এই মহাপুরুষ গ্রহণ করেননি। আর তাঁর আবিষ্কৃত যে বজ্রসার তৌহীদ (একেশ্বরতত্ত্ব), তাঁর অবলম্বিত যে আশ্চর্য অনাড়ম্বর সাংসারিক জীবন,

www.nagorikpathagar.org

আগ্নেয় সাম্যবাদ, আল্লাহর পানে সে-সমস্তের যে প্রচণ্ড আকর্ষণ, কিসের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্য যত বড়ই হোক, একথা স্বীকার করবার কিছুমাত্র উপায় নেই যে, সেই আল্লাহর উপলব্ধি, অন্য কথায়, সমস্ত জগতের সঙ্গে প্রেম ও কল্যাণের যোগের উপলব্ধি, আজ তাঁর অনুবর্তীদের দৃষ্টির সামনে নেই। জীবনের অর্থ যেন আধুনিক মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার, আত্মা, আনন্দ, এ সমস্তের গভীরতর যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।"

এভাবে ওদুদ হজরতের জীবনাদর্শ ও আল্লাহর চেতনার বিশেষ উপলব্ধি প্রকাশের মাধ্যমে মনুষ্য প্রকৃতি ও মুক্ত বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন আধুনিক মুসলমান গড়ে তুলবার পক্ষে ছিলেন। বাংলার জড়তাগ্রস্ত মুসলমানের জীবন-সাধনা তাঁর সেই উপলব্ধির পথ বেয়ে যেতে নবজাগরণের ছোঁয়া পায়–এই-ই ছিল ওদুদের কাম্য।[৩৭]

ধর্মকে যুগের কষ্টিপাথরে বিচার করে গ্রহণ করতে হলে মনকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত রাখতে হবে। কিন্তু মানুষের জীবনে সংস্কারের প্রভাব গভীর বলেই তার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে জাগ্রত বিবেক ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন। আর বুদ্ধির মুক্তি ঘটলেই মানুষের জীবনে এই গুণগুলোর বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর লেখকগণ এ কারণেই সবরকম সমস্যার সমাধানে বুদ্ধির মুক্তির ওপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

'বুদ্ধির মুক্তির সবচাইতে বড় জিনিস। যে মুক্ত বুদ্ধি মার্জিত রুচি, তার প্রাণে অসীম নিরাবিল আনন্দ সে-ই সংসারে পরম সুখী। সমাজ, ধর্ম, বিশ্বমানবতা ও আত্মার চিন্তা সবই বুদ্ধির মুক্তির উপর নির্ভর করে।'[৩৮]

'কোরআনের আল্লাহ' প্রবন্ধে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ভালমন্দের সঙ্গে আল্লাহ যে কিভাবে যুক্ত হয়ে আছেন সে সম্পর্কে তিনি মতামত তুলে ধরেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌কে সকল শ্রেষ্ঠগুণের আধার রূপে গুণান্বিত হয়ে ওঠার জন্য মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজ ইসলাম-ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর পালনে ও আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের উচ্চারণের মোহে ইসলাম ধর্মের ও আল্লাহর গুণাবলীর মর্মার্থ গ্রহণের দিকে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে বলে তিনি মনে করেন। অথচ "ধর্মের বিধি-নিষেধ কোনো নিষ্ঠুর প্রভুর কষ্টদায়ক হুকুম নয়, বরং সে-সব হচ্ছে জীবনকে উন্নতির দিকে পরিচালনার নিয়ম শৃঙ্খলা-নদীর ধারাকে পরিচালনা করার জন্য যেমন তার দুই-তীর।" ওদুদের মতে 'তাই ধর্ম যা জীবন বিকাশের সহায়ক আর তাই অধর্ম যা তেমন সাহায্য করে না, যেমন তাই খাদ্য যা বল দেয়, তা খাদ্য নয় যা বল দেয় না।'

উনিশ শতকে যে সব সংস্কার আন্দোলন ভারতীয় মুসলমান সমাজে দেখা দিয়েছিল তার দৃঢ় ভিত্তি ছিল মুসলমান শাস্ত্রে। বিশ শতকেও যে-কোন উদার চিন্তার পেছনে শাস্ত্রীয় সমর্থণ দেখানোর চেষ্টা হয়েছে– যেমন সংগীত চর্চা শাস্ত্রানুমোদিত কিনা তা নিয়ে তর্ক হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে তাঁরা শুধু শাস্ত্রকেই অবলম্বন করতে চান নি; শাস্ত্রের কথা ও শাস্ত্রনিরপেক্ষ বাণী উভয়কেই তাঁরা মর্যাদা দিয়েছিলেন মানবতাবাদের মাপকাঠিতে বিচার করে।

www.nagorikpathagar.org

রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে প্রবল প্রেরণা কাজী আবদুল ওদুদ লাভ করেছিলেন, তার তাৎপর্য ছিল সুগভীর। জীবন-সাধনার ক্ষেত্রে ইতিহাস আর ভূগোলের দ্বন্দ্বে বাঙালি মুসলমান বহুকাল বিড়ম্বিত হয়েছে। যে-ভূখণ্ডে সে বাস করেছে, তার সবটুকু ইতিহাস যে নিজের বলে স্বীকার করেনি; যে-ইতিহাস তার আপন, তার সৃষ্টি অতীত, প্রবাহমানতা বিদেশে। বস্তুত অধিকাংশ মুসলিম চিন্তাশীলেরই চেষ্টা ছিল অমুসলমানদের জীবন-সাধনার ধারা থেকে নিজের ঐতিহ্যকে সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র করে রাখা। এই দ্বন্দ্বময়তা থেকে উদ্ধারের পথ কাজী আবদুল ওদুদ সন্ধান করেছিলেন: তাই ইসলামের ইতিহাস আর ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মিলিয়ে দেখার প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি। মোতাজিলাদের চিন্তা, সাদীর কবিতা, আতাতুর্কের বিপ্লব, দাদু-কবীরের ভক্তিসাধনা রামমোহনের সংস্কার প্রচেষ্টা ও রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনকে একই সূত্রে গ্রথিত করা তাই সম্ভবপর হয়েছিল তাঁর পক্ষে। 'বাংলাদেশের শিক্ষিত হিন্দু সমাজে শতাধিক বৎসর যাবৎ চিন্তায় ও কর্মে বিশ্বধারার যে ঢেউ খেলে যাচ্ছে,' তাকে অগ্রাহ্য করে মুসলমানের জীবনে সার্থক নবজাগরণ আসতে পারে–একথা তিনি মনে করতেন না।

অনেকটা এই কারণে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছিল হিন্দু ভাবধারার বাহক হিসেবে। হিন্দুর বলেই যে ভাবধারা তিনি যেমন নির্বিচারে মেনেও নেন নি। উনিশ শতকের হিন্দু চিন্তানায়কদের প্রশংসা করেও তাঁদের নির্দেশকে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত জ্ঞান করেছিলেন। রামমোহনের সাধনার যে দুটি দিক তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তা হল নিরাকার উপাসনা প্রচলনের প্রয়াস আর বিচার বুদ্ধি ও লোকশ্রেয়ের আলোকে শাস্ত্রবিচারের উদ্যোগ। রামকৃষ্ণের অচলা ভক্তি ও বিবেকানন্দের সেবাধর্মও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল যেমন করেছিল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব। কিন্তু বৃহত্তর লোকসাধারণের কাছে তাঁদের যে-রূপ গ্রাহ্য হয়েছিল, আবদুল ওদুদের চিন্তার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।৩৯ তিনি তাই দুঃখ করে বলেছেন,–

'যারা তাঁর (রামমোহনের) অনুরাগী হলো তারা প্রতীকচর্চার প্রতি বিমুখ হলো সোৎসাহে, কিন্তু উন্মুক্ত হলো লোকশ্রেয়ের দিকে তত নয়, যত ভগবদ্ ভক্তির আতিশয্যের দিকে। রামমোহনের ঈশ্বরানুরাগের অথবা ব্রহ্মানুরাগের সঙ্গে লোকশ্রেয় নিত্যযুক্ত, সেই চিরন্তন উদার পথ তাঁর অনুরাগীদের জগতে এইভাবে বেঁকে গেল।'
আবার,

'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর মতো মহাজন দেশে বিপুলভাবে আদৃত হয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন এই বড় কারণে যে তাঁদের তাপস্যা সক্রিয় হতে পারেনি তাঁদের অনুরাগীদের অন্তরাত্মায়, তাঁরা বরং ব্যবহৃত হয়েছেন তাঁদের অভিমান, মুখ্যত স্বধর্মের অভিমান, চরিতার্থতার কাছে। কিন্তু অভিমান তাদের জীবনে অনর্থ না ঘটিয়ে কি আর করবে? অভিমান কেন, স্বদেশ-প্রীতির মতো মূল্যবান ভাবও মানুষকে সত্যকার কল্যাণ-পথে বেশী দূরে এগিয়ে নিতে পারে না যদি সেই স্বদেশ-প্রীতি গূঢ়ভাবে যুক্ত না থাকে সত্য-প্রীতি সর্বমানব-প্রীতির সঙ্গে।'

www.nagorikpathagar.org

ধর্মকে মেনে নিয়েও ধর্মচেতনার নতুন সংস্কার দাবী করেছেন আবদুল ওদুদ-এ তাঁর চিন্তাধারার একটি প্রধান অবলম্বন। যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির চর্চাকে তিনি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন বলে ধর্ম-বিষয়েও তার প্রয়োগ তিনি প্রত্যাশা করেছেন। ধর্মের নির্দেশের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির বিরোধ যেখানে অনুভব করেছেন সেখানে প্রাধান্য দিয়েছেন বিচার বুদ্ধিকেই। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃতি যোগ্য ঃ 'ইসলাম অথবা যে কোনো ধর্ম Rationalistic এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁরা Rationalism ও ধর্ম দুইয়ের সম্বন্ধে অত্যন্ত ভাসাভাসা কথা বলেন।' অনেকটা এই মনোভাবের জন্যে এবং এই মনোভাব থেকে যেসব কথা তিনি বলেছিলেন তার ফলে, তাঁকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল অমুসলমান বলে। এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন : আমাকে অমুসলমান বলেছেন। আমি কি তা পুরোপুরি তিনিই জানেন যিনি আমার স্রষ্টা।" জ্ঞান, যুক্তি, জিজ্ঞাসা–এ সবের আশ্রয় আবদুল ওদুদ নিয়েছিলেন পাণ্ডিত্যের অভিমান থেকে নেয়, তার্কিকের শুষ্ক বিচার বুদ্ধি থেকে নয়, প্রতিপক্ষকে বিড়ম্বিত করার আনন্দ থেকে নয়। এই পথ ধরে মানবহিতের লক্ষ্যে তিনি পৌঁছতে চেয়েছিলেন। তাঁর মানবপ্রীতি কাল ও ক্ষেত্রের সীমা স্বীকার করেনি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যেসব জ্ঞান সাধক ও চিন্তানায়ক মানবকল্যাণ ও প্রেমের সাধনা করেছেন, তাঁদের উত্তরাধিকার তিনি দাবী করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। তাঁর বিবেচনায়, 'ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও অকুণ্ঠিত মানব-কল্যাণ জিজ্ঞাসা আজো মানুষের শ্রেষ্ঠ আত্মিক সম্পদ।' রোমাঁ রোলাঁ গ্যেটের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধার উৎস এখানেই। 'কাজী আবদুল ওদুদ গ্যেটের শিষ্য ছিলেন। মানবাত্মার অপরিসীম বিকাশ সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। এই বিকাশের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই তিনি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন পরিচালনা করতেন।'[৪০] আধুনিক জগতের সমস্ত চিন্তাশীলের গুরু বলে স্বীকৃত গ্যেটের পরিচয় দিতে গিয়ে 'গ্যেটে' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,–

'.......গ্যেটে শুধু কবি নন, তিনি বিজ্ঞান বিৎ (বিজ্ঞানে তাঁর দান স্বীকৃত হয়েছে) চিত্র সমঝদার, শেষ বয়সে সঙ্গীত-সমঝদার, ধর্ম-তত্ত্বজ্ঞ, এমন-কি মরমী-সাধনার সঙ্গেও সুপরিচিত।'

তাই তাঁর মনে হয়েছে–

'গ্যেটে-সমুদ্রের হাওয়া মানস-স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য।' নজরুল ইসলাম, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' রস ও বক্তিত্ব ইকবাল, বাঙলার জাগরণ ইত্যাদি প্রবন্ধে মর্ম সন্ধান করলেই 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মর্মবাণীর পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধিকে শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করতে ওদুদ মানসে এ মার্সন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রোমাঁ রোলাঁ, তলস্তয়, শেখ সাদী প্রমুখ মনীষার আলো প্রেরণা সঞ্চার করেছে। তাঁর জীবনের গতিপথকে সঞ্জীবিত রেখেছেন হজরত মোহম্মদ, কামাল আতাতুর্ক ও রামমোহন রায়। রেনেসাঁসের মুক্তচেতনা ও ধর্মসমন্বয়ের চিন্তা থেকেই ওদুদ বাঙালি মুসলমান সমাজের সামনে রামমোহনের আদর্শকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টা এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ গঠনে গ্যেটের প্রেরণা তাৎপর্যময়। 'তিনি বুদ্ধির মুক্তিবাদী ও আস্তিক ছিলেন। মানবতাবাদ ছিল তাঁর কাছে আদর্শ। চিত্তের উদারতায় তিনি উপলব্ধি

www.nagorikpathagar.org

করেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের বিভক্তি বাঙালি সমাজ প্রগতির অন্তরায়। বুদ্ধির মুক্তি না ঘটলে বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। বাঙালি মুসলমান সমাজ যদি বাঙালি হিন্দুর সম্প্রসারণশীল বিকাশ প্রক্রিয়ার বিপরীতে প্রগতিবিমুখ থাকে তবে সামগ্রিকভাবে বাঙালির সম্মুখগতি পিছিয়ে যাবে। এ কারণেই তিনি শাশ্বত বঙ্গের উন্নতির জন্য নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।[৪১] জীবনীলেখক ও শিষ্য আবদুল কাদিরের তাই মনে হয়েছিল ওদুদ 'বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম ভাবুক ও চিন্তাবিদ।'

কুসংস্কারের পঙ্কিল আবর্তে জীবন্মৃত মানুষের মুক্তির লক্ষে কাজী আবদুল ওদুদ প্রতিপক্ষের চরম বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েও তাঁর ধ্যান ধারণালব্ধ চিন্তাচেতনাকে নির্বিকার নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেছেন। মানুষের কল্যাণ কামনায় এবং তা প্রকাশে তিনি স্বার্থান্বেষী মহলের ভীতি প্রদর্শনে বিচলিত হন নি, কোনো অমূলক উপদেশে বিভ্রান্ত হননি কিংবা কোনো অশ্রদ্ধেয় ক্ষমতার কাছে নতিস্বীকার করেননি।[৪২] তাঁর মনীষা ও সাধনায় বিভিন্ন স্তর পর্যবেক্ষণ করে সহজেই এই উপলব্ধি হয় যে কাজী আবদুল ওদুদের 'বুদ্ধি ছিল স্বচ্ছ, দৃষ্টি উদার ও চিত্ত নির্ভীক।' বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ভাবযোগী হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদের প্রসিদ্ধি। এর জন্য তিনি নির্যাতন সহ্য করেছেন, তবু পিছপা হন নি। সারা জীবন তিনি এর চর্চা করেছেন এবং এ বিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন যে, বুদ্ধি মুক্ত না হলে মানুষের তথা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব নয়।৪৩ সে সময়ের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তাই তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিবেক বিচার বিশ্লেষণে বিজ্ঞ সমস্ত ধরণের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিমুক্ত, মুক্ত বুদ্ধির চর্চাকারী মোহমুক্ত মানব কল্যাণকামী মহত্তম মানুষ। তাঁর মুক্ত বুদ্ধির চেতনা বহু বিশিষ্ট ক্ষেত্রে আজ উল্লেখ যোগ্য বিজয় লাভ করেছে। আমাদের সমাজে অসাম্প্রদায়িক চেতনার সমৃদ্ধিতে, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে, জীবনকে নতুন করে দেখবার প্রয়াসের মধ্যে নিহিত রয়েছে কাজী আবদুল ওদুদের মুক্ত বুদ্ধির চেতনা।

২.৩ প্রগতিশীল চিন্তা

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজে কাজী আবদুল ওদুদের চিন্তা ও মনীষার একটি ইতিবাচক প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। বাঙালি মুসলমান সমাজের দৃষ্টি যখন অতীতমুখী, অনেকাংশে বাস্তবতা-বর্জিত; তখন মধ্যযুগীয় ধর্মাচ্ছন্নতায় ও গোঁড়ামি শুধু ব্যক্তি বা জাতিকেই নয়, সমগ্র দেশ ও রাষ্ট্রকে নিয়ে গেছে অন্ধকারময় জগতে। বিপথগামী হয়েছে তরুণসমাজ। জাতি হারিয়েছে তাঁর সত্যিকার দিকনির্দেশনা; এবং সমগ্র দেশ ও রাষ্ট্র নিপতিত হয়েছে হতাশার গহ্বরে। এ-অবস্থায় মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার অভিপ্রায় ও উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ।

উনিশ শতক বাঙালিদের জন্যে জাগরণ ও সংস্কারের কাল। এই জাগরণের অগ্রযাত্রী ও অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব রামমোহন রায়। কাজী আবদুল ওদুদ রামমোহনের সংস্কার-চিন্তা ও উদার মানবিক ব্যক্তিত্বে মোহিত হয়েছিলেন। ওদুদ মানস গঠনের পেছনে রবীন্দ্রনাথ ও গ্রেটে ভূমিকাও সুদূরপ্রসারী ও গভীর।[৪৪] তাঁর জীবনীকার

www.nagorikpathagar.org

খোন্দকার সিরাজুল হক আমাদের জানিয়েছেন, "তিনি মুক্ত মন দিয়ে সবকিছুকে বিচার করেছে, তা ধর্মই হোক বা সমাজব্যবস্থাই হোক–কোনো 'ইজম'-এ প্রভাবিত হয়ে কখনো মনের জানালাকে বদ্ধ করে দেন নি। এজন্য ধর্মান্ধদের কাছে তিনি যেমন নিন্দিত হয়েছেন তেমনি নিন্দিত হয়েছেন সমাজবাদীদের কাছে। মৌলিক প্রতিভার ধর্মই এই যে, তাঁরা কখনো দলের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে স্বকীয়তাকে বিজর্সন দিতে পারেন না। নজরুলের মতো ওদুদও তাই যোনো 'ইজম'-এর দাসত্ব করতে পারেননি। ওদুদের সাহিত্যের মূলমন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। তিনি এই বুদ্ধির মুক্তির প্রেরণা পেয়েছিল মুস্তফা কামালের উদ্যম থেকে, রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী নজরুলের উদার মানবতাবোধ ও যুক্তিবাদ থেকে, গ্যেটে- রোমাঁ রোলাঁর স্বাধিকার চেতনা থেকে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-মোতাজেলাবাদীদের বিচার-বুদ্ধির আদর্শ থেকে।"[৪৫]

বাঙালি মুসলমান সমাজকে, তার জাগৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্মেষ লগ্ন থেকেই সুচিন্তা, যুক্তি, মানবতা, সত্য, ন্যায় ও কল্যাণ-ভাবনায় উদ্বোধিত করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। মানুষকে তিনি দিতে চেয়েছেন মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দিয়েছেন দার্শনিক দিক-নির্দেশনা। বাঙালির উন্নতি ও প্রাগ্রসতার মূলে তিনি যে প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করেছেন তার একটি প্রচিলত ধর্ম, অন্যটি জাতিগত বিদ্বেষ।[৪৬] এ কারণে ওদুদের প্রগতিশীল চিন্তা আবর্তিত হয়েছে ধর্মের নানা অনুশাসন, বিধি-বিধান এবং হিন্দু-মুসলমান জাতিগত সমস্যাকে কেন্দ্র করে। তিনি তাই সর্বপ্রথম ধর্ম সমাহিত বাঙালী মুসলমানের চিন্তার সংস্কার সাধন করতে চেয়েছেন। কেননা মুসলমানের গোঁড়ামি ও পশ্চাৎপদতার এক বড় কারণ ধর্মমুগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি। অত্যন্ত সাহসিকতা ও যুক্তির সঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ ধর্মের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মোহন– প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করে তাদের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করেছেন। হযরত মোহাম্মদের জীবনকে যুক্তিহীন ও পরিবর্তণমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অন্ধভাবে অনুসরণ করার পক্ষে তিনি ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য থেকেই উদ্ধৃত করা যাক:

'মহাপুরুষ যে সর্বজ্ঞ নন, মানুষের সর্বময় প্রভু নন, মানুষের জীবন-সংগ্রামে তিনি একজন বড় বন্ধু মাত্র অবশ্য যেমন বন্ধু সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোকস্তম্ভ; তাঁর কথা ও চিন্তার ধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে একথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে যে চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কেন না, সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য সেই আল্লাহর উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়– যে আল্লাহ চিরজাগ্রত, চিরবিচিত্র, বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন শুভ চেষ্টায় যাঁর মহিমা প্রকটিত, হযরত মোহাম্মদের অনুবর্তীরা সেই প্রাণপদ সদাস্মর্তব্য কথা অদ্ভুতভাবেই মন থেকে দূর করে দিয়েছেন; হয়তো তারই ফলে অন্যান্য ছোটখাটো প্রতিমার সামনে নতজানু হওয়ার দায় থেকে কিছু নিস্কৃতি পেলেও 'প্রেরিতত্ব' রূপ এক প্রকাণ্ড প্রতিমার সামনে নতদৃষ্টি হয়ে তাঁরা যে জীবনপাত করেছেন, আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা সাংসারিকতা সবদিক থেকেই তা শোচনীয় রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত।'

www.nagorikpathagar.org

এভাবেই সম্মোহিত মুসলমানের 'কুয়াসাচ্ছন্ন বর্তমান', দিগ্‌দেশবিহীন অতীত' এবং শূন্য ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ। 'প্যান-ইসলাম' কিংবা ইসলামি পুনরুজ্জীবনবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। পরিবর্তনমান সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সাপেক্ষে ধর্ম অনুশাসন এবং বিধানকে তিনি বিবেচনা করেছেন।[৪৭] 'তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজকে মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন করে তোলা। তাই তিনি বাংলার ধর্মভীরু ও বিচার বিমুখ মুসলমানের দৃষ্টি ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যের দিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।'[৪৮] তিনি বলেছেন,–

'যুক্তি বিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবন পথে বাস্তবিকই এ যে মানুষের এক অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটলে পূর্বানুবর্তিতা পাষাণভাবের মতই মানুষের জীবনের উপরে চেপে বসে, দেখতে দেখতে তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ শুদ্ধ ও শীর্ণ হয়ে আসে।'

ওদুদ অতি সংক্ষেপে ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এর ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করেছেন। স্মরণ করেছেন তিনি মোহাম্মদের মৃত্যু–পরবর্তী আরবের আদিম উচ্ছৃঙ্খলতা ও পারস্যের বিলাস-মত্ততার মাঝখানে সত্যিকার ইসলামি আদর্শের বিপন্নতার কথা। ধর্মের নানা সংস্কার সাধন ও চিন্তার পরিবর্তনের কথা বললেও একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, কাজী আবদুল ওদুদ উগ্র ইসলাম-বিরোধী ছিলেন না। তিনি ইসলামরে কল্যাণ সাধনা, ন্যায়নপরায়ণতা, সাম্য ও মৈত্রীর বীর্যবন্ত সাধনার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। তবে পরিবর্তিত পৃথিবীর নতুন সমাজ-ব্যবস্থা ও প্রয়োজনের আলোকে। কর্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। অলৌকিক বিষয়ের প্রতি তিনি আস্থা স্থাপন করেন নি। তিনি বলেছেন :

'মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাঁধানো রাজপথ নেই, জগৎ যেমন একস্থানেই বসে নেই মানুষও সেখানে তাঁর পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে একস্থানে স্থির হয়ে নেই–আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিতার নয়, সদাজাগ্রতচিত্ততার।–তাহলে আমাদের চোখের সম্মোহন ঘুচে যাবে।'

যুক্তিনিষ্ঠা এবং সুগভীর অন্বেষণপ্রবণতা ওদুদের প্রগতিশীল চিন্তার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ধর্মান্ধ জাতির কাছে ধর্মগ্রন্থ এবং সৃষ্টিকর্তা সর্বদাই দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় তাই অনাপন। মুসলমান সমাজের দিকে ভালোভাবে তাকালেই দেখা যাবে ' কোরআন' সম্পর্কে প্রায় সকলের মনেই এক ধরনের ধর্মমুগ্ধ ভীতি; একই ভীতি 'আল্লাহ' সম্পর্কেও। এর কারণ আল্লাহকে মুসলমান বিশ্বাস ও ধর্মাবেগ দিয়ে যতটা গ্রহণ করেছে, যুক্তি ও অন্বেষা দিয়ে ততটা বিবেচনা করে নি। এ-বিষয়টি কাজী আবদুল ওদুদ চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর 'কোরআনের আল্লাহ' প্রবন্ধে। কোরআন ও হাদিস বর্ণিত উক্তিসমূহ স্মরণ করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মুসলমানের জীবনে আল্লাহর বিচিত্র গুণাবলী সমন্বিত নামসমূহের উজ্জীবনের মাধ্যমে সুন্দর জীবনযাপন সম্ভব। তাঁর মতে;

'আল্লাহ পরম সুন্দর এই ভাবনা আমার ভিতরে দিন দিন এনে দিচ্ছে আমার নিজের সমস্ত কাজে ও চিন্তায় সুন্দর হবার তাগিদ। তেমনি ধরুন–তাঁর করুণাময় নাম।

www.nagorikpathagar.org

তাঁকে করুণার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে বুঝে আমি চেষ্টা করছি সেই করুণাময় ভাব আমার মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলতে।.....আল্লাহ বলতে আমরা বুঝছি জীবনের এক অন্তহীন অগ্রগতির তাগিদ...।'

এভাবেই কাজী আবদুল ওদুদ ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের মতন আবেগ ও বিশ্বাসনির্ভর এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়েও সঞ্চারিত কনের রেনেসাঁসোত্তর যুক্তিবাদ, মানবধর্ম ও ব্যক্তিস্বাশ্রয় চিন্তা।[৪৯]

সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ রস ও ব্যক্তিত্বকে সমান গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছেন তিনি এভাবে 'ব্যাপক অর্থে মানুষের সমস্ত লিপিবদ্ধ চিন্তাভাবনাকে সাহিত্য বলা যায়।' কিন্তু যদিও প্রাচীন সাহিত্য তথা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বিচিত্র রসের কথা বলা হয়েছে। এবং 'বাক্যং রসাত্মক কাব্যম্' একথা বলতেও দ্বিধা করেন নি অলঙ্কারিকেরা; কিন্তু একালের সাহিত্য বলতে ওদুদ রসের সঙ্গে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গটিকে অবিচ্ছেদ্য মনে করেছেন। রস সাহিত্যকে মনোহর করে তোলে সন্দেহ নেই; কিন্তু 'মনোহারিতার' সঙ্গে মহাপ্রাণতাও ওদুদের কাম্য। আর তাঁর মতে এই মহাপ্রাণতা আসে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব থেকে, তাঁর মহত্ত্ব থেকে' একারণে শ্লেগেলের রচনায় জীবনের মাধুর্য এবং মহাপ্রাণতার অনুপস্থিতি দেখে গ্যেটে যে সমালোচনা করেছিলেন তাকে যথার্থ বলে সমর্থন করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। রসের সঙ্গে সাহিত্যের ব্যক্তিত্বের যে অন্তরঙ্গতার কথা ওদুদ তুলেছেন, সেই ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব থেকেই অর্জিত। তবে এই ব্যক্তিত্ব সুলভ নয়, এবং তা মহৎ সাহিত্যিকের অন্যতম লক্ষণ। কাজী আবদুল ওদুদ বলতে চেয়েছেন,–

'রস যত মনোহর হোক একালে আমাদের ম[illegible]ষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে সাহিত্যে ও শিল্পের ব্যক্তিত্বের দ্বারা, এমন কি, সাহিত্য ও শিল্পের সমস্ত মাধুর্য সমস্ত কলাকৌশলে ব্যক্তিত্বের স্পর্শটুকু আবিষ্কার করতে না পারলে আমাদের শিল্প ও সাহিত্য উপভোগ আজ আর পূর্ণাঙ্গভাবে হয় না। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই অতি গভীর ব্যাপার।

এই উপলব্ধির মাধ্যমে কাজী আবদুল ওদুদ প্রাচীন সংস্কৃতি আলঙ্কারিকদের অভিমতকে গ্রাহ্য করেও তাঁদেরকে অতিক্রম করে গেছেন। সাহিত্য রসের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের অনিবার্য সম্পৃক্তির কথা বলে তিনি মূলত আধুনিক সাহিত্য দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।[৫০]

প্রথম জীবনে কাজী আবদুল ওদুদের চিন্তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল গ্যেটে। কারণ গ্যেটের অসামান্য প্রতিভা তাঁর মানসলোকের পরিমার্জনে সহায়ক হয়েছিল। আধুনিক জগতের সমস্ত চিন্তাশীলের গুরু বলে স্বীকৃত গ্যেটর পরিচয় দিতে গিয়ে ' গ্যেটে' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,–

'.....গ্যেটে শুধু কবি নন, তিনি বিজ্ঞান বিৎ, চিত্র সমঝদার, শেষ বয়সে সঙ্গীত সমঝদার ধর্ম তত্ত্বজ্ঞ এমনকি মরমী সাধনার সঙ্গেও সুপরিচিতি।' তাই তাঁর মনে হয়েছে–

www.nagorikpathagar.org

'গ্যেটে-সমুদ্রের হাওয়া মাননস-স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য।' সর্বগুণের উর্দ্ধে গ্যেটের মানবিক বোধ ওদুদের কাছে প্রধান গুণ হিসাবে বিবেচিত, 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ 'দুইকালের দুই মহাভাবুক ও মহাশিল্পী।' কালিদাস আজ অতীত হলেও কালজয়ী মহিমায় মণ্ডিত। কালিদাস যথেষ্ট ভোগবাদী আর রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য বাবে আনন্দবাদী এবং বিকাশধর্মী মানবতাপন্থী। 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে নজরুলের প্রগতিশীল চিন্তা বড় হয়ে উঠেছে। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা শুধু ধর্মধ্বজীদেরকেই, বিক্ষুব্ধ করে তুলেনি, সাহিত্যিক মহলেও যথেষ্ট বির্তকের সৃষ্টি করেছিল। বিদ্রোহী কবিতাতেও দেখা যাচ্ছে, একদিকে নিজের ভিতরে অনুভব করার মত সাইক্লোসেরন শক্তি অন্যদিকে চপল মায়ের কাঁকন চুড়ির কনকন কবিকে করেছে মুগ্ধ। "এ কথা সত্য যে, বিদ্রোহী'র আকর্ষণ কবিকে বাস্তবিকই ঘরছাড়া করেছিল।......বিদ্রোহীতেই কবি নিজের শক্তি সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন। সেই চেতনার দুইটি ধারা–একদিকে তাঁর অন্তরে জাগে অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়, অন্যদিকে তিনি নিজেকে জ্ঞান করেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে দুঃস্থ মানবতার অগ্রনায়ক।" 'শতবর্ষ পরে রামমোহন' প্রবন্ধে সদ্য স্বাধীন দেশের সম্মুখে রামমোহনের নেতৃত্বের অধিকার ঘোষণার মধ্যদিয়ে ওদুদ মূলত জাতিকে দিক নির্দেশনাই দিয়েছেন।

কাজী আবদুল ওদুদ ইসলাম 'ধর্মের মূল কথা' বা ধর্মভাব বলতে বুঝিয়েছেন 'আদর্শের বা শ্রেষ্ঠ চিন্তার একান্ত আনুগত্য'–যেমন সত্য কল্যাণে অথবা কল্যাণ–বিধাতায় বা আল্লাহতে আত্মসমর্পণ। মধ্যযুগের মরমী সাধক কবীর যেখানে পরমাত্মার সাযুজ্য লাভের অনুভূতিতে বুঁদ হয়ে বলেছেন: "তিনিই মহানন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করছেন এবং রূপের তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছে,-সকল চৈতন্যের মধ্যে সকল আনন্দের মধ্যে সকল দুঃখের মধ্যে তিনি মগ্ন হ'য়ে আছেন।' সেখানে আবদুল ওদুদ আত্মসমর্পণবাদের আধুনিক গতিশীলতার তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে, ব্যক্তিসত্তার বিরামহীন বিকাশের গতিতেই আল্লাহর উপলব্ধি ও অনুধ্যান।

হযরত মোহম্মদের অসামান্য জীবন ও পবিত্র বাণী, মোতাজিলাদের যুক্তিবাদ ও সুফীদের অন্তর্জোতিবাদ থেকে আবদুল ওদুদ পেয়েছিলেন তার চলা পথের পরম প্রেরণা। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও গ্যেটে প্রমুখ মানব শ্রেষ্ঠদের অমূল্য নির্দেশ সে পথে অনূদিত অনির্বাণ রেখেছে বিচিত্র আলোকবর্তিকা। জ্ঞান ও কল্যাণ, অন্য কথায়, সত্যাশ্রয়িতা ও লোক প্রেম, এই ছিল এই অতন্দ্র সাধকের জীবন ধর্ম। কোনো সংস্কার বা মোহ তাঁর এই সুদৃঢ় ধর্মবোধকে আচ্ছন্ন করতে পারেন নি। আজকের অন্ধ ভোগবাদ ও উলঙ্গ হানাহানির দিনে তাঁর উদার মানবিকতার আদর্শ ও সত্যে সর্বস্ব সমর্পণের আবেদন আমাদের বিকেককে করুক জাগরিত–আমাদের আত্মার বিকাশের পথ করুক অবারিত।[৫২]

২.৪ সমাজ ভাবনা

কাজী আবদুল ওদুদ সমাজ বলতে মূলত সমগ্র বাঙালি সমাজকেই চিহ্নিত করেছেন। ওদুদের সমাজ ভাবনার মূল প্রেক্ষণবিন্দু ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং বাঙালি

www.nagorikpathagar.org

মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা। সমাজচিন্তক ওদুদের সমাজ ভাবনা ছিল দেশ-কাল-সমাজ-উন্নয়ন ভাবনায় নিবেদিত।

সমাজ-সমস্যার গভীরে তাঁর মরমী ও সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। তমসাপীড়িত সমাজের বিবরে আলো ফেলেছেন। স্বসমাজের মূর্খতা-অজ্ঞতা মোচন করে জড় সমাজকে চলিষ্ণু করতে চেয়েছেন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করতে গিয়ে যুক্তি ও বিবেচনার আয়ুধ নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতা ও বৈরিতায় বিপর্যস্ত হয়েছেন, কিন্তু পরাভব মানেননি।'[৫২]

বাঙালি মুসলমান সমাজের পশ্চাৎমুখিতার মূলে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির অভাবই ছিল মুখ্য। ওদুদ মুক্ত মন নিয়ে সমাজের সঙ্কট বিবেচনা করেছেন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'কে আশ্রয় করেই ওদুদের সমাজসংলগ্ন বাঙালি-মুসলমান সমাজের জাগরণের প্রত্যাশায় ওদুদ সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও যুক্তির মাধ্যমেই মুক্তির পথ সন্ধান করেছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের তন্দ্রাচ্ছন্ন অতীতপ্রীতি। কূপমণ্ডুকতা, গোঁড়ামি তৈরি করেছিল তীব্র হতাশার। সমাজ ছিল বিধ্বস্ত, বিপথগামী, দিকনির্দেশনাহীন। ওদুদ বিবেকের দায়বদ্ধতা, যুক্তির সহিষ্ণুতা, মেধা ও মনীষার দীপ্তির সাহায্যে বাঙালি মুসলমানের সঙ্কট, সংকোচের বিহ্বলতা দূর করেছেন।'[৫৩]

বাঙালি মুসলমান সমাজ ছিল সম্মোহিত, তবে কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে ভরপুর। মুসলমান মানসকে গোমরাহী, অন্ধবিশ্বাস, নানারকম সংস্কার, অলৌকিকত্ব আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ওদুদ মনে করেন অন্ধ অনুবর্তিতার পথে নয়, আচার ও আড়ম্বরের সমস্ত আবরণ সরিয়ে মুক্ত, উদার বিচার-বুদ্ধির পথেই ধর্মের সংস্কার করতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে তিনি উপলব্ধি করে যেন কখনো চরম উচ্ছৃঙ্খলতার বাড়াবাড়ি, কখনো অনুবর্তিকতার বাড়াবাড়ি। পৃথিবী গতিশীল, মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। কল্যাণ ও মুক্তির পথে সবল কাণ্ডজ্ঞান, জ্ঞান, চিন্তা, কর্ম, সাম্য বিবেচনায় রেখে ওদুদ ধর্মকে সমন্বয় করার পক্ষপাতী ছিলেন।[৫৪] ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধটি সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজে বেশ গুরুত্ব লাভ করে। রক্ষণশীল মুসলমান ও প্রগতিশীল মুসলমান সমাজের মধ্যে আলাদা বিভেদ রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রবন্ধে ওদুদ জড়তাগ্রস্ত মুসলমান সমাজকে একটু বেশি করে ঘা দিয়ে জাগাবার যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সেটিকে রক্ষণশীল দল হাতিয়ার হিসেবে অপপ্রয়োগ করার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁদের সে অপপ্রয়োগ যে কত যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন তার কালই প্রমাণ করেছে। আসলে ওদুদ এ প্রবন্ধটিতে যা বলতে চেয়েছেন তা সত্যিই ভেবে দেখভার মতো, মুসলমান সমাজ, বিশেষত বাংলার মুসলমান সমাজকে চরম অধঃপতন ও পশ্চাৎপদতার ভীতিপ্রদ অবস্থা থেকে উদ্ধারের লক্ষে ওদুদ এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের গোড়ার দিকে ওদুদ যখন এ বিষয়ে ভাবছেন, তখন তিনি দেখতে পান সে সমাজে অনুসন্ধিৎসা, বন্ধ, যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ অন্তর্হিত, মনুষ্যত্ব অর্জনের চেষ্টাই নেই; উপলব্ধিহীন অন্ধ-অনুবর্তিতা, দুরুদ-পাঠ, কোরআন-চুম্বন, শাস্ত্র নিয়ে আন্দোলন এ-ই হয়েছে তাদের ধর্ম। আধুনিক বিশ্বের উপযোগী জীবন-গঠনের প্রয়াস তো নেই-ই, এমনকি সেই

www.nagorikpathagar.org

প্রেক্ষাপটে 'ইসলামকে সম্পূর্ণ নূতন করে বুঝবার প্রয়োজনীয়তা' ও তাঁরা উপলব্ধি করছেন না। এর কারণ হিসেবে ওদুদ মনে করলেন, তাঁরা সম্মোহিত, বশীভূতের মতো তাঁদের বিচার-বিবেচনা-শক্তি লোপ পেয়েছে। তাঁর ভাষায়, 'সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতারও চরম দশা বলা যেতে পারে, তার মানবসুলভ সমস্ত বিচার-বুদ্ধি, মানস-উৎকর্ষ, আশ্চর্যভাবে স্তম্ভিত। বর্তমান তার জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন, দিগ্‌দেশবিহীন, অতীত ভবিষ্যৎ তার নেই।' ওদুদের মতে, এই যে মুসলমান সমাজে সম্মোহনের ভয়ংকর রূপ দাঁড়িয়েছে, সে সম্মোহন অনেক পূর্বে ছিল; তবে সেটির গ্রহণযোগ্যতা ভিন্ন দিক থেকে। তিনি বলেন, 'মনে হয়, এ সম্মোহনের একবড় কারণ হজরত মোহম্মদের মহাজীবনই। সে জীবন তপস্যায়, প্রেমে, কর্মে বিচিত্র ও বিরাট। নানা দুঃখ-দহনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার ফলে প্রখর তার ঔজ্জ্বল্য; তার উপর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মানুষের হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো চিরকালই পৌত্তলিক; কিন্তু হরজত মোহম্মদের ব্যক্তিত্বের এই প্রাখর্যের জন্যই হয়ত মুসলমান-ইতিহাসের অনেক শক্তিধর পুরুষ ও তার সম্মোহনের নাগপাশ এড়িয়ে যেতে পারেন নি।' প্রসঙ্গ ক্রমে ওদুদ হজরত ওমর ও ইমাম গাজ্জালির কথা উল্লেখ করেছেন এবং এঁরা যে তাঁদের বীর্যবত্তা ও সাধারণ পরিপূর্ণতা সত্ত্বেও চূড়ান্ত আদর্শ হিসেবে 'হজরত মোহম্মদের মহাদৃষ্টান্তের' অনুস্মরণকে সর্বসাধারণের জন্য নিরাপদ ভেবেছিলেন তার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েও ওদুদ গাজ্জালির মৃদু সমালোচনা করেছেন। গাজ্জালি সর্বসাধারণের দর্শন চর্চাকে বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন। ওদুদ বলেন, 'গোটা দর্শনচর্চার বিরুদ্ধে তাঁর যে প্রতিবাদ তাকে অত্যন্ত দোষাবহ বলা ভিন্ন উপায় নেই। যুক্তি বিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবনপথে বাস্তবিকই একে মানুষের এক অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটবে পূর্বানুবর্তিতা পাষাণভারের মতনই মানুষের জীবনের উপর চেপে বসে, দেখতে দেখতে তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে যায়। মূলত এর মাধ্যমে ওদুদ বাঙালি মুসলমান সমাজে যুক্তি, বিচার ও বুদ্ধির চর্চার প্রসার ঘটানোকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং শাস্ত্রানুগত্য ও পূর্বানুবর্তিতাও যেন কথা সম্ভব এর ভেতর দিয় আসে, তা কামনা করেছেন।[৫৫] ওদুদ কামনা করেছেন বাঙালি মুসলমান আজ আধুনিক বিশ্বের 'দৃঢ়-মেরুদণ্ড-সমন্বিত অকুতোভয় সৈনিকে' রূপান্তরিত হোক, এবং একান্ত এ আশাও তার ছিল 'ভবিষ্যতে ভীত সম্মোহিত মুসলমানের পরিবর্তে মুক্ত দৃষ্টিভূমার প্রেমিক মুসলমানকে জগৎ পাবে।'

'বাঙ্গাল জাগরণ' প্রবন্ধে রাজা রামমোহন রায়কে বাংলার নবজাগরণের 'প্রভাত-সূর্য' রূপে উল্লেখ করে ওদুদ বলেন, 'এই শর্ত বৎসরেও আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেননি যাঁর আদর্শ রামমোহনের আদর্শের সঙ্গে তুলিত হতে পারে।' ওদুদের বিশ্বাস, এই শত বৎসরে এদেশে যে সমস্ত ভাবুক ও কর্মী জন্মেছেন তাঁদের প্রয়াসকে পাদপীঠরূপে ব্যবাহার করে এর উপর রামমোহনের আদর্শের নব-প্রতিষ্ঠা করলে দেশের জন্য সত্যকার কল্যাণের কাজ হবে। ওদুদ তাই বাঙালি তরুণ-সমাজকে রামমোহনের জীবন ও রচনা থেকে অনুপ্রাণিত হতে বলেছেন। ওদুদ রামমোহনের উত্তরাধিকার হিসেবে একে একে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ব্রহ্মানন্দ,

www.nagorikpathagar.org

কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের অবদান পর্যালোচনা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অভিমত, 'সংসারনিষ্ঠা জ্ঞানানুশীলন স্পৃহা সমস্তের ভিতরে ঈশ্বর-প্রেমই ছিল তাঁর অন্তরের মুখ্যত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারক রূপে দেখেছেন। অপর দিকে অক্ষয়কুমার মত প্রকাশ করেছেন, রাজা রামমোহনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার; জ্ঞানানুশীলন ভিন্ন অন্য রকমের প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। তাঁর বিখ্যাত সমীকরণটি এই :

প্রার্থনা+পরিশ্রম=শস্য
পরিশ্রম=শস্য
সুতরাং প্রার্থনা=০

ওদুদ বলেন, অক্ষয় কুমারের এই মনোভাব ব্রাহ্ম সমাজ ও ছাত্রমহলে কিছুদিন কার্যকর হলেও শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশই অধিকাংশ ব্রাহ্মের মনোজীবনে কার্যকর হয়েছে; কিন্তু মহর্ষি যদি বৃহত্তর মনীষা নিয়ে 'অক্ষয় কুমারকে আত্মসাৎ করতে পারতেন, তবে 'ব্রাহ্ম সমাজ তাঁর হাতে যে রূপ লাভ করত তা দেশের পক্ষে আরো কল্যাণদায়ক হতো।'

'শতবর্ষ পরে রামমোহন' প্রবন্ধে ওদুদ 'বাংলায় বা ভারতে' মহাগৌরবময় যুগের প্রবর্তয়িতা 'অতন্দ্রিত জ্ঞান ও লোকশ্রেয়ের পথের মহাপথিক' রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। এবং রামমোহনের পরবর্তী সাধক রামকৃষ্ণের 'অচলা ভক্তি', বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণ' বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্বের নবসংস্থাপন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখীতা, গান্ধীর সত্যপ্রীতি ইত্যাদি আলোচনা করে দেখান যে এঁদের সাধনা যথা মর্ম অনুধাবনে অধিকাংশ অনুরাগীই ব্যর্থ হন। তাই তাঁরা ধারার প্রতিষ্ঠা নেন; বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণ' পঞ্চাশের মন্বন্তরে নিঃশেষই হলো; আর অনুরাগীরা বঙ্কিমকে দেখলেন 'হিন্দুত্বের নব সংস্থাপক রূপে তাঁর হিন্দুত্বের অন্তরে যে ছিল সুনিবিড় মানসিকতা, সুগভীর ধর্মবোধ' সে-সব তাদের দৃষ্টিতে এলো না; 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখীতার অর্থ যে সত্যমুখীতা, প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড় মৈত্রী-বন্ধন, মানুষের জন্য সুগভীর কল্যাণ-কামনা' সে-সব তাঁদের চিন্তায় অর্থপূর্ণ হলো না এবং গান্ধীজীর 'অপূর্ব সত্যপ্রীতি, মানবপ্রীতি, জীবপ্রীতি তাঁর অনুরাগীদের অনুধাবনের বিষয়' হলো না। এই দুঃখেই ওদুদ স্মরণ করেন মহামতী কবীরের বাণী- যেখানে দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের সৎমতি আনতে ব্যর্থ হয়ে কবীর বলেছিলেন,

হিন্দু পূজে দেবতা
তুর্ক কাহু না হোঈ।

ওদুদের মতে, বর্তমান জগতে মানুষের ভেতরকার আদিম বর্বর প্রবৃত্তি-ভোগ ও প্রাধান্য-স্পৃহা, চক্রান্ত, জিঘাংসা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে; তাই 'আত্মা' 'সত্য' এ সব বাদ দিয়ে দেহই তাদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' ওদুদ তাই লোকশ্রেয়ের পথের পথিক রামমোহনের স্মরণদিনে 'অন্তরাত্মাকেই সক্রিয় করে' তোলার আহ্বান জানান। সদ্য-স্বাধীন দেশের সম্মুখে রামমোহনের নেতৃত্বের অধিকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে ওদুদ

www.nagorikpathagar.org

মূলত জাতিকে দিক নির্দেশনাই দিয়েছিলেন। সে নির্দেশনায় শুধু ভারতবাসী কেন, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতিই পথের দিশা পেতে পারে।[৫৬]

'কোরআনের আল্লাহ' 'শাশ্বত বঙ্গে'র একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে ওদুদ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর উপলব্ধিতে কোরআনের নির্দেশকে মানুষের শ্রেয়োলাভে কাজে লাগানোর প্রয়াস পেয়েছেন। আল্লাহর স্বরূপ উপলব্ধিতে ওদুদ মনে করেন, তাঁর স্বরূপ জিজ্ঞাসা কোরআনের অনভিপ্রেত; তবে তাঁর অনন্ত মহিমা ও গুণের কথা কোরআনে ভরপুর; ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ দৈনন্দিক তস্‌বিতে তা স্মরণ করেন, 'কিন্তু এই স্মরণ করার অর্থ যে শুধু মুখে উচ্চারণ করা নয় মন দিয়ে উপলব্ধি করা ও চরিত্রে এ-সবের প্রভাব ফুটিয়ে তোলা, সেই বড় কাজটাই চাপা পড়ে গেছে।' প্রসঙ্গক্রমে ওদুদ স্মরণ করেন– হজরতের বিখ্যাত বাণী : আল্লাহর গুণাবলীতে বিভূষিত হও, 'অর্থাৎ আল্লাহ বলতে যে-সব শ্রেষ্ঠ গুণ তোমার চিন্তায় আসে সে-সব নিজের ভিতরে সৃষ্টি কর।' দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌ পরম সুন্দর এই ভাবনা আমার ভিতরে দিন দিন এনে দিচ্ছে আমার নিজের সমস্ত কাজে ও চিন্তায় সুন্দর হবার তাগিদ। তেমনি ধরুন- তাঁর করুণাময় নাম। তাঁরে করুণার ভাব আমার মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলতে।' এ-ভাবে ওদুদ কোরআনে আল্লাহর ধারণাকে মানুষের দৈনন্দিক জীবনের বিকাশ ও অগ্রগতির সহায়ক করে তুলেছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মের সে-রূপ চর্চায় তার সে বড় লাভ হবে, তা বলাই বাহুল্য।[৫৭] তাই প্রবন্ধে ওদুদের সর্বশেষ উক্তি: 'পরম দুর্জ্ঞেয় আল্লাহ্‌কে কোরআন যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমন ব্যবহারযোগ্য করেছেন এ মানুষের এক বড় লাভ।'

'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে ওদুদ বলেছেন, ভারতবর্ষের এ কালের সাংস্কৃতির চিন্তার ইতিহাসে বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র ও পাঞ্জাবের ইকবালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এঁদের চিন্তায় সনাতন স্থিতিশীলতার সঙ্গে গতীশলতা মিশেছে, তা-ই হয়ত তাঁদের জনপ্রিয়তার রহস্য। কিন্তু ওদুদের মতে, 'সেকালের ধর্মের মতো একালের সংস্কৃতিরও মূল কথা হওয়া চাই সামাজিক উৎকর্ষ লাভ। আর যেহেতু সমাজের অর্থ একদিকে বিশ্ব-মানব-সমাজ অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ দেশগত ও রাষ্ট্রগত সমাজ, সে জন্য সংস্কৃতিও মূলত বিশ্বসামাজিক ও রাষ্ট্রিক। অন্য কথায়, যে চিন্তা জগতের অনেকের মনে অনুরণ জাগায় না এবং যার রাষ্ট্রিক সার্থকতা কম তা বাস্তবিকই স্বল্পমূল্য'। বাঙালি মুসলমান সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ওদুদ বলেন, বৌদ্ধ হিন্দু পাঠান আরব ইত্যাদি বিচিত্র উপাদানে এই সমাজ গঠিত; কিছু দিন পূর্বেও এই সমাজে দুটো শ্রেণী ছিল : একটি সম্ভ্রান্ত 'আশরাফ' অপরটি সাধারণ 'আতরাফ' এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান প্রায় ছিল না বললেই চলে-কতকটা হিন্দুর জাতিভেদের মত। আর এই 'আশরাফ' ও 'আতরাফ' শ্রেণীর মধ্যে দুই ভিন্ন রকমের মনোভাব কার্যকর ছিল; 'আশরাফ'রা প্রধানত অনুবর্তী ছিলেন ইসলামি সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা আর 'আতরাফ'দের জীবন সাধারণত তাঁদের পূর্বপুরুষের ধারায় চলেছে।[৫৮]

এইভাবে কাজী আবদুল ওদুদ সমাজের নানা সমস্যা তুলে ধরেছেন কিন্তু তাই বলে সমাজ সমস্যা-মুক্ত নয়। এক সমস্যা গেছে, অন্য সমস্যা যুক্ত হয়েছে। এ কথা সত্য

www.nagorikpathagar.org

যে, বাঙালি মুসলমান সমাজের বিচিত্রমুখী সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে ওদুদকে সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। তাই বলে আমাদের সমাজে ওদুদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। সমাজের কুসংস্কার গোঁড়ামি, হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ, উঁচু নিচ ভেদাভেদ, সামাজিক আচার আচারণ, ধর্মীয় ভণ্ডামি, শিক্ষা সংকট, অর্থনৈতিক শোষণ, আমাদের মনের অন্ধকার ও দারিদ্র্য দূর করতে ওদুদকে আজ বড় প্রয়োজন।

২.৫ রেনেসাঁসের চেতনা

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন মুক্তমনা, যুক্তিবাদী উদারপন্থী ও বাংলার রেনেসাঁসের পূজারী। প্রাচীন শিল্পবোধকে সামনে রেখে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়াই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের চেতনা। ইউরোপের ইতালীয় ফ্লোরেন্স শহরে এর প্রথম সূত্রপাত। 'ইউরোপের রেনেসাঁস শুধু ইউরোপের নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্যই একটি স্মরণীয় ব্যাপার। এরপর থেকে ধর্মান্ধতাও নানা কুসংস্কারের সীমা পেরিয়ে ইউরোপের মানব বুদ্ধি বিদ্যার বিচিত্র পথে জয়যাত্রা শুরু করেছে– যুক্তিবাদ, মনুষ্যত্ববোধ ও আধুনিকতার রাজপথেই এই জয়যাত্রা। মানুষ যেন এবার থেকে নূতন করে নিজেকে আবিষ্কার করল– মানব মনীষার বন্ধনমুক্তি ঘটল না বিচিত্র পথে, শিল্পে, সাহিত্যে, সংগীতে, ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও মনুষ্যত্ব চেতনায় তা নূতন করে সার্থক হয়ে উঠল এখন থেকে। গ্যেটে-প্রতিভা এই রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ ফসল-নব মানবতাবোধের এক মহিমোজ্জ্বল প্রতীক। রেনেসাঁস বা নবজন্মের ফলে জাতীয় মনীষার কিভাবে বন্ধনমুক্তি ঘটে, তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জার্মান জাতি।'[৫৯]

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে বাঙালি হিন্দু সমাজেও রেনেসাঁস তথা নবজন্মের কিছুটা আভাস দেখা দিয়েছিল। ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দু প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। ধর্মান্দোলন তথা শাস্ত্রের নবতর ব্যাখ্যায় বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বিবেকানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ; সাহিত্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ; চিত্রকলায় রবি বর্মা থেকে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দনাল; বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্ল চন্দ্র, মেঘনাদ সাহা; দর্শনে ব্রজেন শীল, অরবিন্দ, সুরেন দাশগুপ্ত, ইতিহাসে রমেশ দত্ত, যদুনাথ, রমেশ মজুমদার; রাজনীতিতে সুরেন্দ্র নাথ থেকে চিত্তরঞ্জন–এমনকি আরো বহুদিকে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর অর্থাৎ ইউরোপীয় বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে হিন্দু-প্রতিভা নানা দিকে সার্থক হয়ে উঠেছিল। তবে এই জাগরণের হাওয়া আমাদের গায়ে লাগেনি, আমাদের মনমানসে তোলেনি কোনো তরঙ্গ। কারণ আমরা পুরোপুরি বাঙালি কখনো হতে পারিনি। আমরা বাঙালি না মুসলিম এই অদ্ভুত দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোদুল্যমান ছিলাম। মুসলিম সমাজের রেনেসাঁসের একটু খানি অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে। সেদিন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন ছাড়াও কাজী আনওয়ারুল কাদির, কাজী মোতহার হোসেন, আবদুর রশিদ, সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী, আবদুল কাদির প্রভৃতিও প্রবন্ধে কিছুটা নূতন চিন্তার হাওয়া আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিছু প্রতিক্রিয়াশীল বাধায় ও অবস্থার হেরফেরে সাহিত্য সমাজের ক্ষুদ্র অঙ্কুর পল্লবিত হতে পারেনি, বরং সমূলে বিনষ্ট হয়ে লয় হয়ে গেছে। তাই বাঙালি

www.nagorikpathagar.org

মুসলমান রেনেসাঁসের অপূর্ব জীবন-চেতনা ও তাঁর দখল থেকে রয়েছে চিরবঞ্চিত। আজ রেনেসাঁসের ধর্ম ও মর্ম উপলব্ধির জন্য যে উচ্চ শিক্ষা অত্যাবশ্যক তার ক্ষেত্র অনেকখানি প্রসারিত এবং দেশ-বিদেশের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানও হয়েছে সহজতর। তবুও আমাদের মন-মানস রয়ে গেছে সম্পূর্ণরূপে মধ্যযুগীয় অভাবত্মক অর্থেই মধ্যযুগীয়। আমাদের অতি দীন ও ক্ষীণ সাহিত্য প্রচেষ্টার দিকে তাকালেই এই মধ্যযুগীয় মনোভাবের ইউরোপীয় রেনেসাঁসে শ্রেষ্ঠ সন্তান গ্যেটের সুদীর্ঘ জীবনের পরিচয় ও তাঁর সাহিত্য সাধনার পরিপূর্ণ চিত্র তাঁর দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে আবদুল ওদুদ স্বদেশের জন্য ও স্বসমাজের জন্যও কামনা করেছেন রেনেসাঁস অর্থাৎ ভার-রাজ্যে নবজাগরণ নতুন জীবনবোধ।[৬০]

কাজী আবদুল ওদুদের মানস পর্যালোচনার সাথে সাথে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা পর্যায়ক্রমে এসে যায়। কারণ তার চিন্তা ভাবনা ছিল এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনিই ছিলেন মুসলিমস সাহিত্য তা হল যুক্তিবাদীর দৃষ্টি, চিন্তা সংস্কারের দৃষ্টি, সমাজ-সংস্কারের দৃষ্টি সর্বোপরি রেনেসাঁসের দৃষ্টি।

চিন্তার গতানুগতিকতা থেকে ঐতিহ্যের অন্ধ অনুবর্তিকা থেকে তারা বাঙালি মুসলিম সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন অতীতের ইসলামের এবং বর্তমানের যা কিছু সুন্দর তা আত্মসাৎ করে দাঁড় করতে। যেন স্বাধীন মুক্ত সুস্থ উদার মানবতার আকাশ তলে বাঙালি মুসলিম ও বিশ্বজননী চিন্তার অংশীদার; আধুনিক জগতের প্রাগ্রসর সমাজ ও জাতি সমূহের সমপর্যায়ে দাঁড়াতে পারে, মুসলিম সমাজের কোন বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে নয়–এই সমাজ সম্বন্ধে সর্বব্যাপী উন্নতির কথাই ছিল সাহিত্য সমাজের বক্তব্য। সকল রকম ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি কুসংস্কার ও সমকালীন চিন্তাধারার ত্রুটি তারা উন্মোচন করেছেন। যে ছবি তোলা একদিন নিষেধ ছিল– আজ ধর্মের ক্ষেত্রে বা হজ্জ করতে যেতে হলে সে ছবির ছাড়পত্র ছাড়া গত্যন্তর নেই। সময়ের সাথে সাথে শাস্ত্র ও প্রভাবে বদলাতে শুরু করেছে।

তাই আমরা দেখি কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'শাশ্বত বঙ্গ' এর 'সম্মোহিত মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন,–'জগৎ যেমন এক স্থানে বসে নেই মানুষও তেমনি তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে একস্থানে স্থির হয়ে নেই-আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন– অন্ধ অনুবর্তিতা নয়, সদাজাগ্রত চিত্ততার।'

আবদুল ওদুদ 'শতবর্ষ' পরে রামমোহন' প্রবন্ধে বলেছেন, "যাঁরা বিশ্বাস করে, দেহই মানুষের বড় ব্যাপার, তার প্রয়োজন মিটিয়ে যদি সময় পাওয়া যায়-তবে 'আত্মা' 'সত্য' এ-সব কথা ভেবে দেখা যেতে পারে, তাদের পথ তা'রা অনুসরণ ক'রে চলেছে। কিন্তু আমরা যারা বিশ্বাস করি, আত্মা অর্থাৎ মনোজীবন যদি সক্রিয় না হয়, সত্য যদি সম্পূজিত না হয়, তবে কোনো প্রাচুর্যেই মানুষের কল্যাণ নেই, তাদের কী কর্তব্য?"

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি রামমোহনের অতন্দ্রিত জ্ঞান ও শ্রেয়োসাধনার পথকেই তাঁর দেশবাসীর জীবনে সার্থকতা লাভের পথ ব'লে নির্দেশ করেছেন; বলেছেন : "বহু-

www.nagorikpathagar.org

পুরাতন বহু জটিল ভারতীয় জীবনের সার্থক নেতৃত্বের অধিকার তাঁরই (রামমোহনেরই), তা যত বিলম্বে ও যত বিড়ম্বনার ভিতর দিয়েই দেশ সে কথা বুঝুক।"

রামমোহনের সাধনা থেকেই বাঙলার রেনেসাঁসের সূচনা। রেনেসাঁস অর্থ পুরাতন মূল্যবোধ ও মানব-মাহাত্ম্যের নতুন প্রতিষ্ঠা,-জ্ঞান অনুভূতি রূপ ও কল্পনার ক্ষেত্রে মানস- চেতনার সক্রিয়তা ও সৃষ্টিশীলতা। উদার জীবন-প্রীতি তথা বুদ্ধি বিচার প্রেম সৌন্দর্য প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলী অনুশীলনের ফলে বাঙলায় লাভ হয়েছে এই সোনার ফসল : জাতির নব-জাগরণ। কিন্তু দেশের দুঃস্থ দীন মুমূর্ষ মানুষকে যদি সকল প্রকার শোষণ ও পীড়ন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে মনুষ্যত্বের মহিমা ও জীবনের আনন্দ লাভ করবার সকল সুযোগ দেওয়া না হয়, তবে মিথ্যা ও ব্যর্থ এই রিনেসাঁস।[৬১]

কাজী আবদুল ওদুদ একদিকে যেন ইউরোপীয় মানবীয় বোধের শ্রেষ্ঠ প্রতীক মহাকবি গ্যেটের সাহিত্য ও জীবন কাহিনী লিখেছেন তেমনি রামমোহন রায়কে সনাক্ত করেছেন 'নবজাগরণের আদি নেতা' হিসেবে। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও পরবর্তী সাহিত্য সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন দৃষ্টি নিয় হিন্দু মুসলিম সমস্যার ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরেছেন। অপরদিকে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ইকবাল, নজরুল ইসলাম, মোতাজেলা দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রচুর পড়াশোনা ও আলোচনা করেছেন। তাই বলা যায় তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিক যার মনের দিগন্ত রেখা নিজ সম্প্রদায়ের সীমা ছাড়িয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে। আর এখানেই কাজী আবদুর ওদুদের উদার ও মুক্ত মনের সন্ধান মেলে।

তিনি ছিলেন উদার গণতন্ত্রীমনা। তাই মুসলমানের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়সমূহের স্বাধীনভাবে সমালোচনা করেছেন। কোনো অন্ধ গোঁড়ামি তার মাঝে ছিল না। তাই তিনি যুক্তির সাহায্যে দেখিয়ে দিয়েছেন কি ভাল, কি মন্দ- কোনো কাজের কতটুকু সামাজিক ও নৈতিক মূল্য এবং যুক্তিবাদের ও মূল্যবোধগুলোকে নতুন করে দেখতে চেয়েছেন। বলেছিলেন বহু শতাব্দী আগে মধ্য প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার চিন্তানায়কগণ যে সব চিন্তা করে গেছেন তাতেই মুসলমানদের যাবতীয় চিন্তার গতি ইতি হয়ে যায়নি এবং নতুন চিন্তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। যুগে যুগে নতুন চিন্তার প্রয়োজন ছিল এবং আজও আছে।

তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী। জাতি বলতে তিনি বাঙালি জাতি বুঝেছিলেন। সেখানে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রদায়গত মনোভাব ছিল না। সংস্কৃতি বলতেও বাঙালি সংস্কৃতি এবং দেশ বলতেও বাংলাদেশ বুঝিয়েছিলেন। তাই তাঁর রচনায় হিন্দু-মুসলমানের সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা ও মূল্যবোধ প্রস্ফুটিত। তিনি শুধু বাংলা মুসলমানের নবজাগরণের কামনা করেন নি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান তথা বাঙালির নবজাগরণ কামনা করেছেন। নিঃসন্দেহে তাই তিনি বাঙালি রেনেসাঁসের পূজারী।

www.nagorikpathagar.org

২.৬ সাহিত্যাদর্শ

ব্যক্তির সজ্ঞান অনুশীলন, সমাজ-অনুধ্যান, জীবনদর্শন যখন তত্ত্বমুখ্য না হয়ে জীবনাবেগে যুক্ত হয়, তখনি তা লাভ করে শিল্পশুদ্ধ সমগ্রতা। বাঙালি-মুসলমান সমাজে কাজী আবদুল ওদুদের ভাবুকতা একাধারে মুক্তবুদ্ধি-পরিস্রুত দার্শনিকতা এবং সৃজনশীলতার সমীকরণে সমৃদ্ধ। তাঁর জীবননীতি যেমন শিল্পরীতি-বিভক্ত নয় তেমনি শিল্পনীতিও জীবন নীতি-শাসিত। এ কারণে কাজী আবদুল ওদুদের সমগ্র সাহিত্য-সাধনা তাঁরই জীবনদৃষ্টির সমগ্রতাবোধে শীলিত, পরীক্ষিত এবং উত্তীর্ণ।

কাজী আবদুল ওদুদের মননশীলতার একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে তাঁর সাহিত্য ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা। যেহেতু কাজী আবদুল ওদুদ একজন মুক্তবুদ্ধি পরিস্রুত দার্শনিক এবং বাঙালি মুসলমান সমাজে তাঁর চিন্তা ও মনীষার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে; একারণে কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যচিন্তা অনুধাবন করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। যদিও তিনি তাঁর সাহিত্য চিন্তাকে নির্দিষ্ট কোনো প্রবন্ধ বা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নি, কিন্তু তাঁর বেশ কিছু রচনায় সাহিত্যভাবনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আমাদের মনে হয়েছে ওদুদের সমকালে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর সাহিত্যাদর্শের যে ব্যঞ্জনা ও গুরুত্ব রয়েছে, তা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি মুসলমান সমাজ সাহিত্য সাধনায় শুরু থেকেই বাঙালি হিন্দুদের থেকে অনেকখানি পিছিয়ে ছিল। বাঙালি মুসলমান সমাজের সাহিত্যচর্চার সমস্যা অনুসন্ধান করতে গিয়ে ওদুদ ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন; কেননা বাঙালির সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের দ্বন্দ্বপূর্ণ বিরোধ রয়েছে। বাঙালি হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতি যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিপূরক সত্তা, বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে তা নয়। ইসলাম ধর্ম 'ললিতকলার চর্চায় আপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরআন ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা।' সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধিবদ্ধতা বাঙালি মুসলমানের নান্দনিক বিকাশকে যে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এ সত্য ওদুদ উপলব্ধি করেছেন। এই ধর্মীয় আবদ্ধতা অপসারণের জন্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণকেই তিনি একমাত্র উপায় বলে মনে করেছেন। এজন্যে তাঁর অভিমত: 'সাহিত্যের বিকাশের জন্য সত্যকার প্রয়োজন হচ্ছে সুব্যবস্থিত সমাজ-জীবনের, জীবনের বহুবঙ্গিমতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার।' সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরো সমস্যা হলো সাম্প্রদায়িক চেতনা, যা থেকে বাঙালি হিন্দুও মুক্ত নয়। এই সাম্প্রদায়িক শ্রেণীচেতনা মিশ্রিত সাহিত্যকে কাজী আবদুল ওদুদ 'সাহিত্যের দারিদ্র্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি থেকে মুক্তির জন্যে অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের বোধকে প্রথমে জাগ্রত করা প্রয়োজন। প্রথমে মানবতা, অতঃপর সাম্প্রদায়িকতা এটাই হওয়া উচিত সাহিত্যিকের নৈতিকতা।

কাজী আবদুল ওদুদ হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য সাধনায়, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, রাজনারায়ণ, রামতনু, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র,

www.nagorikpathagar.org

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখকে ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন– যাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সমান উত্তরাধিকার। এই বোধ লালন করলেই বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক হীনমন্যতা অনেকাংশে অপসৃত হবে। কাজী আবদুল ওদুদ একটি রচনায় বলেছেন, সাহিত্য জীবন্ত মনের প্রকাশ'। এই জীবন্ত মন কথাটি তিনি ব্যবহার করেছেন সচলতা, আধুনিকতা অর্থে। মনকে জীবন্ত করতে হলে অতীতমুখী ধ্যান-ধারণা এবং বদ্ধমূল জড়ভাবনাকে প্রথমেই নির্মূল করা প্রয়োজন। কাজী আবদুল ওদুদ এই সত্যটিই উপলব্ধি করেছিলেন নিজস্ব মেধা ও প্রজ্ঞায়।[৬২]

সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ রস ও ব্যক্তিত্বকে সমান গুরত্ব প্রদান করেছেন। সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছেন তিনি এভাবে 'ব্যাপক অর্থে মানুষের সমস্ত লিপিবদ্ধ চিন্তাভাবনাকে সাহিত্য বলা যায়।' যদিও প্রাচীন সাহিত্য তথা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে বিচিত্র রসের কথা বলা হয়েছে; এবং 'বাক্য' রসাত্মক কাব্যম' একথা বলতেও দ্বিধা করেন নি রসের সঙ্গে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গটিকেও অবিচ্ছেদ্য মনে করেছেন। রস সাহিত্যকে মনোহর করে তোলে সন্দেহ নেই; কিন্তু 'মনোহারিতা'র সঙ্গে 'মহাপ্রাণতা' ও ওদুদের কাম্য। আর তাঁর মতে এই মহাপ্রাণতা আসে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব থেকে, তাঁর মহত্ত্ব থেকে। একারণে শ্লেগেলের রচনায় জীবনের মাধুর্য ও মহৎ প্রাণতার অনুপস্থিতি দেখে গ্যেটে যে সমালোচনা করেছিলেন তাকে যথার্থ বলে সমর্থন করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। রসের সঙ্গে সাহিত্যের ব্যক্তিত্বের যে অন্তরঙ্গতার কথা ওদুদ তুলেছেন, সেই ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব থেকেই অর্জিত। তবে এই ব্যক্তিত্ব সুলভ নয়, এবং তা মহৎ সাহিত্যিকের অন্যতম লক্ষণ। কাজী আবদুল ওদুদ বলতে চেয়েছেন,–

"রস যত মনোহর হোক একালে আমাদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে সাহিত্যে ও শিল্পে ব্যক্তিত্বের দ্বারা, এমন কি, সাহিত্য ও শিল্পের সমস্ত মাধুর্যে কলাকৌশল ব্যক্তিত্বের স্পর্শটুকু আবিষ্কার করতে না পারলে আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্য উপভোগ আর পূর্ণাঙ্গ হয় না। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই অতি গভীর ব্যাপার।"

এই উপলব্ধির মাধ্যমে কাজী আবদুল ওদুদ প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের অভিমতকে গ্রাহ্য করেও তাঁদেরকে অতিক্রম করে গেছেন। সাহিত্য রসের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের অনিবার্য সম্পৃক্তির কথা বলে তিনি আধুনিক সাহিত্যদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।[৬৩]

'মেঘদূত'এর কবি কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত হলেও এর মূলে ছিল প্রতিভার প্রতি প্রতিভার স্বীকৃতি। কালিদাস আজ অতীত হয়েও কালজয়ী মহিমায় মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বলে কালিদাসের মত সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকবেন–যদিও রসবোধের দিক থেকে এই দুই কবির পার্থক্য অনস্বীকার্য–কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর "কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কালজয়ী কাব্য-ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে তিনি এই দুই কবির মধ্যে যে মৌলিকতা সাদৃশ্য উপলব্ধি করেছেন তা উদ্ধৃতি যোগ্য,–

www.nagorikpathagar.org

'কালিদাসের রচনায় রয়েছে অপূর্ব লালিত্য ও গাম্ভীর্য ঃ রবীন্দ্রনাথের রচনাও তুল্যরূপে ললিত ও গম্ভীর। হয়ত এক্ষেত্রে কালিদাসই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পথ প্রদর্শক কিন্তু বিদ্যা এক্ষেত্রে যোগ্য শিষ্যে ন্যস্ত হয়েছিল।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতা তিনি স্বীকার করেছেন। সে শ্রেষ্ঠতা শুধু তাঁর সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর অন্তরাত্মাকে তিনি যে পরম মোহন রূপে সৃষ্টি করেছেন সেখানেই তাঁর অনন্যতা-এই তাঁর বিশ্বাস।

'গ্যেটে' এ গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ওদুদের শিল্পীমানস গঠনে গ্যেটের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্যেটের অসামান্য প্রতিভা তাঁর মানসলোকের পরিমার্জনে যেমন সহায়ক হয়েছিল তেমনি তাঁর চিন্তাকে করেছিল প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত। আধুনিক জগতের সমস্ত চিন্তাশীলের গুরু বলে স্বীকৃত গ্যেটের পরিচয় দিতে গিয়ে তাই তিনি বলেছেন,–

'গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে দুই অদ্ভুত ধারা যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য–একটি জ্ঞানান্বেষণ, অপরটি প্রেমবিধুরতা।' তাছাড়া 'গ্যেটে শুধু কবি নন; তিনি বিজ্ঞানবিৎ, চিত্র সমঝদার, শেষ বয়সে সঙ্গীত-সমঝদার, ধর্ম তত্ত্বজ্ঞ এমনকি খরমী সাধনার সঙ্গেও সুপরিচিত।'

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গ্যেটে সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারাকে সামগ্রিক প্রকাশ না ঘটায় তিনি অতৃপ্ত হয়ে উপসংহারে বলেছেন,[৬৪]–

"গ্যেটে সম্বন্ধে যে ক'জন আলোচকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁদের কেউই কয়েক শত পৃষ্ঠার কমে তাঁদের বক্তব্য শেষ করতে পারেন নি। তবু তাঁদের লেখা ফেলানো লেখা নয়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী, তাঁর কাব্যের কিছু কিছু পরিচয়, আপাতত অকথিতই রইল। গ্যেটে-সমুদ্রের হাওয়া মানস স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য, এই একটি কথা বলতেই চেষ্টা করেছি হয়ত।"

সর্বগুণের উর্ধ্বে গ্যেটের মানবিক বোধ, যা প্রায় সকল সার্থক সাহিত্যিকেরই প্রধান গুণ হিসেবে বিশেষভাবে বিবেচিত।

কাজী আবদুল ওদুদ সাহিত্যের দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একদিকে সাহিত্যে শুধু যুগ ধর্মের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে সাহিত্য যুগ ধর্মে সাড়া দিয়েও যুগকে অতিক্রম করে যায়। ওদুদের মতে, যুগধর্মকে আত্মসাৎ করেও যে সাহিত্যে চিরন্তনতার মাত্রা যুক্ত হয়, অর্থাৎ যে সাহিত্য যুগপৎ কালজ ও কালোত্তর, সেটিই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।'[৬৫] তিনি বলেছেন,

'কবিত্ব ও ভাবুকতার দিক দিয়ে দেখিতে গেলে চিরন্তন সত্য যাহার ভিতরে আত্মপ্রকাশ করে নাই এরূপ সৃষ্টিকে প্রকৃত সাহিত্য বলা চলে না, কেন না উহা ক্ষণস্থায়ী;'

আধুনিক কালে সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে অনেক লেখকেরই মনে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন ও বাণিজ্যিক অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন থাকে। অর্থোপার্জনই এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজী আবদুল ওদুদ বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের এই বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছেন। সাহিত্যিককে অন্তত একথা মনে রাখা উচিত যে,

www.nagorikpathagar.org

তিনি সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। কাজী আবদুল ওদুদ সাহিত্যকে কেবল চর্চার বিষয় মনে করেননি। তাঁর কাছে সাহিত্য ছিল প্রকৃত অর্থেই সাধনার বস্তু। তিনি বলেছেন,–

'শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সাধনা প্রকৃত পক্ষে একটা আধ্যাত্মিক সাধনা; এই সাধনার ত্রুটি থাকিলে বুদ্ধি বিদ্যা কৌশল ইত্যাদি কোনো কিছুই সাহিত্যকে কালের শাসন হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।'

সাহিত্য সম্পর্কে কাজী ওদুদের এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নিজের সাহিত্যিক জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে।'

কাজী আবদুল ওদুদ বিশ্বাস করেন সাহিত্য–ঐতিহ্য রাতারাতি গড়ে ওঠে না। বাঙালি মুসলমানের পক্ষে তো তা আরো সম্ভব নয়। কেন না তারা এমনিতেই পিছিয়ে রয়েছে। এ কারণে ওদুদ মুসলমান সাহিত্যিকদের তাঁদের অতীত ঐতিহ্য থেকে সাধ্যমতো পরিগ্রহণে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর বিবেচনায় জাতিগত এবং আত্মগত সচেতনতার সামগ্রিক মিলনেই হয়তো সম্ভব হবে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের Cultared হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। সাহিত্যিকের 'হয়ে ওঠা' কে ওদুদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। একারণে বারংবার সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব ও সাধনার প্রতি তিনি জোর দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এ-দুটো জিনিস থাকলেই সম্ভব প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টি, যার ভেতর মানবাত্মার বহুমখী সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়।

কাজী আবদুল ওদুদ সাহিত্য সাধনাকে শুশ্রূষার অন্যতম উপায় বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন 'মহৎ সাহিত্য বিশেষভাবে দেখা যায় মহৎ জীবন চেতনা ও জগৎচেতনা। মহৎ সাহিত্য আমাদের শুধু প্রীত করে না, আমাদের জীবনকে মহৎ চেতনায় নতুন করে উদ্বুদ্ধ করে।' সাহিত্যিকের স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি কখনোই অনুমোদন করেন নি। কাজী আবদুল ওদুদ নিজে যেমন মুক্তচিন্তায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর চিন্তা কারো ওপর চাপিয়ে দেন নি, তেমনি সাহিত্যেও তিনি চান নি কোনো চিন্তা চাপিয়ে দেওয়া হোক। মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির বিকাশকে তিনি সাহিত্যেও স্বাগত করেছেন।[৬৬]

২.৭ রাষ্ট্রচিন্তা

কাজী আবদুল ওদুদ রাজনীতিক ছিলেন না– ছিলেন একান্তভাবে সাহিত্যিক। জাতীয়তা, দেশ ও মসুলমান সম্প্রদায়ের নানামুখী সমস্যা বিবেচনায় তিনি ছিলেন উদার গণতান্ত্রিক। তিনি গণতন্ত্র ও গণশক্তি, গণতন্ত্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছেন। গণতন্ত্র বলতে তিনি বুঝেছেন দেশের জনসাধারণের রাষ্ট্র পরিচালনার শক্তিকে। আধুনিক রাষ্ট্রে গণের শক্তির সাথে রাষ্ট্রের শক্তির সংঘাত অনিবার্য। ইউরোপে জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবের জন্য শ্রমজীবীর ধর্মঘট, বলশোভিকবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় হচ্ছে। 'এ কারণে বিভিন্ন সময় বাংলার রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে নানা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন এবং তাঁর প্রতিটি চিন্তায় সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং বিবেকিতা ফুটে উঠেছে। কাজী আবদুল ওদুদের রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিতে

www.nagorikpathagar.org

গেলে মূলত তাঁর জাতিগত আদর্শ, জাতীয়তাবোধ, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতিভাবনা ও রাষ্ট্রচিন্তা, গণতান্ত্রিক চেতনা প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা প্রাধান্য পায়।'[৬৭]

ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মহাত্মা গান্ধী একটি অবিসংবাদিত প্রভাব-সঞ্চারী নাম। মহাত্মার অহিংসা নীতি রাজনৈতিক ইতিহাসে এক কিংবদন্তির সৃষ্টি করেছিল। কাজী আবদুল ওদুদকে রাজনৈতিক মতাদর্শে গান্ধীপন্থী বলে অনেকে মনে করলেও একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, তিনি মহাত্মার রাজনীতিতেও সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বিরোধিতার প্রশ্নে মহাত্মা যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে প্রতিপক্ষচারিতা থাকলেও লীগ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্ভাষণকে ওদুদ প্রশংসার চোখে দেখেছেন। অভিন্ন দেশাত্মবোধের সূত্রে রাজনীতিতে প্রতিপক্ষের চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শও যে শ্রদ্ধাভাজন ও সম্মানজ্ঞাপন হতে পারে, সেকথা কাজী আবদুল ওদুদের সমকালে আর কেউ উপলব্ধি করেছেন কিনা সন্দেহ।

গান্ধীর অহিংসাকে তিনি দেখেছেন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। অহিংসা তো মনুষ্যত্ব ও বিশ্বমানবতার চরম উৎকর্ষ ভাবনা থেকে সৃষ্টি। চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' গান্ধীর অহিংসাবাদের ভেতর অন্তস্থিত হয়েছে। ওদুদ লক্ষ্য করেছেন, গান্ধী অহিংসার পথে কিছু জাতিকে যেভাবে আহ্বান জানিয়েছেন, মুসলমান জাতিকে সেভাবে অনুপ্রাণিত করেননি। যেন অহিংসায় হিন্দুরই অধিকার একচ্ছত্র। এই অন্তর্গত স্ববিরোধ রাজনীতিতে সহজেই ফেলতে পারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে ওদুদ বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন,–

'এ যুগের হিন্দু ও মুসলমান কেউই হিন্দু বা মুসলমান নয়–তারা অপরিহার্যরূপে হিন্দু ও মুসলমানদের মিশ্রণ। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তারা একে অন্যকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না। পারে একে অন্যের সহযোগী হতে অথবা শত্রু হতে। তাঁদের একের পক্ষে অন্যকে উপেক্ষা করে চলবার চেষ্টা মাত্রই হচ্ছে তাঁদের ভবিষ্যৎ সংঘর্ষকে অনিবার্য ও উৎকট করে তোলা।'

মহাত্মা গান্ধীর মতন রাজনীতিজ্ঞ এবং মানবহিতৈষী ব্যক্তিত্ব রাজনীতি ও জাতীয়তার প্রশ্নে কেন যে ধর্ম নিরপেক্ষতায় স্থিত হতে পারলেন না, সে ব্যাপারে ওদুদ উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

জাতীয়তা ও রাষ্টগঠনের প্রশ্নে কাজী আবদুল ওদুদ সম্পূর্ণ সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মিলনের বিশ্বাস তাঁর একাধিক প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতীয়তাবোধের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে একটি বক্তব্যে :

'ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসীর একটি অখণ্ড জাতিতে রূপান্তরিত না হয়ে যে উপায় নেই তাদের একালের জীবনের প্রয়োজন, এজন্যে সর্ববিধ সাম্প্রদায়িক চিন্তা শেষ পর্যন্ত কুচিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নয়।'

জাতীয়তা ও রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নে কাজী আবদুল ওদুদ অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক মানসিকতা লালন করতেন। এ কারণে মহাত্মাগান্ধী রাজনীতিবিদ

www.nagorikpathagar.org

হয়েও যা উপলব্ধি করতে পারেন নি, ভাবুক হয়ে কাজী আবদুল ওদুদ তা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৮]

কাজী আবদুল হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চেয়েছেন কায়মনোবাক্যে। এ কারণে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় বিভাজনে তিনি উৎসাহী ছিলেন না। আমরা দেখেছি অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাই তিনি টিকিয়ে রাখার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সত্যিই যদি হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষই আর পারস্পরিক সহ-অবস্থানে সম্মত না হয় তাহলে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা তিনি আঁচ করতে পেরেই বলেছিলেন,–

'বর্তমানে যে-ব্যবচ্ছেদ মুসলমান চাচ্ছে তা যেমন অসঙ্গত তেমনি বিদপসঙ্কুল, তার কারণ, যে-হিন্দুকে মুসলমান বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না তারা প্রায় সমসংখ্যক রয়ে যাচ্ছে মুসলিম রাজ্যে।'

দেশভাগের এতবছর পর বর্তমানে বাংলাদেশ এবং ভারতে যে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ মাঝে-মধ্যেই চরম আকার ধারণ করে তারই সতর্ক-সঙ্কেত বেজে উঠেছিল ওদুদের ভাষ্যে।

কাজী আবদুল ওদুদ বাংলাদেশের সৃষ্টিশীল সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি ফুটে উঠেছে, তা থেকে বোঝাতে চেয়েছেন উভয়ের অবিচ্ছিন্ন থাকার কথা। কাজী আবদুল ওদুদের রাষ্ট্রচিন্তায় সর্বত্রই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে। কেবল রাষ্ট্র নয়, ওদুদ রাষ্টভাষা নিয়েও তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে না বাংলা হবে এ নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবতারণা হলেও ওদুদ অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠভাবে এর মীমাংসা দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের রাজনীতি নিয়ে কাজী আবদুল ওদুদের নিজস্ব কিছু ভাবনা-চিন্তা ছিল। তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কখনই নিরপেক্ষ ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকতেন না। অবশ্যই একটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি দাঁড় করাতেন এবং উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনসাধারণের ভূমিকা কি হবে সে বিষয়ে রাখতেন তাঁর অভিমত। ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসিত ভারতবর্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীর নেতৃত্ব অবিসংবাদিত। ভারতে যে কটি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন হয়েছে, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তার অন্যতম। এই অসহযোগ নিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন "নন-কো-অপারেশন বা অসহযোগিতা' শিরোনামে। তবে অসহযোগিতার সঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ সম্পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। রাজনীতিতে তিনি যে গান্ধীপন্থী ছিলেন; অন্তত মহাত্মার রাজনৈতিক মতাদর্শকে তিনি যেভাবে আত্মস্থ করেছিলেন তাতে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে গান্ধীর নন- কো-অপারেশনকে তিনি রাজনৈতিক সজ্ঞানতায় ভাবুকের দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

কাজী আবদুল ওদুদ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতীয় জাতীয়তা, কামনা করলেও ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হলো। এই বিভক্তির পশ্চাতে রাজনৈতিক কারণ যাই থাক, একজন চিন্তাবিদ হিসেবে 'ইসলামের রাষ্ট্রের ভিত্তি' নিয়ে তিনি খোলাখুলি মতামত ব্যক্ত করেছেন। বলে রাখা ভালো। তিনি কখনই ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেন নি। বরং কতিপয় অমানবিক ইসলামি আইন সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

"অপরাধ মানুষ শুধু তার কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়ই নয় বরং অভাবের তাড়নায়; আর সব মানুষের অভাব অভিযোগ দুর করা এ যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান কাজ–তবে হাত পা কাটা ও পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার মতো কঠোর শাস্তি মেনে নেওয়া তার পক্ষ সহজ হবে না–কেবলই তার মনে হবে; সত্যিই কি মানুষের উপকার হচ্ছে এমন সব বিধানের দ্বারা।"

ধর্মের বিধি-বিধানের চেয়েও সমাজ-বাস্তবতার দিকে কাজী আবদুল ওদুদের মনোযোগ ছিল বেশি। রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রেও ওদুদ ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ ও মুক্তবুদ্ধি তাড়িত। যে সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক চাহিদা, অভাব অনটন মেটাতে অক্ষম, চুরি করলে সে সমাজের হা-পা কাটার কিংবা অন্যান্য শাস্তি দেওয়ার অধিকার কি বাস্তবিকই আছে? এ প্রশ্ন জেগেছিল ওদুদের মনে। এ কারণে তিনি শুধু ধর্মীয় বিধি-বিধান নয়, সমাজ-মনস্তত্ত্ব ও মানবীয় চরিত্র উপলব্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি ব্যাপক ও মনুষ্যত্বের সাধনার আহ্বান জানিয়েছেন। "ইসলাম রাষ্ট্রের ভিত্তি কী-আইনজ্ঞেরা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন কোরআন হাদিস আর মুসলিম ইতিহাস মন্থন করে। কিন্তু যিনি জানেন মুসলমান হওয়ার অর্থ আল্লাহর অর্থাৎ সত্য ও কল্যাণের অনুগত হওয়া, আর সেজন্যে জগতের বন্ধু হওয়া তিনি নিঃসংশয়ে বুঝবেন ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি কাণ্ডজ্ঞান ও মানবহিত।" একথা স্পষ্ট যে, ধর্মের স্বার্থে কাজী আবদুল ওদুদ মানুষ তথা দেশ ও রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে চান নি; বরং দেশের স্বার্থে মানুষের কল্যাণ সাধনে তিনি ধর্মের ইতিবাচক উপাদানকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন।[৬৯]

এইভাবে ওদুদ রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে সচেতনশীল রাজনৈতিক মনের পরিচয় দান করেছেন, তিনি জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক লেখক ছিলেন। সমগ্র মুসলিম জাহানের মধ্যে কামাল আতাতুর্কের দেশই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কামাল আতাতুর্কের প্রভাবে আবদুল ওদুদ বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। এই চরিত্র তাকে শিখিয়েছে সত্য ও কল্যাণের পথের চিন্তা। ওদুদ ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে– বঙ্কিমের বন্দেমাতরম'কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকার করে নিতে পারেননি। তিনি গান্ধীজীর নেতৃত্বের দুর্বলতা ধরতে পেরেছিলেন এবং গান্ধীর অহিংসনীতি এবং এ নীতির দোষত্রুটিরও সমালোচনা করেছিলেন। "ওদুদের আজীবন ব্রত ছিল সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান করা। সে লক্ষ্যে তিনি ধর্ম-সজ্ঞবাদ ও শরীয়তি আইনের বিরোধিতা করেছেন। সমাজতন্ত্র, নাৎসিবাদ, বলশেভিকবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতির গুরুত্ব অনুধাবন করেও ওদুদ শেষ পর্যন্ত ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজমেরই পক্ষপাতী। তাঁর কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রটি হবে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সে রাষ্ট্র সৃষ্টিধর্মী, বিকাশমূলক মানব কল্যাণকেই নিশ্চিত করবে।"[৭০]

২.৮ ধর্মচিন্তা

ধর্মকে কাজী আবদুল ওদুদ অনুষ্ঠানের মধ্যে পেতে চেষ্টা করেননি। তিনি ধর্মকে পেতে চেয়েছিলেন জীবনের গভীর উপলব্ধিতে। ওদুদ সাহেবের ধর্মবোধ সম্পর্কে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,–

www.nagorikpathagar.org

'তিনি (ওদুদ) নিজে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে মিত্রভাব পোষন করিতেন এবং সকল ধর্মের মধ্যেই যে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে তাহার প্রশংসা করিতেন, কিন্তু একটি বিষয়ে বিতর্ক তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যথা দিত। মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যেখানে কোনও অবুঝ ও অসহিষ্ণু অ-মুসলমান লেখকের নিন্দোক্তি তিনি পাঠ করিতেন, ভদ্রভাবে ও সংযত ভাষায় তাহার প্রতিবাদ না করিয়া তিনি পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তিনি মুসলমান লেখকের কাছেও সুবিচার পান নাই।...ওদুদ সাহেব ইসলাম ধর্মে আস্থাশীল ছিলেন এবং ইসলামের মৌলিক গ্রন্থ কোরআন-এর একটি সুপাঠ্য ও সহজবোধ্য বাঙ্গালা অনুবাদও করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে আমি তাঁহাকে সাধুবাদ দিই।'[৭১]

ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করে কাজী আবদুল ওদুদ তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের রোষানলে পতিত হয়েছিলেন। এমনকি মোল্লা মৌলভীগণের বিবেচনায় তিনি ধর্মদ্রোহী ও অমুসলমান খেতাবও লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগ যে ব্যক্তিগত আক্রোশজনিত এবং ভিত্তিহীন ছিল তা তাঁর ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ সমূহের বিশ্লেষণেই বোধগম্য হয়।

তাঁর 'শ্বাশত বঙ্গ' গ্রন্থের 'কোরআনের আল্লাহ' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হলো এই যে খোদার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করে তোলাই প্রকৃত মুসলমানের আদর্শ হওয়া উচিত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্কে সকল শ্রেষ্ঠ গুণের আধার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই সকল গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠার জন্য মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজ ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর পালনে ও আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের উচ্চারণের মোহে ইসলাম ধর্মের ও আল্লাহর গুণাবলীর মর্মার্থ গ্রহণের দিকে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে বলে তিনি মনে করেছেন। মিহির মুসাকী বলেছেন,–

'মুসলমান সমাজের দিকে ভালোভাবে তাকালেই দেখা যাবে 'কোরআন' সম্পর্কে প্রায় সকলের মনেই এক ধরণের ধর্মমুগ্ধ ভীতি; একই ভীতি 'আল্লাহ' সম্পর্কেও। এর কারণ আল্লাহকে মুসলমান বিশ্বাস ও ধর্মাবেগ দিয়ে যতটা গ্রহণ করেছে, যুক্তি ও অন্বেষা দিয়ে ততটা বিবেচনা করেছে।

এই বিষয়টি ওদুদ সাহেব চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর ' কোরআনের আল্লাহ' প্রবন্ধে। কোরআন ও হাদিস বর্ণিত উক্তিসমূহ স্মরণ করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মুসলমানের জীবনে আল্লাহর বিচিত্র গুণাবলী-সমন্বিত নামসমূহের উজ্জীবনের মাধ্যমে সুন্দর জীবন যাপন সম্ভব। তাঁর মতে:

"আল্লাহ পরম সুন্দর এই ভাবনা আমার ভিতরে দিন দিন এসে দিচ্ছে আমার নিজের সমস্ত কাজে ও চিন্তায় সুন্দর হবার তাগিদ। তেমনি ধরুণ তাঁর করুণাময় নাম। তাঁকে করুণার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে বুঝে আমি চেষ্টা করছি সেই করুণাময় ভাব আমার মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলতে।....আল্লাহ বলতে আমরা বুঝছি জীবনে এক অন্তহীন অগ্রগতির তাগিদ..... ।"

কাজী আবদুল ওদুদ ধর্ম-সমাহিত বাঙালি মুসলমানের চিন্তার সংস্কার সাধন করতে চেয়েছেন। কেননা মুসলমানের গোঁড়ামি ও পশ্চাৎপদতার এক বড় কারণ ধর্মমুগ্ধ

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টিভঙ্গি। অত্যন্ত ঐতিহাসিক ও যুক্তির সঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ ধর্মের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মোহন-প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করে তাদের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করেছেন। হযরত মোহাম্মদের জীবনকে যুক্তিহীন ও পরিবর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অন্ধভাবে অনুসরণ করার পক্ষে তিনি ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য থেকেই উদ্ধৃত করা যাক :

"মহাপুরুষ যে সর্বজ্ঞ নন, মানুষের সর্বময় প্রভু নন, মানুষের জীবন-সংগ্রামে তিনি একজন বড় বন্ধু মাত্র অবশ্য যেমন বন্ধু সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোকস্তম্ভ; তাঁর কথা ও চিন্তার ধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে একথা বিশ্বাস করলে মানুষ রূপে তাঁর সাধনাকে যে চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কেননা, সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য সেই আল্লাহর উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়–যে আল্লাহ চিরজাগ্রত, চিরবিচিত্র, বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন শুভ চেষ্টায় যাঁর মহিমা প্রকটিত, হযরত মোহাম্মদের অনুবর্তীরা সেই প্রাণপদ সদাস্মর্তব্য কথা অদ্ভুতভাবে মন থেকে দূর করে দিয়েছেন; হয়তো তারই ফলে অন্যান্য ছোটখাটো প্রতিমার সামনে নতজানু হওয়ার দায় থেকে কিছু নিস্কৃতি পেলেও 'প্রেরিতত্ব' রূপ এক প্রকাণ্ড প্রতিমার সামনে নতদৃষ্টি হয়ে তাঁরা যে জীবনপাত করছেন, আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা সাংসারিকতা সবদিক থেকেই তা শোচনীয় রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত।"

এভাবেই সম্মোহিত মুসলমানের 'কুয়াসাচ্ছন্ন বর্তমান', 'দিকদেশবিহীন অতীত' এবং 'শূন্য ভবিষ্যতে'র কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছেন কাজী ওদুদ। 'প্যান-ইসলাম' কিংবা ইসলামি পুনরুজ্জীবনবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। পরিবর্তমান সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সাপেক্ষে ধর্ম, অনুশাসন এবং বিধানকে তিনি বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,–

"যুক্তি বিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবনপথে বাস্তবিকই এ যে মানুষের এক অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটলে পূর্বানুবর্তিতা পাষাণভাবের মতই মানুষের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ শুদ্ধ ও শীর্ণ হয়ে আসে।"

কাজী আবদুল ওদুদ অতি সংক্ষেপে ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এর ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করেছেন। স্মরণ করেছেন তিনি মোহাম্মদের মৃত্যু– পরবর্তী আরবের আদিম উচ্ছৃঙ্খলতা ও পারস্যের বিলাস-মত্ততার মাঝখানে সত্যিকার ইসলামি আদর্শের বিপন্নতার কথা। ধর্মের নানা সংস্কার সাধন ও চিন্তার পরিবর্তনের কথা বললেও একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, কাজী আবদুল ওদুদ উগ্র কল্যাণ-বিরোধী ছিলেন না। তিনি ইসলামের কল্যাণ-সাধনা, ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য ও মৈত্রীর বীর্যবন্ত সাধনার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। তবে পরিবর্তিত পৃথিবীর, নতুন সমাজ-ব্যবস্থা ও প্রয়োজনের আলোক, কর্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠভাবে ধর্মকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অলৌকিক বিষয়ের প্রতি তিনি আস্থা স্থাপন করেন নি। তিনি বলেছেন:

"মানুষেল চলার জন্য বাস্তবিকই কোন বাঁধানো রাজপথ নেই,–জগৎ যেমন একস্থানে বসে নেই মানুষও তেমনি তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে একস্থানে স্থির হয়ে নেই –আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার

www.nagorikpathagar.org

জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিতার নয়, সদাজাগ্রত চিত্ততার–তাহলে আমাদের চোখের সম্মোহন ঘুচে যাবে।"

এভাবেই কাজী আবদুল ওদুদ ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের মতন আবেগ ও বিশ্বাসনির্ভর এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়েও সঞ্চারিত করেন রেনেসাঁসেরও যুক্তিবাদ, মানবধর্ম ও ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী চিন্তা।[৭৩]

২.৯ মননশীল চিন্তা

কাজী আবদুল ওদুদ মূলত মননশীল প্রাবন্ধিক, বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ-নিবন্ধের জগতে তাঁর উৎকৃষ্টতার স্বাক্ষর বিরাজমান। বাংলা গদ্যে সমাজ-মনস্ক লেখকদের মধ্যে তাঁর আসন স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত– বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তো বটেই; –স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাক্ষ্য দেন।[৭৪] লেখক হিসেবে আবদুল ওদুদের প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি মূলত তাঁর প্রবন্ধ ও সমালোচনার জন্যে। তাঁর মননচর্চা সমাজচিন্তা ও সাহিত্য বিবেচনা এই দুইভাবে বিভক্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ-সমস্যার গভীরে তাঁর মরমী ও সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। তমসাপীড়িত সমাজের বিবরে আলো ফেলেছেন। স্বসমাজের মূর্খতা-অজ্ঞতা মোচন করে জড় সমাজকে চালষ্ণু করতে চেয়েছেন। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করতে গিয়ে যুক্তি ও বিবেচনার আয়ুধ নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতা ও বৈরিতায় বিপর্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু পরাভব মানেননি। তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে মূলত তাঁর চিন্তামূলক মননধর্মী রচনায়।[৭৫]

ওদুদ-মানস সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন, 'কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন জাতিতে ভারতীয়, ভাষায় বাঙালি, ধর্মে মুসলমান, জীবনদর্শনে মানবিকবাদী, মতবাদে রামমোহনপন্থী, সাহিত্যে গ্যেটে ও রবীন্দ্রপন্থী, রাজনীতিতে গান্ধী ও নেহরুপন্থী, অর্থনৈতিক শ্রেণীবিচারে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, সামাজিক ধ্যান-ধারণায় ভিক্টোরিয়ান লিবারল।'[৭৬]

যুক্তি তর্কই প্রবন্ধের প্রাণ, তার জন্য বিচার -বুদ্ধি ও মননশীলতা অপরিহার্য। প্রবন্ধ কিছু জনপ্রিয় সাহিত্য নয় তার পাঠক সংখ্যা চিরকালই বিরল। বিশেষ করে আমাদের দেশে অনেক সাহিত্যিকও প্রবন্ধের নামে আঁৎকে ওঠেন। অথচ যে কোনো দেশের মন মানসের, মননশীলতা ও জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় বহন করে সে দেশের প্রবন্ধ সাহিত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি প্রবন্ধ-সাহিত্য ইংরেজ জাতির মননশীলতার ও জ্ঞান-সাধনার এক চূড়ান্ত পরিচয়। জাতির চিন্তা, ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সমস্যা বিশেষ করে মানসিক বিকাশের পরিচয় সাধারণত বিভিন্ন প্রবন্ধেই ফুটে ওঠে।

কাজী আবদুল ওদুদ গদ্য লেখক-জাত প্রবন্ধকার। যদিও তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা গল্প উপন্যাস দিয়ে। তবে তাঁর রচনার সার্থকতা খুঁজতে হবে তার প্রবন্ধে, যা সংখ্যায় এবং বিষয়বস্তুতে বিপুল। তাঁর বিচার বুদ্ধি ও মননশীলতার চরমরূপ এই প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাবে। কেননা প্রত্যেক রচনার জন্য আবদুল ওদুদ নিজেকে প্রস্তুত করেছেন–করেছেন অকাতর শ্রম। প্রস্তুতি ছাড়া কোন রচনায় তিনি হাত দেননি। সেই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' আমলে তার সুবিখ্যাত 'সম্মোহিত মুসলমান' ও মোস্তফা

www.nagorikpathagar.org

কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে তিনি বুদ্ধি ও যুক্তির যে জয় ঘোষণা করেছিলেন পরবর্তী তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে বিভিন্ন রচনায় সেই ধারারই অনুসরণ ও অনুশীলন করে এসেছেন। ইউরোপের রেনেসাঁস-সাধকরা ও এখনকার রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর পথপ্রদর্শক। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও ভাবধারা, তাঁর সাহিত্য ও জীবন ওদুদের চিন্তাধারার উপর যে বিমেষ প্রভাব বিস্তার করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর মন-মানস সাহিত্য ব্যাপারে অর্থাৎ সুরুচি, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যানুভূতির ব্যাপারে প্রধানত রবীন্দ্র সাহিত্য থেকেই খোরাক সংগ্রহ করেছে। ইউরোপের গ্যেটে, পারশ্যের শে'খ সাদী ও ভারতের কালিদাস তাঁর প্রিয় কবি–এঁদের রচনাও তাঁর মনের উপর কিছু কম প্রভাব বিস্তার করেনি। তিনি নিজে রোমাঁ রোলাঁর জঁ্য ক্রিস্তভ্রে কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর গদ্য ও মনের বলিষ্ঠ ভংসীর মূল কারণও বোধ হয় এ সবের পরোক্ষ প্রভাব।[৭৭]

তিনি ইসলাম ধর্মের মৌল উদার ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে কাণ্ডজ্ঞান যুক্তিনিষ্ঠ ও মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে স্ব-সমাজের জন্য একটি প্রশস্ত পথ খুলে দিতে প্রয়াসী। সেই পথ অবশ্যই সে-সমাজকে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী হবার বাসনা জাগায়। মাটি ও মানুষের সংলগ্ন হয়েও সে-পথ বিশ্বতোমুখী। ধর্মের ইহকালীন শ্রেয়োবোধে উজ্জীবিত সেই পথ। কিছুটা সমন্বয় মূলক ও বটে। তবে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে শান্তি, প্রগতি ও মানবতাবোধ এই পথের নিত্যসঙ্গী।৭৮ এই পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল ওদুদের রচনা এক অনন্য ব্যতিক্রম সস্তা ভাব-বিলসিতার পরিচয় তিনি কোথাও দেননি-বুদ্ধি, যুক্তি ও মননশীলতার স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর প্রতিটি রচনায়।

আজ খাঁটি মননশীল রচনা অনেকখানি উপেক্ষিত, মননশীল রচনায় সমঝদারি করতে হলে মন ও মস্তিষ্ককে যতখানি খাটাতে হয়, ততখানি খাটাতে এই গতিবাদের যুগে অনেকে অনিচ্ছুক। তাই আবদুল ওদুদের রচনার যথাযথ মূল্যবিচার এখনো অধিকারীর অপেক্ষায়।৭৯ তবে তিনি মূলত মননশীল ও যুক্তিধর্মী লেখক ছিলেন। তাই মননশীলতা ও যুক্তিধর্মীতার প্রধান আশ্রয় 'শ্বাশত বঙ্গ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের তার জীবন 'দর্শনের পরিচয়ও পরিষ্কার হযে ওঠে। তাই আবেগের চেয়ে মস্তিষ্ক তথা বুদ্ধির মূল্য ছিল তাঁর কাছে অনেক বেশী। তাঁর প্রবন্ধ সমূহে বুদ্ধিবাদী মননশীল লেখকের বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। আর এখানেই প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর সার্থকতা।

২.১০ গদ্যরীতি

কাজী আবদুল ওদুদের গদ্যরীতি তাঁর চিন্তার মতোই বিশিষ্ট্য। তাঁর রচনাশৈলীতে সুগভীর প্রত্যয় থাকে। মুক্তচিন্তার প্রতি সুগভীর আস্থা তাঁর জীবনদর্শনকে ব্যক্তিত্বের মহিমায় পরিস্রুত করেছে। ওদুদের চিন্তন প্রক্রিয়ায় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিজাত প্রজ্ঞা এবং পরিমার্জিত মাত্রাবোধ থাকে। চিন্তার ক্ষেত্রে ওদুদ মহৎ প্রতিভার অনুবর্তী হলেও গদ্যের স্টাইলে তিনি স্বতন্ত্র।[৮০] তিনি বলেছেন 'সাহিত্যিক কাকে বলবো? যিনি তাঁর মনের ভাব সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন। সুন্দর ভাষা কি? যাতে ভাবের প্রকাশ পূর্ণাঙ্গ বা পর্যাপ্ত হয়েছে।'

www.nagorikpathagar.org

অনেক লেখকের মুখেই কলমের ভাব আসে, ওদুদ সাহেবের কিন্তু ভাবের মুখে অর্থাৎ রচনার প্রেরণাতেই কলম চলে। কোন কোন সাহিত্য পাঠকের মত হচ্ছে আবদুল ওদুদের Style বা রচনারীতি বড় গুরু গম্ভীর ও ভারী। তাঁর রচনা যে কিছুটা ভারী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি যে সব বিষয়বস্তু তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন তার কোনটাই হালকা নয়, তা যাকে বলে সবই weighty. কাজেই সেই সবের ভাষাও weighty বা ভারী হতে বাধ্য। রচনাশৈলী বিষয়বস্তুর উপযোগী হওয়া রচনার একটি বিশেষ গুণ-সব বড় লেখকেরই এই গুণ লক্ষ্যগোচর। আবদুল ওদুদের ভাষা তাঁর ভাবের উপযুক্ত বাহন। কার্লাইল ওদুদের ভাষা তাঁর ভাবের উপযুক্ত বাহন। কার্লাইল style সম্বন্ধে উপদেশ দিতেগিয়ে বন্ধ John Sterling-ই লেখক বিশেষের রচনাশৈলীকে নিয়ন্ত্রিত করে রূপ দেয় ও গড়ে তোলে। যে কোন রচনাশৈলীর ভিৎ হলো thought, কার্লাইলের নিজের চিন্তাধারা যেমন স্বতন্ত্র তেমনি তাঁর style-ও এত বেশী নিজস্ব ও প্রচলিত ইংরেজি গদ্য থেকে তা এত বেশী পৃথক ছিল যে অনেকেই সে যুগে তাকে ইংরেজি বলেই স্বীকার করতে চাননি। এত বড় বিশ্ব বিখ্যাত চিন্তাশীল লেখকের style-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা তখনকার যুগে প্রায় রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরে অবশ্য এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। আবদুল ওদুদের style সম্বন্ধেও একই কথা চলে। তাঁর মতাদর্শের সঙ্গে যাঁদের সহানুভূতি আছে ও আছে মনের সায়, তাঁদের কাছে আবদুল ওদুদের style এক বিশেষ মানসিক আনন্দের বস্তু। বাংলা গদ্য লেখক কারো style-এর সঙ্গে আবদুল ওদুদের style-এর মিল নেই–তা একান্ত অনন্য ও স্বতন্ত্র। তাঁর রচনাশৈলীর বিশিষ্টতা এত বেশি, প্রকট যে, এই বিশিষ্টতার উল্লেখ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। style হচ্ছে অনেকখানি গায়ের চামড়ার মত–এ কেউ বদলাতে পারে না, পারে না পালটাতে। জামা কাপড়ের ত পারে না খুলে রাখতে।

চিন্তা করার ভঙ্গী বা মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই style গড়ে ওঠে। সব বড় লেখকদের, জাত লেখকের স্বতন্ত্র চিন্তাপদ্ধতি ও মনোভংগী রয়েছে- মন-মানস ও মেজাজ থেকেই তার উৎপত্তি। সৌখিন লোকদের পক্ষে পোশাকের ফ্যাশানের মতো style-এর রদবদল সম্ভব হলেও খাঁটি মনোধর্মী লেখকের পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের থেকে নজরুল পর্যন্ত আমাদের সব জাত লেখকের রচনা কথা মনে মনে স্মরণ করে দেখলে এঁদের রচনাশৈলীর নিজস্বতা সহজেই লক্ষ্যগোচর হবে। style পরিবর্তন করতে চেষ্টা করা যেন অনেকখানি স্বভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আবদুল ওদুদের style আবদুল ওদুদের স্বভাবেরই প্রতিফলন। বলাইবাহুল্য, তাঁর স্বভাবের মত তাঁর style-ও গাম্ভীর্য, প্রত্যয় ও শালীনতারই প্রতিমূর্তি। style is the man-এটি একটি মূল্যবান ও সার্থক উক্তি, আবদুল ওদুদ সম্বন্ধে এর সার্থকতা একেবারে অনস্বীকার্য।[৮১]

গদ্যরীতি ওদুদের সাহিত্যিক রচনাশৈলীর মূল বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রত্যয়দৃপ্ত ভাষার ভাবগাম্ভীর্যের অন্তরালে এক ধরনের গতিময়তা থাকে। ওদুদের গদ্যে দুরূহতার দেয়াল পাঠককে বিমুগ্ধ করে না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ছিলেন মূলত সংস্কারক। বাংলা সাধু গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠা এবং গদ্যরীতির রূপ নির্মাণে তাদের অবদান কোন অংশে কম নয়।

www.nagorikpathagar.org

পক্ষান্তরে ওদুদ ছিলেন মূলত সাহিত্যিক। সংস্কারের বীজ তাঁর মধ্যে থাকলেও তিনি মহৎ প্রতিভার বুদ্ধিবৃত্তিক অনুবর্তিতায় সমাজ সংশোধন ও বুদ্ধিজীবীর চেয়ে চিন্তাশীল সমাজ সচেতন সাহিত্যিক। বঙ্কিম ও ওদুদের মধ্যে একটি জায়গায় মিল আছে তা হলো উভয়েই স্বসম্প্রদায়ের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ওদুদের সাহিত্য সাধনা মূলত বাঙালি মুসলমান সমাজের আত্মোন্নতির প্রয়োজনে ছিল ক্রিয়াশীল। ওদুদ রবীন্দ্রানুসারী, জীবনাবেগে ও সাহিত্যাদর্শে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত হলেও গদ্যশৈলীতে ছিলেন স্বতন্ত্র পথের যাত্রী। রাবীন্দ্রিক গদ্যের মরমিয়া ধারা ওদুদের মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা পরিস্রুত গদ্যে অনুসৃত হয় নি। বাংলা সাহিত্যে প্রথম চৌধুরীর পর ওদুদই বিচিত্র বিষয় নিয়ে লিখেছেন। তবে প্রথম চৌধুরী ও ওদুদের গদ্যরীতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রথম চৌধুরীর গদ্যে মজলিশী মেজাজ আছে। তিনি রসসিক্তভাবে যুক্তিকে প্রকাশ করেন। এতে পরিহাস ও প্রজ্ঞা থাকে। চলিত ভাষারীতির সংস্কার ও সাহিত্যে আনন্দান ছিল প্রমথ চৌধুরীর উদ্দেশ্য। ওদুদের প্রবন্ধে যুক্তি আছে। তাঁর রচনাশৈলীতে প্রমথ চৌধুরীর মতো মনোহারিতা না থাকলেও মহাপ্রাণতা থাকে। ওদুদের সাহিত্য পাঠকের চেতনাকে মহৎ করে। প্রকাশরীতির পার্থক্য সত্ত্বেও 'দুয়েরই মন ধর্মগত, সম্প্রদায়গত, এমনকি দেশগত ও জাতিগত সংস্কার থেকে মুক্ত। দু'জনই এযুগের বাংলা গদ্যের দুই দিকপাল। উভয়ের মধ্যে ভাবগত মিল থাকলেও প্রকাশ ভঙ্গীর দিক থেকে অমিল আছে। রচনাশৈলীর দিক থেকে একজন যদি হন উত্তর মেরুর, অন্যজন দক্ষিণ মেরুর বাসিন্দা। একজনের মন বাল্যে ও কৈশোরে কৃষ্ণনগরের নাগরিকতায় লালিত। ঐ বয়সে অপরজনের মন লালিত হয়েছে পূর্ব বাংলার পদমাতীরে ও মেঘ-মেদুর আকাশের নীচে। উভয়ের রচনাশৈলীর বৈপরিত্যের কারণ বোধ হয় এই পরিবেশেরই বৈপরিত্য। তবে একথা স্বীকার করতে হবে এই দুই বিশিষ্ট গদ্য লেখকের রচনার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছাড়া বাংলা সাহিত্যের পাঠকের সাহিত্য পাঠ কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না।'[৮২] বাংলা গদ্য-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী ও আবদুল ওদুদ দুই দিগন্তের পথিকৃৎ। 'ওদুদের সাহিত্যকর্ম মনীষার, মনুষ্যত্বের দীপ্তিতে উজ্জ্বল।'[৮৩]

ওদুদের গদ্যের প্রধান ভিত্তি যুক্তি, পরিমিতিবোধ ও আত্মপ্রত্যয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই ত্রিবিধ গুণ সংবলিত রচনার উদাহরণ খুব বেশী নেই। তাই এ-দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী রূপে চিহ্নিত করা যায়।[৮৪]

www.nagorikpathagar.org

তথ্য নির্দেশ

১. আবদুল কাদির, 'কাজী আবদুল ওদুদ' বাংলা একাডেমী: ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯শে মে, ১৯৭৬, পৃ. ১
২. নুরুল আমিন, 'ওদুদ রচনা ও বাঙালি সমাজ' বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৮, পৃ. ১২ ও ১৩
৩. নুরুল আমিন, 'ওদুদ-রচনা ও বাঙালি সমাজ' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-৩৬
৪. অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ও অন্যান্য সম্পাদিত, 'কাজী আবদুল ওদুদ স্মৃতি ও সত্তা, কলকাতা, আবর্ত, ১৯৯৪, পৃ. ৫৯
৫. মোহাম্মদ ইদ্‌রিশ আলী, 'কাজী আবদুল ওদুদ' সাহিত্য পত্রিকা, আটত্রিশ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৪০১, পৃ. ১৩
৬. আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত 'কাজী আবদুল ওদুদের পত্রাবলী' ভূমিকা' বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৩
৭. নুরুল আমিন, 'ওদুদ-রচনা ও বাঙালি সমাজ' পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭ ও ৫৮
৮. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম' ঢাকা, সং-২০০৬, পৃ. ২৯৪
৯. মোসা. সেলিনা খাতুন, 'প্রসঙ্গঃ কাজী আবদুল ওদুদ ও শ্বাশত বঙ্গ, কল্লোল প্রকাশনী ঢাকা-২০০৬, পৃ. ৭ ও ৮
১০. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ-সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম' পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪
১১. সাইফুল আলম, 'কাজী আবদুল ওদুদ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যসাধনা' কথা প্রকাশ ঢাকা-২০১৪, পৃ. ১৪৭
১২. নুরুল আমিন, 'ওদুদ-রচনা ও বাঙালি সমাজ' পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৭
১৩. Wilfred Cantwell Smith `Islam in modern History', (4th printing : London, 1966) p. 48
১৪. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' ঢাকা : মুক্তধারা ১৯৮৩, পৃ. ৭৫-৭৬
১৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'ইকবাল' ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৯,পৃ. ১২০
১৬. নুরুল আমিন, 'ওদুদ-রচনা ও বাঙালি সমাজ' পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫ ও ২৭৬
১৭. সাইফুল আলম, 'কাজী আবদুল ওদুদ : জীবনদর্শন ও সাহিত্য সাধনা' পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬
১৮. সাইফুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭ ও ৯৮
১৯. নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭

www.nagorikpathagar.org

২০. নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯ ও ৩৭০
২১. মিহির মুসাকী, 'কাজী আবুদল ওদুদের জীবন জিজ্ঞাসা ও সাহিত্যাদর্শ' বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ৬০
২২. মিহির মুসাকী, 'কাজী আবদুল ওদুদের জীবন জিজ্ঞাসা ও সাহিত্যকর্ম' পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
২৩. মিহির মুসাফী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
২৪. নুরুল আমিন, 'ওদুদ রচনা ও বাঙালি সমাজ' পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮
২৫. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০
২৬. সাইফুল আলম, 'কাজী আবদুল ওদুদঃ জীবনদর্শন ও সাহিত্যসাধনা' পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১
২৭. সাইফুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১
২৮. সাইফুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২
২৯. নুরুল আমিন, 'ওদুদ রচনা ও বাঙালি সমাজ' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬
৩০. নুরুল আমিন, 'ওদুদ রচনা ও বাঙালি সমাজ' পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭ ও ২৬৮
৩১. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম' পূর্বোক্ত,পৃ. ২২১
৩২. নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬
৩৩. নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬ ও ১৭৭
৩৪. আজহার ইসলাম, 'চিরায়ত সাহিত্য ভাবনা' বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৯১
৩৫. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২-৯৪
৩৬. নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪ ও ৯৫
৩৭. নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯ ও ১৮০
৩৮. আনোয়ার হোসেন, 'সংস্কার ও মুক্তি' 'সওগাত', ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৩৬, পৃ. ১৭২
৩৯. সাঈদ-উর-রহমান, 'ওদুদ চর্চা' একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮২, কাজী আবদুল ওদুদ-আনিসুজ্জামান' পৃ. ১৫৮ ও ১৫৯
৪০. সাইদ-উর-রহমান (সম্পাদিত) ওদুদ চর্চা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১
৪১. সাইফুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮ ও ৬৯
৪২. আজহার ইসলাম, 'চিরায়ত সাহিত্য ভাবনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫
৪৩. সাঈদ-উর-রহমান (সম্পাদিত) 'ওদুদ চর্চা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০
৪৪. মিহির মুসাকী, 'কাজী আবুদল ওদুদের জীবন জিজ্ঞাসা ও সাহিত্যাদর্শ' পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
৪৫. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'কাজী আবদুল ওদুদ' বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ৫২

৪৬. মিহির মুসাকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৪৮. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম' পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯
৪৯. মিহির মুসাকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩ ১৪
৫০. আবদুল কাদির, 'কাজী আবদুল ওদুদ' বাংলা
৫১. আবদুল কাদির, 'কাজী আবদুল ওদুদ' বাংলা একাডেমী-ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৮৬ ও ৮৭
৫২. আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত 'কাজী আবদুল ওদুদের পত্রাবলী' ভূমিকা বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯, পৃ. তের।
৫৩. সাইফুল আলম, 'কাজী আবদুল ওদুদ জীবনদর্শন ও সাহিত্য সাধনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০ ও ৭১
৫৪. সাইফুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
৫৫. নুরুল আমিন, 'ওদুদ-রচনা ও বাঙালি সমাজ' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬ ও ১৭৭
৫৬. নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬ ও ২৪৭
৫৭. নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭ ও ২৬৮
৫৮. নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫ ও ২৭৬
৫৯. সাঈদ-উর-রহমান সম্পাদিত "ওদুদ-চর্চা" 'কাজী আবদুল ওদুদ: সাহিত্য ও মতাদর্শ—আবুল ফজল' পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫ ও ১০৬
৬০. সাঈদ-উর-রহমান সম্পাদিত 'ওদুদ-চর্চা' পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬-১০৮
৬১. আবুল কাদির, 'কাজী আবদুল ওদুদ' পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২ ও ৪৩
৬২. মিহির মুসাকী, 'কাজী আবদুল ওদুদের জীবন জিজ্ঞাসা ও সাহিত্যাদর্শ' পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪-৬৬
৬৩. মিহির মুসাকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮ ও ৬৯
৬৪. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম' পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০
৬৫. মিহির মুসাকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
৬৬. মিহির মুসাকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০-৭২
৬৭. মিহির মুসাকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
৬৮. মিহির মুসাকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬ ও ৩৭
৬৯. মিহির মুসাকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮-৪৫
৭০. সাইফুল আলম, 'কাজী আবদুল ওদুদ জীবনদর্শন ও সাহিত্য সাধনা' পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮
৭১. শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা, আবদুল কাদির প্রণীত 'কাজী আবদুল ওদুদ' বাংলা একাডেমী' ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬, পৃ. ভূমিকা তিন।

www.nagorikpathagar.org

৭২. মিহির মুসাকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
৭৩. মিহির মুসাকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২-১৪
৭৪. নুরুল আমিন, ওদুদ-রচনা ও বাঙালি সমাজ' পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১
৭৫. কাজী আবদুল ওদুদের পত্রাবলী, আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত, ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. তের
৭৬. আবদুল কাদির, 'কাজী আবদুল ওদুদ' পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২
৭৭. সাঈদ-উর-রহমান, 'ওদুদ চর্চা' পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২-১০৪
৭৮. নুরুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১
৭৯. সাঈদ-উর-রমহান, 'ওদুদ চর্চা' পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১
৮০. সাইফুল আলম, 'কাজী আবদুল ওদুদ জীবনদর্শন ও সাহিত্যসাধনা' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২
৮১. সাইদ-উর-রহমান, 'ওদুদ চর্চা' 'উদ্ধৃতি, আবুল ফজল' পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬-৯৮
৮২. আবুল ফজল, 'কাজী আবদুল ওদুদ : সাহিত্য ও মতাদর্শ, সাঈদ-উর-রহমান সম্পাদিত' ওদুদ চর্চা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫
৮৩. সাইফুল আলম, 'কাজী আবদুল ওদুদ জীবনদর্শন ও সাহিত্য সাধনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩
৮৪. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩

----

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

নিবেদন

'শাশ্বত বঙ্গের অনেকগুলো লেখা পূর্বে বেরিয়েছিল এইসব বইতেঃ নবপর্যায় (১৩৩৩ সাল), রবীন্দ্রকাব্যপাঠ (১৩৩৪ সাল), নব-পর্যায় দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৩৬ সাল), সমাজ ও সাহিত্য (১৩৪১ সাল), হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ (১৩৪৩ সাল), আজকার কথা (১৩৪৮ সাল), নজরুল-প্রতিভা (১৩৫৫ সাল)। সূচীপত্রে সে-সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাবে। এর প্রথম ৭৯ পৃষ্ঠার লেখাগুলো এর পূর্বে বই আকারে বেরোয়নি, তবে তার অল্প কয়েকটি দিয়ে কয়েক মাস পূর্বে 'স্বাধীনতা-দিনের উপহার' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষের দিকের 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' লেখাটিও পূর্বে কোনো বইতে প্রকাশ করা হয়নি। দেশ-বিভাগের পরের লেখাগুলো বইয়ের প্রথম দিকে দেখতে পাওয়া যাবে।

এর অন্তর্ভুক্ত 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব-ভারতীতে প্রদত্ত নিজাম-বক্তৃতা-স্বত্বাধিকার বিশ্বভারতীর। এটি শাশ্বত-বঙ্গে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ লেখককে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। 'রস ও ব্যক্তিত্ব' লেখাটি এর অন্তর্ভুক্ত দিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কর্তৃপক্ষও তুল্যরূপে লেখকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

১৩৩২ সালে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের সূচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামে একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, তার মূলমন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। কয়েকজন মুসলমান অধ্যাপকের উপরে ন্যস্ত হয়েছিল এর পরিচালনার ভার। শাশ্বত বঙ্গের লেখক তাঁদের অন্যতম। বুদ্ধির মুক্তি, অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগ্য থেকে মুক্ত দান বাংলার মুসলমান সমাজে (হয়ত বা ভারতের মুসলমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু সেদিনে বিস্ময়কর হয়েছিল বাংলার শিক্ষিত মুসলিম তরুণের উপরে এর প্রভাব–একটি জিজ্ঞাসু ও সহৃদয়-গোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল এর দ্বারা। দৃশ্যত এর প্রেরণা এসেছিল মুস্তফা কামালের উদ্যম থেকে, কিন্তু তারও চাইতে গূঢ়তর যোগ এর ছিল বাংলার বা ভারতের একালের জাগরণের সঙ্গে আর সেই সূত্রে মানুষের প্রায় সর্বকালের উদার জাগরণ-প্রয়াসের সঙ্গে। শাশ্বত বঙ্গের অনেক লেখায় রয়েছে সেই স্মরণীয় দিনগুলির স্বাক্ষর, বিশেষ করে 'বুদ্ধির মুক্তি' আর তার আনুষঙ্গিক 'ব্যাপক মানব-হিত' মানুষের সভ্য জীবনের এই মহাপ্রয়োজনের কষ্টিপাথরে বারবার সেসবে যাচাইয়ের চেষ্ট হয়েছে বাংলার ও ভারতের একালের জাগরণের মূল্য ও মর্যাদা, আর বারবার আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে দেশের

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষিত-সমাজের অনবধানতার জন্য সেই অমূল্য প্রচেষ্টার বিড়ম্বনা-ভোগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই আশঙ্কিত বিড়ম্বনা-ভোগ এড়িয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। দেশের একালের জাগরণের এক পরিণতিরূপেই আমাদের লাভ হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কিন্তু সেই স্বাধীনতা-লাভের পুণ্যক্ষণে দেশের (ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানের) অগণিত লোকে যে আত্মিক অপঘাত ঘটলো তাতে সেই অশেষপ্রতিশ্রুতিপূর্ণ স্বাধীনতাও আজো হয়ে আছে রাহুগ্রস্ত।

তবে এমন লাঞ্ছনা শুধু আমাদের দেশের ভাগ্যেই ঘটেনি, বৃহত্তর জগতেও কোলে চলেছে এক অদ্ভুত বিপর্যয়, যার ফলে দেশে দেশে ব্যাপক প্রবণতা জেগেছে কঠিন অপ্রেম আর সংঘর্ষের দিকে; একালের বুদ্ধিজীবীদেরও অনেকের পক্ষপাত সংঘবদ্ধতা, অধিকার-ঘোষণা, আর প্রচারবহুলতার দিকেই–বিচার, প্রেমপ্রীতি, আত্মবিকাশ, এসব আজ তাঁদের চোখে অনেকখানি অবিশ্বাস্য চিন্তাধারা।

এই পরিবেশে 'বুদ্ধির মুক্তি'র কথা সমাদৃত হবে সে-সম্ভাবনা অল্প। আজ বরং মুষ্টিমেয়ের বুকে অনির্বাণ থাকুক এই প্রত্যয় যে তাইই মানুষের জন্য পথ, চিরন্তন ধর্ম, যা পূর্ণরূপে সত্যাশ্রয়ী আর সবার জন্য কল্যাণবাহী,–আর সব বড়জোর আপদ্ধর্ম, অন্য কথায়, বিপথ। মানুষ অপ্রেম চিন্তার আবিলতা থেকে রক্ষা পাক, এই হোক আজ প্রত্যেক দায়িত্ববোধসম্পন্ন নর ও নারীর অন্তরতম প্রার্থনা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

www.nagorikpathagar.org

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

কালিদাসপ্রীতি রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মচরিতে' কালিদাসের ভাষা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে, বিশেষ করে যেখানে তিনি হিমালয়ের শোভা-সৌন্দর্যের বর্ণনার চেষ্টা করেছেন।

মহর্ষির কালিদাসপ্রীতি তাঁর বিখ্যাত পুত্রদের প্রায় প্রত্যেকেই সংক্রামিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শকুন্তলার অনুবাদ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন, আর নবমেঘোদয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের সানুরাগ 'মেঘদূত'-আবৃত্তি কিশোর-রবীন্দ্রনাথের চিত্ত যে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকরা তা জানেন।

কিন্তু প্রতিভার স্বধর্ম স্বীকরণ—অনুকরণ নয়। রবীন্দ্রনাথের গভীর কালিদাসপ্রীতিতে তাঁর সেই স্বীকরণ-বৃত্তি কার্যকরী হয়েছে। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিচার এক উপাদেয় সাহিত্যিক বিষয়, কিন্তু সহজসাধ্য নয় আদৌ, কেননা কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুই কালের দুই মহাভাবুক ও মহাশিল্পী। এ-বিষয়ে মাত্র কিছু কিছু ইঙ্গিত দিতে আমরা চেষ্টা করবো।

প্রথমেই চোখে পড়ে কালীদাসের সৌন্দর্য-বোধে ও রস-বোধে আর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-বোধে ও রস-বোধে পার্থক্য। এ- বিষয়ে মিলও তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট। এই দুই কবিই পৃথিবীর শোভা-সৌন্দর্যের একান্ত অনুরাগী: কালিদাস ইন্দ্র-সারথি মাতলির মুখে বলেছেন—অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী; তার সঙ্গে আত্মিক যোগ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের অগণিত উক্তির :

> শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে,
> চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে............(কবির পুরস্কার)
> মাটির সুরে আমার সাধন—
> আমার মনকে বেঁধেছে রে
> এই ধরণীর মাটির বাঁধন। (গান)

বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে দুই কবির চোখেই পৃথিবীর মহিমা যেন অন্যনিরপেক্ষ—পৃথিবীর যিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা তাঁর কথা অনেকখানি বিস্মৃত হয়ে এঁরা উপভোগ করেছেন পৃথিবীর শোভা-সৌন্দর্য। এক্ষেত্রে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকৃতপ্রেমিক ওয়ার্ডসোয়ার্থের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য সুস্পষ্ট, কেননা, ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রকৃতির অপরূপতার সঙ্গে অভিন্নভাবে দেখেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তার মহিমা। মায়াবাদী হিন্দুর কুলে এই দুই কবির জন্ম যেন অদ্ভুত। কিন্তু হিন্দুর মায়াবাদকে হিন্দু অহিন্দু উভয়েই অসঙ্গত-রকমে বড় করে' দেখেছেন। প্রাচীন হিন্দু যে শুধু—এমনকি মুখ্যত—মায়াবাদী

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাৎস্যায়ন, 'চাণক্য আর বিশেষভাবে ব্যাস— তাঁর মহাভারতের সংখ্যাহীন নায়ক-নায়িকা দোষে গুণে এমন প্রাণবন্ত যে তেমন বিচিত্র প্রাণবন্ত নরনারী— সৃষ্টি জগতের খুব কম সাহিত্যেই সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-বোধে ও রস-বোধে এতখানি মিল সত্ত্বেও খুব বড় পার্থক্য ফুটে উঠেছে এইখানে যে কালিদাস যথেষ্ট ভোগবাদী— অবশ্য সবল সেই ভোগ তাই অসুন্দর নয়— কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী; কালিদাসের সৌন্দর্য-বোধ ও রস-বোধের চাইতে সূক্ষ্মতর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-বোধ ও রস-বোধে। এ সম্পর্কে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি :

বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্॥ [১]

আসসাদ মিথিলাং স বেষ্টয়ন্ পীড়িতোপবন- পাদপাং বলৈঃ।
প্রীতিরোধমসহিষ্ট সা পুরী স্ত্রীব কান্তপরিভোগমায়তম্॥[২]

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুব্ধ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী;
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র..................
ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার; সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে, ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া।

---

১. বালচন্দ্রের মত বক্র অবিকশিত অতিলোহিত পলাশরাজি সদ্যঃ-বসন্তসমাগতা বনস্থলীরূপা নায়িকাদের অঙ্গে নখক্ষত্রসমূহের মত শোভা পাইতে লাগিল। কুমারসম্ভব, তৃতীয় সর্গ।

২. তিনি (দশরথ) মিথিলায় উপনীত হইয়া সৈন্যদলসহ মিথিলা বেষ্টন করিয়া উহার উপবন ও পাদপরাজি পীড়িত করিতে লাগিলেন; মিথিলা তাঁহার প্রীতির অত্যাচার সহ্য করিল যুবতী যেমন সহ্য করে প্রগাঢ় প্রিয়-সম্ভোগ। রঘুবংশ, একাদশ সর্গ।

www.nagorikpathagar.org

অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।
ত্যজিয়া বকুলমুল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি' পরে
জানুপাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে পুষ্পধনু, পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপাচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে৷৷ (বিজয়িনী)

কালিদাসের ভোগবাদ রবীন্দ্রনাথ যেন সজাগ ভাবেই 'শোধিত' করে' নিয়েছেন। 'কুমারসম্ভবে'র শেষের অনেকগুলো সর্গ কালিদাসের রচনা নয় এই প্রচলিত মত তিনি অতি মনোজ্ঞ ভাবে সমর্থন করেছেন এই সনেটে—

যখন শুনালে কবি দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভবগান, —চারি দিকে ঘিরে
দাঁড়াল প্রথমগণ, —শিখরের' পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যামেঘস্তর,-
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত,
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা! কভু স্মিত হাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, —কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল, —কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখি প্রান্তে—যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ন নিমেষে
নামিল নীরবে, —কবি, চাহি দেবী পানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে। (চৈতালি)

"সহসা অসমাপ্ত গানে" থামবার ধরন যে সাধারণত কালিদাসের নয় তার পর্যাপ্ত প্রমাণ তাঁর রচনায় রয়েছে। তবে তিনি প্রকৃতই সৌন্দর্যরসিক, তাই এমন সুকুমার রুচি এক্ষেত্রে তাতে আরোপ করা সঙ্গত ও শোভন দুইই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ঋতুসংহার' সনেটটিও এমন শোভন 'শোধনে'র দৃষ্টান্ত, কেননা মূল 'ঋতুসংহার' প্রকৃতির আবেগপ্রাবল্যের স্তোত্রও বটে আনন্দস্তোত্রও বটে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু কালিদাসের ভোগবাদের এই উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের অনুরোধে না উল্লেখ করে' উপায় নেই যে অন্যান্য বড় প্রতিভার মতো কালিদাসকেও দুই একটি লক্ষণের দ্বারা বুঝে ফেলার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। এই ভোগবাদী কবি আশ্চর্যভাবে ত্যাগবাদীও। মহারাজ অজের রাজ্যভোগ আর দিগ্‌বিজয়ী রঘুর সন্ন্যাসের কৃচ্ছ সাধনা এই দুয়ের যে ছবি তিনি পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছেন তা মনোরম। আমরা কয়েকটি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করছি :

যুবা নৃপতি প্রজাদের পর্যবেক্ষণের জন্য আরোহণ করলেন ধর্মাসন। বর্ষীয়ান নৃপতি চিত্তের একাগ্রতা বিধানের জন্য নির্জনে পরিগ্রহ করলেন কুশাসন। একজন চারপাশের রাজাদের বশীভূত করলেন প্রভু-শক্তির দ্বারা। অপরজন সমাধিযোগের অভ্যাসের দ্বারা বশীভূত করলেন দেহস্থ পঞ্চ মরুৎ। তরুণ নৃপতি ভস্মসাৎ করলেন জগতের শত্রুদের সব আয়োজন। বর্ষীয়ান নৃপতি ভস্মসাৎ করতে প্রবৃত্ত হলেন স্বকর্মসমূহকে জ্ঞানময় বহ্নির দ্বারা।

প্রকৃত মহত্ত্বের ছবি আঁকতেও কালিদাসের অশেষ আগ্রহ; ভারত রাজ্যলোভী না হয়ে রামের অনুপস্থিতিকালে দীর্ঘকাল রাজ্য পরিচালনা করেন, এজন্য কবি তাঁকে বলেছেন, 'অসিধারব্রত' অভ্যাসকারী—শ্রিয়ং 'যুবাপ্যঙ্কগতামভোক্তা' অঙ্কগতা স্ত্রীকে যুবক হয়েও তিনি ভোগ করেননি।'[৩]

একই সঙ্গে ভোগ ও ত্যাগ রবীন্দ্রনাথেও বিদ্যমান, কিন্তু কালিদাসের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর পার্থক্য সূক্ষ্ম এবং গভীর। তরুণ নৃপতির রাজ্যশাসন আর প্রবীণ নৃপতির আত্মশাসনের যে ছবি কালিদাস এঁকেছেন তা থেকে এবং তাঁর আরো বহু উক্তি থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে কালিদাসের চোখে সংসার ও সন্ন্যাস যেন দুই স্বতন্ত্র জগৎ, একটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে' তবেই যেন অন্যটিতে প্রবেশ-পথ পাওয়া যায়। যেন কালিদাস বলতে চান : যতদিন মানুষ সংসারে আছে ততদিন সে মুখ্যত ভোগধর্মী; অবশ্য মহৎদের জন্য এই ভোগ স্থূল চর্বচোষ্যাদি ভোগের সঙ্গে সঙ্গে—কখনো সে-সব অতিক্রম করে— কীর্তি-ভোগ বা যশ:-ভোগও বটে; 'নন্দিনী'কে রক্ষার জন্য রাজা দিলীপ সিংহকে বলেছেন :

আমাকে যদি মনে কর তোমার অবধ্য তবে আমার যশ:-শরীরের প্রতি দয়ালু হও, একান্তবিধ্বংসী পাঞ্চভৌতিক এই পিন্ডে আমার মতো লোকের একান্ত অনাস্থা। লোকোপবাদে সীতাকে বর্জন কালে রামের হয়ে কবি বলেছেন :

লোকোপবাদ নিবৃত্তির অন্য উপায় নেই দেখে রাম পত্নীত্যাগে বদ্ধপরিকর হলেন। যশ যাঁদের ধন তাঁরা নিজেদের দেহ থেকে যশকে অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান করেন, ভোগসুখের সামগ্রীর (স্রক্‌চন্দনবনিতার) তো কথাই নেই।

---

৩. রঘুবংশ, ত্রয়োদশ সর্গ।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এইসব কীর্তিমানদের জীবনেও কালে কালে এমন সময় উপস্থিত হয় যখন ভোগ যশ সবের কথা একেবারে বিসর্জন দিয়ে এঁরা রত হন যোগে-আত্মায় পরমাত্মা দর্শনের ব্রতে। এ আত্মায় পরমাত্মাদর্শনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তরূপে কালিদাস এঁকেছেন কৈলাসে ধ্যানরত মহাদেবের মূর্তি :

মনো নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥[8]

আত্মায় পরমাত্মা দর্শনের বা উপলব্ধির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও সচেতন, এ সম্পর্কে তাঁর নৈবেদ্যে'র এই কবিতা স্মরণ করা যেতে পারে :

হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে
যে উর্ধ্বে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে
লহ ডাকি সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে, —অগ্রসর করো প্রতিদিন
হে মহান্ পথে তব বরপুত্রগণ
গিয়াছেন পদে পদে করিয়া অর্জন
মরণ-অধিক দুঃখ। ওগো অন্তর্যামী,
অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বাণ আমি
দুঃখে তার লব আর দিব পরিচয়।
তারে যেন ম্লান নাহি করে কোনো ভয়
তারে যেন কোনো লোভ করোনা চঞ্চল।
সে যেন জ্ঞানের পথে রহে সমুজ্জ্বল,
জীবনের কার্যে যেন করে জ্যোতি দান,
মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান।

কিন্তু তবু কালিদাসের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার বড় পার্থক্য এই যে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত গুহ্যসাধনাবাদী মরমী নন, 'বিকাশধর্মী মানবতা'-পন্থী ভগবানে বা পরমাত্মায় তাঁর যতখানি আনন্দ তার চাইতে হয়ত তাঁর বেশি আনন্দ মানুষের জাগতিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনায়। এ সম্বন্ধে তাঁর বহু উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে, কয়েকটি উদ্ধৃত করছি :

সেই তো আমি চাই।
সাধনা যে শেষ হবে মোর
    সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয়তো খোঁজা
কে বইবে সে বিষম বোঝা

---

৪. (সংযমী মহাদেব) দেহের নবদ্বার হইতে নিবৃত্ত সমাধিনিয়ন্ত্রিত মন হৃদয়-অধিষ্ঠানে স্থাপিত করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগণ যাহাকে অবিনাশী বলিয়া জানেন সেই আত্মাকে স্বীয় আত্মার মধ্যে অবলোকন করিতেছেন : কুমারসম্ভব, তৃতীয় সর্গ।

www.nagorikpathagar.org

যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে
আবার ফুল ফোটাই। (গীতালি)

পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া। (গীতালি)

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,—
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রী।

এই বিকাশধর্মী মানুষের পরিণামে নির্বাণলাভ বা ব্রহ্মপদ লাভ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অশ্রদ্ধেয় হয়ত নয় কিন্তু বেশি আনন্দ তাঁর এই কথা ভাবায় যে মানুষ স্বীয় সৃষ্টিধর্মগুণে এই সংসার-ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সাহায্যকারী :

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার। (বলাকা)

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে সুপ্রাচীন সোহহম্ তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাও এই সম্পর্কে স্মরণীয়, তার মতে সোহহমের এ অর্থ নয় যে মানুষ ঈশ্বর, বরং এই অর্থ যে মানুষকে হতে হবে ঈশ্বরের মত সুন্দর ও শক্তিমান অর্থাৎ সৃষ্টিধর্মী। তাঁর এই বিখ্যাত বাণীও এই সম্পর্কে স্মরণীয় : যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।[৫]

কালিদাসের কালে, অথবা তার কিছু পূর্বে, ভারতবর্ষে প্রবল হয়েছিল বেদপন্থী ও বেদবিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ। কালিদাস বেদপন্থী-বর্ণাশ্রমধর্মের শক্তিমান সমর্থক, তার আদর্শ নৃপতিরা বর্ণাশ্রমধর্মের সজাগ প্রহরী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যুগে ভারতবর্ষ যে সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করেছিল তা আরো ব্যাপক ও গভীর, তা হচ্ছে প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের সংঘর্ষ। এই বিরাট সংঘর্ষ সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করবার শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর চিন্তাধারার ও আদর্শের অপূর্ব মর্যাদা তাই থেকে।

রবীন্দ্রনাথ যেন সেকাল ও একালের মধ্যবর্তী সেতু। তাঁর আদর্শ যে কালিদাসের আদর্শের চাইতে ব্যাপকতর, একালের মানুষের জন্য বেশি সত্য ও সার্থক, তা সহজেই বোঝা যায়, কেননা একালের মানুষের চিন্তায় বড় ব্যাপার কোনো ধরনের 'মরমী' সাধনায়

---

৫. সমাজ : অযোগ্য ভক্তি

www.nagorikpathagar.org

তেমন নয় যেমন বিকাশধর্মী মানবতা। কিন্তু জীবনাদর্শে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের চাইতে সমৃদ্ধতর বলেই তাঁকে যে কালিদাসের চাইতে স্বভাবত শ্রেষ্ঠতর কবি জ্ঞান করা হবে তা সত্য নয় কেননা কবির সত্যকার কৃতিত্ব অঙ্কনকুশলতায়। অবশ্য শ্রেষ্ঠ অঙ্কনকুশলতার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ চিন্তাভাবনাও স্বভাবতই যুক্ত থাকে, কিন্তু কবির চিন্তাভাবনার মর্যাদা তাঁর অঙ্কনকুশলতার মর্যাদা থেকেই। এর সুপরিচিত দৃষ্টান্ত দান্তে। ধর্মাদর্শে তিনি রোমান ক্যাথলিক, কিন্তু বিশিষ্ট আদর্শবাদী হয়েও মহত্ত্বস্খলিত জীবনের ছবি আঁকার কাজে তিনি এমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন যে সেজন্য জগতের কাব্যরসিকদের চিরশ্রদ্ধেয় হতে পেরেছেন। কালিদাসও জীবনের অর্থপূর্ণ আলেখ্য অঙ্কনে আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন— বিশেষ করে' তাঁর শকুন্তলায়— তাই তিনিও জগতের রসিকদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। কবি হিসাবে এমন শ্রদ্ধার্হ যে রবীন্দ্রনাথও হয়েছেন সে বিষয়ে আমরা, তাঁর একালের স্বভাষীরা, নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই দাবির যথার্থতার বিচারক আমরা নই— কাল। কালিদাসের মতো সেই কালজয়ী কবি প্রতিষ্ঠা যে যে কারণে রবীন্দ্রনাথের লাভ হবে বলে' আমাদের ধারণা তা সংক্ষেপে বিবৃত করা যায় এইভাবে :

কালিদাসের রচনায় রয়েছে অপূর্ব লালিত্য ও গাম্ভীর্য; রবীন্দ্রনাথের রচনাও তুল্যরূপে ললিত ও গম্ভীর। হয়তো এক্ষেত্রে কালিদাসই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পথপ্রদর্শক। কিন্তু বিদ্যা এক্ষেত্রে যোগ্য শিষ্যে ন্যস্ত হয়েছিল।

কালিদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষে, সেই স্বাধীন ভারতবর্ষে ছিলো মহাবিক্রম নৃপতিকুল। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নায়করা তাই শক্তিমান সৈনিক— অমিতপরাক্রম। রবীন্দ্রনাথের জন্ম পরাধীন ভারতবর্ষে । কিন্তু সেই হীন দশায়ও ভারতবর্ষের অন্তরে জেগেছিল নবশক্তির উল্লাস— বিরাট জগতে শ্রদ্ধেয় হবার স্বপ্ন। রবীন্দ্রনাথ সেই জাগরণের কবি, তাই তাঁর নায়করা ব্যবসায়ে বীর-সৈনিক না হলেও প্রকৃতপক্ষে বীরত্ব-ধর্মী, পরাজয় স্বীকার করা তাদের স্বভাব নয়, জীবনে নব নব মহিমার সম্ভাবনায় উদ্‌বোধিত হওয়া তাদের জন্মগত অধিকার।

কালিদাস সৃষ্টি করেছেন শকুন্তলাকে; অপূর্ব সেই নারী-মূর্তি— বোধ হয় শিল্পে নারীসৃষ্টির চরম— একাধারে সে উর্বশী আর লক্ষ্মী, মর্ত্য আর স্বর্গ, বসন্ত আর হেমন্ত। রবীন্দ্রনাথও সৃষ্টি করেছেন এক চিরবন্দনীয় মাতৃমূর্তি—আনন্দময়ীকে—জগতের সাহিত্যে হয়ত অদ্বিতীয় মাতৃমূর্তি; কিন্তু শকুন্তলার মতো একই সঙ্গে মহিমা ও মোহনতা সেই মূর্তিতে নেই, তাই শিল্পসৃষ্টি হিসাবে শকুন্তলার গৌরব বেশি। কিন্তু এক পরমমোহন শিল্প-সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথও করেছেন, সেটি হচ্ছে তাঁর নিজের অন্তরাত্মা—প্রকৃতির অযুত লীলায় অপরূপভাবে চঞ্চল, অথচ এত যে লীলাচাঞ্চল্য, সৌন্দর্যের পরমসূক্ষ্ম অনুভূতি, সব অজানার উদ্দেশ্য স্তবনিবেদন :

> আমর সব চেতনা সব বেদনা
> রচিল এ যে কী আরাধনা...[৬]

---

৬. নটীর পূজা

www.nagorikpathagar.org

গম্ভীর ও অকূল স্তবনিবেদন জগতে ঢের হয়েছে, কিন্তু এমন মোহন স্তবনিবেদন হয়ত আর কোনো দ্বিতীয় কবির দ্বারা সম্ভবপর হয়নি।

আষাঢ়, ১৩৫৩

রস ও ব্যক্তিত্ব

ব্যাপক অর্থে মানুষের সমস্ত লিপিবদ্ধ চিন্তাভাবনাকে সাহিত্য বলা যায়। কিন্তু সাধারণত আমরা বিজ্ঞানকে সাহিত্যের অন্তর্গত করে' দেখি না। দর্শন ও ইতিহাসকে যদিও সাহিত্য থেকে পৃথক করা খুব বেশি কঠিন তবু এসবও সাধারণত আমরা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করি না।

বাংলায় এই সংকীর্ণ অর্থে সাহিত্যের প্রচলিত নাম রস-সাহিত্য। নামটি এক হিসাবে বেশ ভাল কেননা এই সংকীর্ণ অর্থে সত্যকার সাহিত্য তাই যা রসোত্তীর্ণ। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক অনুসন্ধান ও বিচার অথবা ঐতিহাসিক তথ্য সাহিত্যে অবাঞ্ছিত অথবা অপ্রয়োজনীয়; তবে, প্রকৃত সাহিত্যে এসব অতিক্রম করে' থাকা চাই রস অর্থাৎ মানুষের মনের বিশেষ ও গভীর অনুভূতির পরিচয়।

আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে এই রস বা অনুভূতিকে মোটামুটি কয়েক ভাগে ভাগ করে' দেখা হয়েছে, যথা, হাস্য রৌদ্র বীভৎস করুণ ইত্যাদি। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সেই রসের নয় বিভাগ যে একালে আমাদের খুশী করতে অক্ষম তা বলাই বাহুল্য, কেননা, মানুষের মন যে অত্যন্ত জটিল, সুতরাং তার অনুভূতিও বহু বিচিত্র, এ বিষয়ে এযুগে আমরা অতিশয় সচেতন। তবে রস, অর্থাৎ অনুভূতির বিশেষ পরিচয়, যে সাহিত্যের এক অতি বড় ব্যাপার সে-সম্বন্ধে প্রাচীনদের নির্দেশ শিরোধার্য। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' তাঁদের দেওয়া সাহিত্যের এই সংজ্ঞা বাস্তবিকই মূল্যবান নির্দেশ।

কিন্তু একালে আমাদের সাহিত্যিক চিন্তাভাবনা যেমন মূল্যবান রস তেমনি মূল্যবান অন্য একটি ব্যাপার—তার নাম সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব। নানা দেশের নানা কালের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা বুঝেছি সাহিত্যে সাহিত্যস্রষ্টার এই ব্যক্তিত্বের মর্যাদা। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্, আর সাহিত্য ব্যক্তিত্বের বাণীরূপ— সাহিত্যের এই দুই সংজ্ঞাই আজ আমাদের জন্য মহামূল্য।

কিন্তু এ দুটিকে স্বতন্ত্রভাবে বোঝা আমাদের পক্ষে যত সহজ এ দুয়ের পরস্পরের যোগাযোগের তত্ত্বটি বোঝা সেই পরিমাণে দুরূহ, কত দুরূহ তা বোঝা যাবে এই থেকে যে এ-দুয়ের পূর্ণ উপলব্ধির সন্ধান আমরা পাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যেই, কিন্তু মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে তাঁদের সংখ্যা অতিশয় পরিমিত। সাধারণত কবি সাহিত্যিক

www.nagorikpathagar.org

নামে যাঁরা পরিচিত তাঁরা মোটের উপর সাহিত্যে রসের অর্থাৎ মাধুর্যের ও কলাকৌশলের কথা কিছু কিছু বোঝেন, কিন্তু ব্যক্তিত্বের কথা খুব কমই বোঝেন। এর দৃষ্টান্ত রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে। মনোরম পদ ও শ্লোকের রচয়িতা সে-সাহিত্যে প্রচুর সংখ্যায় মেলে, প্রকাশের মার্জিত্বের গুণে অশ্লীল কবিতাও তাতে সাধারণত সুপাঠ্য, কিন্তু সাহিত্যের বাণীতে যেমন চাই মনোহারিতা তেমনি চাই মহাপ্রাণতা, কিন্তু সেটি সম্ভব হয় রচয়িতা নিজে যখন মহাপ্রাণ— রচয়িতার নিজের সেই মহাপ্রাণতা ভিন্ন পাণ্ডিত্য কলাকৌশল কিছুই তাঁর বাণীতে সেই মহাপ্রাণতার সঞ্চার করতে পারে না—এ বিষয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিকরা যেন উদাসীন। এই ব্যাপারে গ্যেটের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে মন্তব্যটি তিনি করেছিলেন বিখ্যাত সমালোচক শ্লেগেল সম্পর্কে :

> স্বীকার করতে হবে যে, শ্লেগেলের জানাশোনা ঢের, তাঁর অসাধারণ গুণপনা ও পড়াশোনা দেখে ভীত হতে হয়। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। জগৎজোড়া পাণ্ডিত্য থাকলেও বিচারক্ষমতা না থাকতে পারে। শ্লেগেলের সমালোচনা সম্পূর্ণ একদেশদর্শী, তার কারণ, নাটকে তিনি দেখেন শুধু প্লট ও সাজাবার কৌশল আর পরবর্তীদের সঙ্গে (আলোচ্য) লেখকের ছোটখাটো মিল। সেই লেখক জীবনের মাধুর্য ও মহৎ চিত্তের প্রভাব কতখানি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। কিন্তু প্রতিভার সমস্ত কলানৈপুণ্যের কি মূল্য যদি নাটকে আমরা না পাই লেখকের মধুর অথবা মহৎ ব্যক্তিত্ব? জনসাধারণের চিত্তের উৎকর্ষ ঘটে এরই গুণে। শ্লেগেলের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব মহৎদের প্রকৃতি বুঝবার ও সমাদর করবার আযোগ্য।'[৭]

মহৎ ব্যক্তিত্ব দুর্লভ ব্যাপার বলে'ই সব দেশের সাহিত্যেই, বিশেষ করে' চলতি সাহিত্যে, কলাকৌশলের বিন্যাস কবি ও সাহিত্যিকদের এক বড় কাজ। এমন চেষ্টার একটা ব্যবহারিক মূল্য অবশ্যই আছে, কেননা, অনেকের জন্য সাহিত্য কালহরণের বহু উপায়ের মধ্যে একটি উপায়; শিল্পেরও এমনি প্রয়োজনীয় অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিজ্ঞাপনে শিল্পের ব্যবহার। এমন নিকৃষ্ট কলা-কৌশলের সাহিত্য ও শিল্প যে বহুজনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে, তাদের চিত্তবিনোদনও কিছু পরিমাণে করতে পারে, এতেই প্রমাণিত হয় যে শিল্পে ও সাহিত্যে কলাকৌশল খুব বড় ব্যাপার— শিল্পের ও সাহিত্যের বিশেষত্ব এই থেকে। কিন্তু যাঁরা দৃষ্টিমান তাঁদের বুঝতে দেরী হয় না যে এই কলাকৌশলের প্রয়োগও তাঁদের দ্বারা বেশি সার্থক হয় যাঁরা শুধু কলাকুশলী নন, সেই সঙ্গে সহজভাবে মহৎ।

শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এই মতত্ত্বের কথা কিন্তু একটু বিশেষভাবে বুঝবার আছে। সাধারণত দেখা যায় যাকে মহত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যায় তেমন চরিত্র শিল্পী-সাহিত্যিকদের নয়। তাঁদের শ্রেষ্ঠদের প্রতিনিধিস্থানীয় বরং ভর্তৃহরি যিনি বহুবার বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন আর বহুবার কামনার জীবনে ফিরে এসেছিলেন— খেয়ালের বশে নয়,

---

৭. কবিগুরু গ্যেটে, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯১

www.nagorikpathagar.org

অন্তরপ্রকৃতির সত্যকার তাগিদে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে সবলতা ও দুর্বলতা যে এমন একই সঙ্গে থাকে বোধ হয় এই জন্য ভাল আর মন্দ দুয়েরই আকর্ষণের মনোহারিতা তাঁরা নিজেরা এমন গভীর করে' উপলব্ধি করেন আর সুন্দর করে' তা ব্যক্ত করতে পারেন। চিত্তের এমন সহজ প্রসার, বিচিত্র অনুভূতির এমন তীক্ষ্ণতা, যখন শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্য দুর্লভ হয়ে কোনো বিশেষ idea ধারণার চাপে তখন ঘটে তাঁর পতন। তখনো দক্ষতাগুণে লোভনীয় অথবা রোমাঞ্চকর চিত্র তিনি অঙ্কিত করতে পারেন কিন্তু মানুষের চিত্ত গভীরভাবে আশ্লিষ্ট হতে পারে তাঁর রচনা আর তেমন রচনা থাকে না । এমন ত্রুটিপূর্ণ শিল্প সম্পর্কে ম্যাক্সিম গোর্কির টলস্টয়—চরিতের এই বিচার স্মরণীয়–বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ :

> ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমান কালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলেছেন, এ লেখাটা আর্টিষ্টের যোগ্য লেখা বটে; অর্থাৎ টলস্টয় দোষে গুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে; এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তিশ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয়, টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড় তা নয়, এমন কি, অনেক বিষয়ে হেয়।.......টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিলনা এ কথা বলাই চলে না; খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু যে-সত্যের গুণে টলস্টয় বহু লোকের এবং বহুকালের, তাঁর ক্ষণিকমূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে' থাকে তাহলে এই আর্টিষ্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী। প্রথম যখন আমি দার্জিলিং দেখতে গিয়েছিলুম দিনের পর দিন কেবলই দেখেছিলুম মেঘ আর কুয়াশা। কিন্তু জানা ছিল, এগুলো সাময়িক এবং যদিও হিমালয়কে আচ্ছন্ন করবার এদের শক্তি আছে তবুও এরা কালো বাষ্প মাত্র, কাঞ্চনজঙ্ঘার ধ্রুব শুভ্র মহত্ত্বকে এরা অতিক্রম করতে পারে না। আর যাই হোক, হিমালয়কে এই কুয়াশার দ্বারা তিরস্কৃত দেখে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে মূঢ়তা হতো। ক্ষণকালের মায়ার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে দেখাই আর্টিষ্টের দেখা, একথা মানতে পারি নে। তা ছাড়া গোর্কির আর্টিষ্ট চিত্ততা বৈজ্ঞানিক হিসেবে নির্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে-ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা যে- সত্য তা কেমন করে' বলব। গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়। বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংযত করতে পারতেন তাহলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত। তার মধ্যে অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত, আর তবেই যা না-ভোলবার তার বড় হয়ে, সম্পূর্ণ হয়ে, দেখা দিত। [৮]

৮. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮২

www.nagorikpathagar.org

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার শেষ ক'টি ছত্রে যে বলা হয়েছে : শিল্পীর কাজ শুধু অঙ্কনকুশল হওয়া নয়, শিল্পীর কাজ তাঁর বর্ণনার বিষয় সম্পর্কে প্রধান ও অপ্রধানের বিচার করা, সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে এ এক বড় ব্যাপার। বলা বহুল্য এরও যোগ কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই, নিজে এক মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হলে জীবনের ব্যাপারে এমন প্রধান অপ্রধানের বিচার সম্ভবপর নয়; কিন্তু জীবনে প্রধান অপ্রধানের ভাল-মন্দের এই ভেদ সাহিত্যিক ও শিল্পী যে করেন সেটি কিন্তু ঠিক নীতিবিদের ভঙ্গিতে নয়। নীতিবিদ কোনো বিশেষ আদর্শকে তাঁর অথবা তাঁর ও জগতের জন্য শ্রেয় জ্ঞান করেছেন, আর যথাশক্তি অনুসরণ করে' চলেছেন সেই আদর্শই, অন্যদিকে দৃষ্টি তাঁর প্রায় নেই, কিন্তু শিল্পী—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পী— জীবনের এক বিশেষ আদর্শ সম্বন্ধে যেমন সচেতন তেমনি সচেতন মানবচিত্তের বিচিত্র প্রবণতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে, তবে এই বিচিত্র প্রভাবে ও আকর্ষণে শ্রেষ্ঠ শিল্পী আকুল ও দিশাহারা নন, চমকিত ও আন্দোলিত কিন্তু স্থিরলক্ষ্যও—যেমন স্থিরলক্ষ্য বর্ষার দুরন্ত পদ্মায় যারা পাড়ি জমায় সেই মহাবিচক্ষণ ও মহালাঞ্ছিত মাঝিরা। শিল্পে ও সাহিত্যে এমন বিচক্ষণতা অবশ্য উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পক্ষেও দীর্ঘদিনের লভ্য, কাজেই আলোচনার বিষয় তেমন নয়। শিল্পে ও সাহিত্যে এই ধরনের ব্যাপার লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে— শিল্পের অতি অল্প অংশই শেখানো যায় কিন্তু শিল্পীকে জানতে হয় সবটা।

সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে এই যে দুটি কথার অবতারণা আমরা করেছি— আর ব্যক্তিত্ব— অর্থাৎ রচনাকে রসময় করা আর তাতে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ দান করা, যাতে রচনাটি হয়ে ওঠে শুধু মধুর নয়, বিশিষ্ট, এই দুটি ব্যাপারই কি সমান মর্যাদার? অথবা এ-দুয়ের মধ্যে এমন সম্পর্ক আছে যার গুণে এর বিশেষ একটির সাধনাই অন্যটি লাভেরও প্রশস্ত উপায় বলে' গণ্য হতে পারে? ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা বুঝি, রসই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রধান নির্ভরের ব্যাপার হয়েছে; তাতে প্রাচীন সাহিত্য সহজেই হয়েছে সুখপাঠ্য আর অনেকের আকর্ষণস্থল। কিন্তু রস যত মনোহর হোক একালে আমাদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে সাহিত্যে ও শিল্পে ব্যক্তিত্বের দ্বারা, এমন কি, সাহিত্য ও শিল্পের সমস্ত মাধুর্যের সমস্ত কলা কৌশলে ব্যক্তিত্বের স্পর্শটুকু আবিষ্কার করতে না পারলে আমাদের শিল্প ও সাহিত্য উপভোগ আজ আর পূর্ণাঙ্গ হয় না। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই অতি গভীর ব্যাপার। গজে গজে যেমন মৌক্তিক হয় না তেমনি এই ব্যক্তিত্বও সাহিত্যে দুর্লভ রয়ে যাবে হয়ত চিরকাল—তা পাণ্ডিত্য ও কলাকৌশলের পথে যতই আমরা অগ্রসর হই। এটি সজাগ সাধনারও ব্যাপার তেমন মনে হয় না, বরং কতকটা জন্মগত সহজ অধিকারের ব্যাপার অথচ অশ্রান্ত বিকাশেরও ব্যাপার। —তবে, একালে সাহিত্যে ও শিল্পে এই ব্যক্তিত্বের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে একালের সমালোচনা সাহিত্য এক নূতন মর্যাদা লাভ করেছে।[১]

জুন, ১৯৪৬।

---

১. অল ইন্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে

www.nagorikpathagar.org

ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি

দেশ বিভক্ত হলো। এর ফলে ভারতবর্ষের পূর্বে ও পশ্চিমে মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন ভূখণ্ড লাভ হলো। এই স্বাধীন ভূখণ্ড মুসলমানরা কিভাবে শাসন করবে, কিভাবে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে, আজ সে-কথা বিশেষভাবে ভাবা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব পশ্চিম দুই অঞ্চলেই কথা উঠেছে মুসলমানদের এই নূতন রাষ্ট্র 'শরীয়ত' অর্থাৎ কোরআন-হাদিসের বিধিবিধান অনুসারে শাসিত হওয়া চাই। এই মত প্রবল হয়ে উঠবে মনে হয় কেননা, মুসলমানরা নূতন রাষ্ট্র লাভ করেছে স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবিতে।

কিন্তু এযুগে প্রাচীন শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তনের পথে বাধাও কম নেই। সেই-সব বাধা দুই প্রধান ভাগে ভাগ করে' দেখা যেতে পারে : প্রথমত, শরীয়তের ও একালের বিধিবিধানের মধ্যে পার্থক্য; দ্বিতীয়ত, নূতন মুসলিম রাষ্ট্রে অ-মুসলমানেরা সংখ্যাশক্তিতে নগণ্য নয়, তারা শরীয়তের বিধান অনুসারে শাসিত হতে রাজী হবে কি না।

প্রথম শ্রেণীর কথাই আগে ভাবা যাক। কোনো কোনো অপরাধের জন্য অপরাধীর হাত পা কেটে ফেলা কিংবা তাকে পাথর মেরে' মেরে ফেলার বিধান শরীয়তে আছে। মুসলমানদের নূতন রাষ্ট্রে সে-সবের পুনঃপ্রর্বতন হবে? অপরাধের প্রতি একালের মানুষের মনোভাবে বড়-রকমের পরিবর্তন ঘটেছে— অপরাধকে একালে দেখা হয় প্রধানত সামাজিক ব্যাধি হিসাবে; তাই অপরাধী ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেবার কথা তেমন না ভেবে একালে ভাবা হয় শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে তাকে একজন স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ করে গড়ে তোলার কথা। শরীয়তপন্থীরা কি এই নূতন সম্ভাবনাপূর্ণ সমাজদর্শন অস্বীকার করবেন? একে ইসলামের প্রতিকূল জ্ঞান করবেন? (পাথর মারার মত শাস্তি হজরত মোহাম্মদ যথেষ্ট অনিচ্ছুক হয়ে বিধান করছেন হাদিস গ্রন্থে এমন প্রমাণ বিরল নয়।)

দ্বিতীয় শ্রেণীর বাধাও কম প্রবল নয়, বরং এক-হিসাবে প্রথম শ্রেণীর চাইতেও গুরুতর, কেননা, সংখ্যালগিষ্ঠদের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠদের আচরণের উপরই নির্ভর করবে ভারতবর্ষের মুসলমান ও হিন্দু উভয় রাষ্ট্রেরই শান্তি-শৃঙ্খলা—হয়ত বা তাদের অস্তিত্ব। তবে অন্য দিক থেকে এ সমস্যাটা একটু হাল্কা করে' ভাবা যায়। মুসলমানরা যদি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয় যে শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তনই তাদের রাষ্ট্রের জন্য প্রধান কাম্য, আর মুসলিম রাষ্ট্রের অ-মুসলমানরা যদি শরীয়তের শাসন অস্বীকার করতে অসম্মত হয়, তবে অতি দুরূহ লোক— বিনিময়ের দ্বারা মুসলমানেরা এ সংকট থেকে উদ্ধার পেতেও পারে।

প্রথম শ্রেণীর বাধা কিন্তু তেমন কঠিন মনে না হলেও আসলে খুব কঠিন, কেননা, এক্ষেত্রে বিরোধ কারোর সঙ্গে নয়, বিরোধ নিজেদের মনের সঙ্গে। ধর্মের বিধান কেন মানুষ মানবে? এই জন্য যে ধর্মের বিধান মানলে মানুষের যে শুধু পরকালে কল্যাণ হবে

www.nagorikpathagar.org

তাই নয়, ইহকালেও কল্যাণ হবে সেই জন্য মুসলমান তার প্রার্থনায় বলে : প্রভু দুনিয়ার ভালো দাও, পরকালেও ভালো দাও। কিন্তু তার বিচার বুদ্ধি যদি তাকে বলে : অপরাধ মানুষ করে শুধু তার কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়ই নয় বরং অভাবের তাড়নায়, আর সব মানুষের অভাব অভিযোগ দূর করা এযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান কাজ— তবে হাত পা কাটা ও পাথর মেরে' মেরে ফেলার মত কঠোর শাস্তি মেনে নেওয়া তার পক্ষে সহজ হবে না— কেবলই তার মনে হবে : সত্যই কি মানুষের উপকার হচ্ছে এমন সব বিধানের দ্বারা? তাই শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তন যাঁরা চান তাঁদের একথা বললেই চলবে না যে শরীয়ত কোরআন-হাদিসের বিধান, অতএব মান্য; তাঁদের বরং প্রমাণ করতে হবে যে শরীয়ত বলতে যে সব বিধিবিধান মুসলমানরা পুনরায় প্রবর্তিত করতে চায় সে-সব একালেও মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নতির জন্য বাস্তবিকই কাম্য। কোরআনও কিন্তু এই কথাই বলেন : কোরআন আল্লাহর বাণী অতএব মানুষকে মানতে হবে, এইই কোরআনের প্রধান বক্তব্য নয় বরং কোরআনের প্রধান বক্তব্য এই যে কোরআন আল্লাহর বাণী, মানুষ তার বুদ্ধিকে সক্রিয় করে প্রকৃতির দিকে আর ইতিহাসের ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে কোরআনের নির্দেশের সত্যতা উপলব্ধি করুক, আর সেই নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে ইহকালে ও পরকালে লাভবান হোক। কোরআনের ও হাদিসের মধ্যে একটি লক্ষণীয় পার্থক্য এই যে 'রূপে'র চাইতে 'ভাবে'র উপরে জোর কোরআনে কিছু বেশি।

বাস্তবিক মুসলমানের ধর্মগত সমস্যা সাধারণত যত সহজ ভাবা হয় আসলে তত সহজ নয়। মুসলমানের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরআন। কোরআনের নিচে বিশ্বস্ত হাদিসের (হজরত মোহাম্মদের বাণীর ও চরিত্র-চিত্রের) স্থান। কোরআনের আকার বড় নয়। বিশ্বস্ত হাদিসও সংখ্যায় খুব বেশি নয়। কাজেই কোরআন-হাদিসের প্রকৃত বিধিবিধান কি সে সম্বন্ধে কাজ চালাবার যোগ্য একটা ধারণা করা কঠিন নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় :

ইসলামের নির্ভর অলিখিত অনির্দিষ্ট শাস্ত্রের উপরে নয়, বরং সুলিখিত সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রের উপরে। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনও এই সব সুস্পষ্ট নির্দেশের দ্বারাই চালিত। যে কোনো শাস্ত্রজ্ঞ 'আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় : একজন ধার্মিক মুসলমানের কি কর্তব্য? তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে উত্তর দেবেন : তাকে আল্লাহ-তে ও রাসুলে বিশ্বাস করতে হবে, নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত নিয়মিতভাবে নিষ্পন্ন করতে হবে। কিন্তু সেই 'আলেম'কে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় : এসব শাস্ত্রীয় বিধিবিধান-পালনকারীর সংখ্যা মুসলমান- সমাজে নগণ্য নয়, কিন্তু কোরআনে যে বলা হয়েছে, "নামাজ পড় নামাজ কদর্যতা ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে" এমন কল্যাণপথের প্রকৃত পথিক মুসলমান সমাজের বিধিবিধান পালনকারীদের মধ্যে তেমন লক্ষণীয় নয় কেন, তবে তার উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের এই দিকটা তাঁর চিন্তাভাবনার বিষয় হয়নি বললেই চলে, কেননা, তার মনোযোগ আকৃষ্ট রয়েছে লিখিত বিধিবিধানের রকমারিত্বের দিকে, সমাজ মনের উপরে সে-সবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে সেই অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ব্যাপারের দিকে নয়। ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) আবিষ্কারের পর খাদ্য-

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন, খাদ্যে সূক্ষ্ম ভিটামিনের অভাব যদি হয় তবে স্থূল অন্যান্য উপকরণই তাতে থাকুক সে-সবের দ্বারা মানবদেহের প্রকৃত পুষ্টিসাধন হয় না; তেমনি ধর্মের বিচিত্র বিধিবিধানের মূল্য যে সূক্ষ্ম মনুষ্যত্ব-সাধন, অর্থাৎ জ্ঞান ও চরিত্র লাভ ও অশ্রান্ত শুভ-সাধনা, সেই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা ভুলে গেলে ধর্মের বিধিবিধান পালনের দ্বারাও কোনো সত্যকার লাভ সম্ভবপর নয় তা সে-সব বিধিবিধান যত বিচিত্র, যত কষ্টসাধ্য হোক। —কোরআন বলেন :

> তিনি জ্ঞান দেন যাকে ইচ্ছে করেন, আর যে জ্ঞান পায় সে মহাসম্পদ পায়, জ্ঞানী ভিন্ন আর কেউ বিচার করে দেখে না। (২:২৬৯)।
>
> আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন : একজন ক্রীতদাসের কথা ভাব, কোনো কিছুর উপরে তার কর্তৃত্ব নেই, আর ভাব অন্য একজনের কথা যাকে আমার তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে উৎকৃষ্ট জীবিকা, তা থেকে সে খরচ করে, চলে প্রকাশ্যে এবং গোপনে এই দুইজন কি তুল্য মর্যাদার?..........(১৬:৭৫)

ধর্মের এই যে মূল কথা মনুষ্যত্ব-সাধন ব্যাপক ও গভীর মনুষ্যত্ব-সাধন এই ব্যাপারটি না বুঝে ধর্মের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করতে গেলে যে নিতান্ত কাঁচা বনিয়াদের উপরে ইমারত তোলার চেষ্টা করা হয়, মুসলমান-সমাজের একালের শরীয়ত পন্থীদের সে-বিষয়ে হুশিয়ার হবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এ যুগ আত্মনিয়ন্ত্রণের বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যসাধনের যুগ বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিবিড় বিশ্বসংযোগের যুগও বটে। আত্মনিয়ন্ত্রণ-তত্ত্ব থেকে যে এ যুগের মুসলমানেরা নূতন করে লাভ হয়েছে শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তনার স্বপ্ন তা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু যদি শুধু আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বপ্নে সে বিভোর থাকে আর বিশ্বের সঙ্গে তার যোগ যদি শিথিল হয় তবে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ওহাবীদের চাইতে তার ভাগ্য প্রসন্নতর হবার কথা নয়, কেননা ওহাবীদের মনোবল ছিল অপরিসীম আর বাইরের সঙ্গে সংযোগ দূরে থাকুক তাঁদের শত্রুপক্ষের বলবিক্রম সম্বন্ধে ধারণাও ছিল অদ্ভুত।[১০] একালের শরীয়তপন্থীরা ওহাবীদের অনুবর্তী না হয়ে বরং অনুবর্তী হোক মহাপ্রাণ স্যার সৈয়দের, ইসলাম সম্বন্ধে যিনি বলতে পেরেছিলেন : 'যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়'। যে কোন ধর্ম বা আদর্শ সম্বন্ধে এ সার কথা। যা সত্য অর্থাৎ সার্থক নয় তা ধর্ম বা আদর্শ হবার যোগ্য নয়। কোরআনের একটি বাণীর মর্ম এই; আল্লাহ্ যদি চাইতেন তবে সবাইকে এক জাতীয় লোক করতেন, কিন্তু তিনি মানুষের (বিচার-বুদ্ধির) পরীক্ষা করতে চান, তাই কল্যাণের পথে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করুক (৫ : ৪৮)। কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর উপর জোর দিতে ইসলাম যে কসুর করেনি দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের 'আলেম'রা সে-কথা ব্যক্ত করতে পারেন নি। সেজন্য মুসলমান-সমাজের একালের চিন্তানেতাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে। সব সময়ে তাঁদের হুশিয়ার থাকতে হবে পূর্বের ভুল যেন আবার না করা হয়। তাঁরা গভীরভাবে বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠদের

---

১০. দ্রঃ 'বাংলার মুসলমানের কথা'

www.nagorikpathagar.org

কথা, ভিন্ন দেশ জাতির শ্রেষ্ঠদেরও কথা, এসবের চাইতেও কঠিনতর প্রয়াস তাঁরা করুণ চরিত্রে ও চেতনায় নিজের মহৎ হতে, কেননা যার নিজের চোখ নেই, সূর্যের ঔজ্জ্বল্যও তার জন্য ব্যর্থ; আর বিচিত্র শুভ-সাধনায় তাঁরা সংসারে গড়ে তুলুন স্বর্গ—প্রত্যেক স্মরণীয় জাতি এমন সংসারে স্বর্গ গড়ার চেষ্টা করেছেন। এমন বিচিত্র ও বিপুল ঐহিক পাথেয়ের সাহায্যেই তাঁরা আশা করতে পারেন এমন শত বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করে' শরীয়তের মর্ম উপলব্ধি করতে। শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তন অবশ্য অসম্ভব, কেননা অতীতে অস্তমিত—মৃত—তার যে অংশ সজীব সে তুমি ও আমি; অতীত পুনর্জীবিত হবে না, তবে তুমি ও আমি বিপুল সাধনায় নব মহিমা লাভ করতে পারবো— সংসারে এক নতুন চাঁদের হাট বসাতে পারবো।[১১] আর যেহেতু আমরা ইসলামের উত্তরাধিকারী সেজন্য আমাদের মহিমা- লাভ হবে ইসলামের নতুন মহিমা লাভ।

নতুন মুসলিম রাষ্ট্রে অ-মুসলমানদের সমস্যার ইঙ্গিত মাত্র করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি বাস্তবিকই খুব জটিল। মুসলমানদের ইতিহাসে দেখা যায়, এটি বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে মীমাংসা করতে চেষ্টা করা হয়েছে। মদিনায় ও হোদায়বিয়ায় হজরত বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন মুসলমান ও অ-মুসলমানের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে, পরস্পরের মধ্যেকার বিরোধিতা দূর করতে, সেজন্য নিজের প্রাধান্য অনেকখানি খর্ব করতেও তিনি প্রস্তুত। কিন্তু বিজয়ী ইসলাম স্বভাবতই বিজিতদের সঙ্গে সন্ধি করেছে তাদের আনুগত্য-স্বীকারের শর্তে। সেই আনুগত্য-স্বীকারের ধারাও এক থাকেনি। প্রথম যুগে অ-মুসলমানেরা আনুগত্য স্বীকার করে জিজিয়া দিয়ে তাদের ধর্মাদি আচরণের অবাধ অধিকার পেতো, সিন্ধুর হিন্দুরা বিন্ কাসিমের কাছ থেকে এমন অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু পরে এ-অধিকার কিছু ক্ষুণ্ন হয়েছিল—মুসলিম রাষ্ট্রে নতুন করে দেবমন্দির নির্মাণের অধিকার স্বীকৃত হয়নি। প্রধানত এই ব্যাখ্যারই ফলে আওরঙ্গজেব বহু হিন্দু মন্দির ভেঙ্গেছিলেন। অ-মুসলমানদের প্রতি প্রাচীন মুসলিম রাষ্ট্রের এই নীতিবৈচিত্র্য একালের মুসলমানরা যথেষ্ট কাজে লাগাতে পারে। এক্ষেত্রেও স্যার সৈয়দের অপূর্ব ইসলাম-নীতি—যা সত্য নয়, অর্থাৎ সার্থক নয়, তা ইসলাম নয় তারা প্রয়োগ করতে পারে; কায়েদে আজমের যে সংখ্যালগিষ্ঠদের প্রতি অভয় দান তা সম্পূর্ণ ইসলাম অনুমোদিত জ্ঞান করতে পারে।

ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি কী— আইনজ্ঞেরা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন কোরআন হাদিস আর মুসলিম ইতিহাস মন্থর করে। কিন্তু যিনি জানেন মুসলমান হওয়ার অর্থ

---

১১. তোমরা এখন এমন যুগে যখন যে-সব আদেশ-নির্দেশ তোমাদের দেওয়া হয়েছে তার দশ ভাগের এক ভাগ ত্যাগ করলে তোমরা ধ্বংস হবে; কিন্তু এমন যুগ আসবে, যখন এই সব আদেশ-নির্দেশের দশ ভাগের এক ভাগ পালন করলে তোমরা মুক্তি পাবে। —হাদিস

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর, অর্থাৎ সত্য ও কল্যাণের, অনুগত হওয়া, আর সেইজন্য জগতের বন্ধু হওয়া,[১২] তিনি নিঃসংশয়ে বুঝবেন'— ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি কাণ্ডজ্ঞান ও মানবহিত।

১৯৪৮

সংস্কৃতির কথা

মনে হয় মানুষ স্বভাবত পৌত্তলিক : কোনো বিশেষ প্রতিমা বিশেষ তত্ত্ব বিশেষ আচার বা বিশেষ ধরন-ধারণ— এ না হলে যেন তার চলতে চায় না। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে সে পরিবর্তন প্রিয়—তার প্রতিমা তত্ত্ব আচার বা ধরন-ধারণ ক্রমাগত বদলায়।

সংস্কৃতি কথাটা ইয়োরোপে প্রবল হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে নানা ধরনের বিপ্লব দেখা দেয়—ভাব-বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লব, রাষ্ট্রিক বিপ্লব, সবই। সেই বিপ্লবের পরে উনবিংশ শতাব্দীতে আসে নূতন সংগঠনের কাল। সেই দিনে অতীতের ধর্মের স্থান দখল করে সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি বলতে বোঝা হয় এক বিশেষ সমন্বয়— খ্রিস্টান অখ্রিস্টান সমস্ত রকমের জ্ঞান ও উৎকর্ষ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়—অতীতের শ্রেষ্ঠ ভাব-সম্পদের সমাহার। প্রথমে এর প্রবণতা হয় ব্যক্তিতান্ত্রিকতার দিকে— ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষই হয় এর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ইয়োরোপে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন অনেক বেশি সক্রিয়, তাই অচিরেই এই ব্যক্তিতান্ত্রিকতার মোড় ফেলে সামাজিকতার দিকে।

ভারতবর্ষ চিন্তার দিক দিয়ে ইয়োরোপের অন্তত পঞ্চাশ বৎসর পেছনে পড়ে রয়েছে; ইয়োরোপের উনবিংশ শতাব্দীর ঢেউ ভারতবর্ষে যে এসে লাগবে বিংশ শতাব্দীতে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সংস্কৃতির ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রবণতা আমাদের দেশে দুই চার বছর আগেও প্রবল ছিলো। ভদ্রলোক হওয়া বা একটি ভদ্র পরিবার গড়ে তোলা এইই ছিলো আমাদের দেশের শিক্ষিতদের লক্ষ্য। দেশে যে গণতান্ত্রিক শাসন নীতি প্রবর্তিত হয়েছে আর সাম্প্রদায়িক বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে তার ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনায় সমাজবোধ একটা বড় জায়গা দখল করতে চাচ্ছে।

ভারতবর্ষের একালের সংস্কৃতিক চিন্তার ইতিহাসে দুই জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— একজন বঙ্কিমচন্দ্র অপরজন পাঞ্জাবের ইকবাল। এঁদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর

---

১২. জগত আল্লাহর পরিবার। সে-ই আল্লাহর কাছে ভাল যে তাঁর পরিবারের প্রতি ভাল। হাদিস সে আল্লাহতে বিশ্বাসী নয়, সে আল্লাহতে বিশ্বাসী নয়, সে আল্লাহতে বিশ্বাসী নয় যার আঘাত থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। -হাদিস।

www.nagorikpathagar.org

চিন্তাশীলের জন্ম একালের ভারতবর্ষে হয়েছে, কিন্তু চিন্তা নায়ক হিসাবে এঁদের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আর কেউ পারেন নি। এঁরা দুজনেই চেয়েছেন প্রাচীন ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দিতে, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী রাষ্ট্রজীবন গঠন বলতে যা বোঝায় তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত এঁদের বাণীতে রয়েছে। মানুষ একই সঙ্গে স্থিতিশীল ও গতিশীল, আমাদের দেশের লোক স্থিতিশীল কিছু বেশি— জীবনে নূতন নূতন পরীক্ষা করবার সুযোগ তাদের জন্য সংকীর্ণ, বোধ হয় মুখ্যত এই কারণে। বঙ্কিমচন্দ্র ও ইকবালের চিন্তায় সনাতন স্থিতিশীলতার সঙ্গে কিছু গতিশীলতা যে মিশেছে, এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁদের জনপ্রিয়তার রহস্য। স্থিতিশীলতার আর গতিশীলতার এই যে অদ্ভুত মিশ্রণ আমাদের দেশের চিন্তায় ঘটেছে আমাদের একালের সংস্কৃতিগত চিন্তায় এই একটি গোড়ার কথা। কিন্তু সুচিন্তার কাজ হচ্ছে চিন্তায় গ্রন্থির জটিলতা ঘুচিয়ে তাকে ঋজু করা—জীবনে কার্যকরী করা।

আমাদের জীবনে নূতন নূতন পরীক্ষার সুযোগ সংকীর্ণ-বিচিত্র ও দূরপ্রসারী ব্যাপারটির প্রভাব। এর ফলে যেমন কঠিন আমাদের পক্ষে মাত্রাজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া তেমনি দুর্নিবার আমাদের জন্য চরমপন্থিত্বের আকর্ষণ : যে চিন্তার লক্ষ্য দীর্ঘাভিসারী কর্ম-পন্থা আমাদের কৌতূহল সহজেই তা থেকে হয় প্রতিনিবৃত্ত, আর যে চিন্তা আমাদের জন্য এনে দেয় ভাবোন্মত্ততা সহজেই আমাদের মন হয় তার দ্বারা বন্দী। এই প্রতিকূল পরিবেশ আর অব্যবস্থিত চিত্ত বেশ বড় রকমের দুর্ঘটনা এসব আমাদের জীবনে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিতান্ত্রিকতা যে দুর্বল চিন্তা তা বোঝা কঠিন নয়। মানুষ বিশেষভাবে সামাজিক জীব। কাজেই যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উৎকর্ষের সামাজিক মূল্য কম তা যত সুদর্শনই হোক শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত ভিন্ন আর কিছু নয়। অবশ্য একথা সত্য যে এক যুগে যার সামাজিক মূল্য কম অন্য যুগে তার সামাজিক মূল্য বেশি হতে পারে। কিন্তু এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে স্বভাবতই যার সামাজিক মূল্য কম। মানুষের ইতিহাস বিচিত্র—বিচিত্রভাবের মধ্যে দিয়ে তার অভিব্যক্তি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই যেসব চিন্তা প্রকৃতপক্ষে জনহিতকর নয়, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠির বা দলের চেতন বা অবচেতন স্বার্থবোধের অনুকূলের মাত্র, অথবা ক্ষণিক খেয়াল, সে সবের দিকেও মাঝে মাঝে নেতৃস্থানীয়দের প্রবণতা জন্মেছে।

সেকালের ধর্মের মতো একালের সংস্কৃতিরও মূল কথা হওয়া চাই সামাজিক উৎকর্ষ লাভ আর যেহেতু সমাজের অর্থ একদিকে বিশ্বমানব— সমাজ উৎকর্ষ বিশেষ বিশেষ দেশগত বা রাষ্ট্রগত সমাজ, সেজন্যে সংস্কৃতিও মূলত বিশ্বসামাজিক ও রাষ্ট্রিক। অন্য কথায়, যে চিন্তা জগতের অনেকের মনে অনুরণন জাগায় না এবং যার রাষ্ট্রিক সার্থকতা কম তা বাস্তবিকই স্বল্পমূল্য বা মূল্যহীন— হোক না তা অন্যভাবে যত অসাধারণ।

এই দিক দিয়ে দেখলে হিন্দু সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতি সেমীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি কথা যে দেশে উঠেছে সে-সবের মূলে সুচিন্তা যে তেমন কার্যকরী হচ্ছে না তা সহজেই বোঝা যায়। যদি হিন্দু ও মুসলমানের রাষ্ট্রিক জীবন সম্মিলিত হয় তবে তাদের সাংস্কৃতিক জীবন

www.nagorikpathagar.org

ভিন্ন হতে পারে না, অন্তত সে-বিভিন্নতা অগ্রগণ্য হতে পারে না— হলে সংস্কৃতি একটি প্রধান লক্ষ্য সামাজিক অর্থাৎ রাষ্ট্রিক উৎকর্ষ লাভ তাই হয় ব্যাহত। হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলিম-সংস্কৃতি এসব চিন্তা কিছু পরিমাণে কার্যকরী হতেও পারে যদি হিন্দু ও মুসলমানের রাষ্ট্রিক জীবন স্বতন্ত্র হয়। কিন্তু যাঁরা হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলিম-সংস্কৃতি ইত্যাদি কথা বলেছেন তাঁরা ভারতবর্ষের অথবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা তেমন ভাবছেন তা মনে হয় না।

সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ্বজনীনতার কথা তোলা হয়েছে। চিন্তা চিরদিনই বিশ্বজনীন। আর একালে চিন্তার বিশ্বজনীনতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশের মানুষ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছে বলে'। এই চিন্তার ক্ষেত্রে নূতন নূতন সম্ভাবনার কথা আজ মানুষ জ্ঞাতসারে মনে স্থান দিচ্ছে, ফলে প্রাচীন চিন্তাধারা তার চিত্তকে আর বন্দী করে রাখতে পারছে না– যেসব দেশে প্রাচীন ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশি সে-সব দেশেও নয়। কাজেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীন চিন্তার দোহাই একালে বাস্তবিকই অচল। সংস্কৃতি মানুষের সৌখীন পোষাক—পরিচ্ছদ নয়, তা তার জীবন-যুদ্ধের অস্ত্র—আর অস্ত্রের প্রাচীনতাই তার গৌরবের বিষয় নয়।

আমাদের দেশের একশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই ব্যাপারের দিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকান। আমাদের বর্তমান শক্তিহীনতার কথা তাঁরা বোঝেন, আর বুঝে তাঁরা এই ভাবেন যে এ অবস্থায় 'আক্রমণে'র চাইতে 'প্রতিরোধে'র মনোভাব বরণ করাই আমাদের জন্য প্রশস্ত। এই প্রতিরোধ মুখ্যত তাঁদের জন্য কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন। কূর্ম যেমন বিপদ-কালে নিজেকে গুটিয়ে নেয় তার আবরণের মধ্যে এঁরাও তেমনি আত্মরক্ষার প্রয়াসী হন দেশের বা সমাজের সনাতন ভাবধারার আশ্রয়ে। কিন্তু এই চিন্তাধারা খুবই দুর্বল। কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করে' বিশেষ বিশেষ প্রাচীন সম্প্রদায় জগতের নানা স্থানে আজো টিকে আছে, কিন্তু তারা নাম পেয়েছে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় অথবা বর্বর সম্প্রদায়। জগতে বাস্তবিকই তারা পিছিয়ে পড়েছে। সাবধানতা সাধারণত একটি সদগুণ, কিন্তু তা যদি হয় পরাজয়-স্বীকৃতির অন্য নাম তবে তার চাইতে দোষার্হ আর কিছু নেই।

"বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি" সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে গিয়ে আমাদের এই ভূমিকার অবতারণা করতে হলো। বাংলার মুসলমানের উৎপত্তির কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।[১৩] তাতে দেখেছি, বৌদ্ধ, হিন্দু, পাঠান আর আরব ইত্যাদি বিচিত্র উপাদানে এই সমাজ গঠিত। কিছুদিন পূর্বেও এই সমাজে দুইটি শ্রেণী ছিল : একটি সম্ভ্রান্ত "আশরাফ", অপরটি সাধারণ "আতরাফ", এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান প্রায় ছিল না বললেই চলে— কতকটা হিন্দুর জাতিভেদের মতো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমনি বিচিত্র সমাজ ও মত ভারতবর্ষের প্রশস্ত বুকে স্থান লাভ করেছে। ক্ষুদ্র সংহতি জীবনই মুখ্যত তাদের উপজীব্য হয়েছে, বৃহত্তর দেশ সম্বন্ধে চেতনা কদাচিৎ

---

১৩. দ্রঃ 'বাংলার মুসলমানের কথা'

www.nagorikpathagar.org

অনুভূত হয়েছে। এই যে এক ধরনের "যত মত তত পথ" অথবা "যত পথ তত মত" তত্ত্বের সূত্রে ভারতবর্ষের লোকদের জীবন গ্রথিত হয়েছিল তাতে কিছু শান্তি হয়ত ভারতীয় সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; কিন্তু যার অভাব ঘটেছিল তার নাম সচেতনতা। হাজার বৎসর পূর্বে আলবেরুনী এটি লক্ষ্য করেছিলেন, আর আজো এটি কম লক্ষ্যযোগ্য নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা সম্বন্ধে আমাদের একালের অনেক চিন্তাশীলের এই যে এক সিদ্ধান্ত যে অনন্ত বৈচিত্র্যের ভিতরে একত্বের সন্ধান করতে হবে, এটি আংশিক ভাবেই গ্রহণযোগ্য। সত্য শুধু মানস ব্যাপার নয়, বিশেষভাবে সামাজিক ব্যাপার; বৈচিত্র্য কম হোক আর বেশি হোক তার ভিতরকার একত্ব হওয়া চাই সুদৃঢ়— সামাজিক অর্থে; আর ততখানি বৈচিত্র্যই স্বীকার্য যা এই সুদৃঢ় একত্বের অনুকূলে। ফলের প্রাচুর্যে ডাল যদি ভেঙ্গে পড়ে তবে তা ফল ও ডাল দুইয়েরই জন্য হয় অসার্থক।

বাংলায় মুসলমানের আবির্ভাব হয়েছে অন্তত সাত শতাব্দী পূর্বে। কিন্তু তার এই দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস অতি সামান্যই আমরা জানি। যেটুকু জানি তাতে বলা যায়, তার "সম্ভ্রান্ত" ও "সাধারণ" শ্রেণীর মধ্যে দুই বিভিন্ন ইসলামী সংস্কৃতি বলতে যা বোঝা যায় তার, আর যাঁরা "সাধারণ" তাঁদের জীবন সাধারণত চলতো তাঁদের পূর্বপুরুষদের ধারায়।[১৪] অবশ্য দেশের সমস্ত সমাজের মোটের উপর সন্তুষ্ট ছিল তাদের ভাগ্য নিয়ে। এমনিভাবে দীর্ঘকাল কাটবার পরে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলায়, লাভ হলো ইয়োরোপের স্পর্শ। এই স্পর্শে প্রথমে দেশের যা ফল লাভ হলো এক হিসাবে তা বহুমূল্য, কেননা হিন্দু-মুসলমান দেশের সব সমাজেই আত্ম-অন্বেষণ সক্রিয় হলো এবং দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেক মহিমাময় ব্যক্তির আবির্ভাব হলো।

কিন্তু অচিরেই দেশের মনোভাব পরিবর্তন ঘটলো। দেশ মুগ্ধ হয়েছিল ইয়োরোপের ভাবুক-রূপের দ্বারা। কিন্তু ইয়োরোপের প্রভুরূপের সঙ্গে পরিচিত হতে তার দেরী হলো না এবং তার ফলে তার ইয়োরোপের পূজা রূপান্তরিত হলো ইয়োরোপ-বিদ্বেষে বা ইয়োরোপ-ভীতিতে। এই ইয়োরোপ-বিদ্বেষ বা ভীতির সঙ্গে দেশের একালের রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধ। সুতরাং আমাদের একালের সাংস্কৃতিক চিন্তারও গভীর যোগ এই বিদ্বেষ বা ভীতির সঙ্গে।

আত্মরক্ষার জন্য কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বনের উল্লেখ আমরা করেছি। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সাংস্কৃতিক চেতনা বলতে মোটের উপর বোঝেন এই কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন—বিপন্ন কূর্মের মতো অক্ষম আক্রোশ হয়ত তাঁদেরও এই চেষ্টার আনুষঙ্গিক। কিন্তু যাঁরা প্রধানত বিদ্বেষপরায়ণ বা ভীত তাঁদের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বে গ্লানি পৌঁছেছে—সুচিন্তা, অর্থাৎ কল্যাণপ্রসূ চিন্তা, সেই অবস্থায় আর তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতির মতো গুরু বিষয়ের আলাপ আলোচনা না করাই হয়ত শোভন। কিন্তু তাঁদের আত্মীয়স্থানীয় অপর একটি দল আছেন, তাঁরা সময় সময় চিন্তাশীল বলে' আদৃত হন। তাঁরা বলতে চান : চিন্তা উচ্চাঙ্গের অথবা সারগর্ভ হলেই জনসাধারণের

---

১৪. দ্রঃ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ: প্রথম বক্তৃতা

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণযোগ্য হয় না, গ্রহণযোগ্য হয় তাদের অভ্যস্ত ভাবধারার অনুকূল হলে; এতকাল এদেশের লোকে বিভিন্ন সমাজে ও ধর্মে বিভক্ত হয়ে জীবন অতিবাহিত করে এসেছে, আজ যদি তাদের— তা যে প্রয়োজনেই হোক— বলা হয় যে তাদের সেই ভাবধারা তাদের জন্য আর কল্যাণপ্রসূ নয়, তবে তাদের বিহ্বল ও বিভ্রান্তই করা হবে বেশি, তাদের পথের নির্দেশ দেওয়া হবে মনে হয় না। এই শ্রেণীর ভাবুকদের বড় ক্রটি এইখানে যে যে-চিন্তাকে তাঁরা জনসাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য জ্ঞান করেন সেটি— অথবা অন্য কোন চিন্তাধারা— তাদের নিজেদের সহজবোধ্য হয়েছে কিনা সে জিজ্ঞাসার' সম্মুখীন হন তারা কদাচিৎ। অথচ কে না জানে যে সার্থক প্রচার আমাদের দ্বারা তখনই সম্ভবপর যখন কোনো মত বা পথ আমরা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছি। মানুষের নব নব ইতিহাস নিয়তই রচিত হচ্ছে, আর রচিত হচ্ছে তাঁদের দ্বারা নয় যাঁরা বুদ্ধিমান কিন্তু দ্বিধান্বিত, পরন্তু তাঁদের সত্য ও কল্যাণকে বুঝবার চেষ্টায় যাঁদের ক্রটি নেই সঙ্গে সঙ্গে যা তাঁরা সত্য ও কল্যাণকর বলে বুঝেছেন তাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। সংস্কৃতির একটি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে সুন্দরের সাধনা। যাঁদের ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রবণতা বেশি তাঁদেরও এই সংজ্ঞা হয়ত মনঃপূত হবে। কিন্তু সুন্দর তো শুধু মোহকর নয়, সুন্দর বিশেষভাবে সত্যাশ্রয়ী— জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তার যোগ যেমন দৃঢ় তেমনি তার গতি সার্থকতা লাভের দিকে। সত্যাশ্রয়িতা, অর্থাৎ সত্য উপলব্ধির চেষ্টা আর সার্থক হবার আকাঙ্ক্ষা, যাঁদের অন্তরের ধর্ম নয় তাঁরা জ্ঞানীও নন কর্মীও নন।

এই সত্যাশ্রয়িতার দৃষ্টিভূমি থেকে যদি আমরা বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতির দিকে তাকাই তাহলে কি দেখব? দেখব— নানা দৈন্যে বাংলার মুসলমান জর্জরিত, আর্থিক দৈন্য তার যত তার চাইতে অনেক বড় তার ভাবে দৈন্য, সঙ্কল্পের দৈন্য। মুসলমান হিসাবে প্রতিমা পূজায় আপত্তি জানিয়ে সে প্রকৃত জীবন অনেকখানি অস্বীকার করেছে; কিন্তু জীবনে বড় কথা 'অস্বীকার করা' নয় বরং বড় কথা হচ্ছে 'স্বীকার করা'— মুসলমানের স্বীকার করা উচিত ছিল সজাগ-মানব-জীবন অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমের জীবন ইসলামের অর্থ কেবল তাই হতে পারে। কিন্তু তেমন করে স্বীকার সে কিছুই করতে পারে নি— যা স্বীকার করেছে অথবা করতে চেয়েছে তা তুচ্ছ আচার-পূজা ভিন্ন আর কিছু নয়।

তা অতীত যা-ই হোক তার চাইতে বড় কথা বর্তমানের প্রয়োজন। সেই বর্তমানে তার অজ্ঞান ও অভাবাত্মক মনোভাব দূর হোক, সে স্বীকার করুক ভাবাত্মক মনোভাব জাগ্রত আদর্শ। যে-জ্ঞান-ও-প্রেমের জীবন তার স্বীকার করা উচিত ছিল সৌভাগ্যক্রমে তা শুধু আজ তারই স্বীকার্য নয়, জগতের সবারই স্বীকার্য, জগতের বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন সমাজের মানুষের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে বলে। সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে বৈশিষ্ট্য ও বিরোধ আজ প্রধানত অতীতের কথা। আজ বড় কথা সে সবের প্রাণশক্তির সন্ধান যা থেকে সম্ভবপর হবে জাতিতে জাতিতে অথবা সমাজে সমাজে গাঢ়তর সহযোগিতা ও মঙ্গলতর ভবিষ্যৎ। মানুষের বিচিত্র সংস্কৃতির সেই প্রাণশক্তি আজ চিন্তার ক্ষেত্রে নাম পেয়েছে বৈজ্ঞানিকতা ও মানবহিত আর কর্মের ক্ষেত্রে নাম পেয়েছে সুব্যবস্থিত রাষ্ট্র-জীবন। একালে বাংলার মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনও প্রতিষ্ঠিত হবে সেই বৈজ্ঞানিক মানব-হিত ও সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রের ভিত্তির উপরেই।

www.nagorikpathagar.org

দেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের কথা এ ক্ষেত্রে সহজেই ওঠে। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যাঁরা বলছেন, হিন্দু-মুসলমানের পৃথক রাষ্ট্র-জীবন ভিন্ন এর সমাধান নেই তাঁদের কথা বোঝা যাচ্ছে না এই কারণে যে রাষ্ট্র জীবনের অর্থ হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রভূত ক্ষমতা সমন্বিত সংহতি জীবন, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো ভৌগোলিক অবস্থানের দেশে সেই ক্ষমতা সমস্ত দেশের পক্ষে লাভ হওয়াই সম্ভবপর মনে হয়, প্রদেশ-বিশেষের বা অংশবিশেষের জন্য তা একান্তই দুঃসাধ্য। আমরা যতটা ভাবতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে ভারতবর্ষের অথবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যদি নিজেদের কোনো রকমের সত্যকার উন্নতি চায় তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই, এবং এই জন্যই তাদের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা সুসঙ্গত হওয়া চাই তাদের জীবনের এই এক শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনের সঙ্গে। বলা বাহুল্য এই সম্মিলন বৈচিত্র্য-হীন হতেই পারে না— কিন্তু বৈচিত্র্য যেন কদাচ বিপন্ন না করে একত্বকে। আজকার বিবর্দ্ধিত বিরোধের দিনে এই চিন্তাধারা কারো কারো মনে হতে পারে অবাস্তব। এই 'বাস্তব' বাদীদের সৃষ্টি এই কঠিন বাস্তবতার দিকে আকৃষ্ট করেছে তাতে শক্তিতে শক্তিতে বোঝাবুঝির পরিচয় নেই আদৌ, আছে দুর্দৈব ও দুর্বুদ্ধির পরিচয় মাত্র। অবশ্য রোগভোগ দীর্ঘদিন ধরে' চললে তাকেই সময় সময় ভ্রম হয় স্বাভাবিক অবস্থা বলে। কিন্তু রোগ রোগই— তা কদাচ স্বাস্থ্য নয়।

হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবন ভিন্ন আর কিছু যদি এদেশে সম্ভবপর না হয় তবে হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলমান-সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতি সেমীয়-সংস্কৃতি এসব কথা হয়ে পড়ে দায়িত্বহীন, এবং এসবের প্রচলন আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে যত কম হয় ততই মঙ্গল—ততই চিন্তার সৌখিনতা আমাদের ঘুচবে আর আমরা সত্যাশ্রয়ী হব। সার্থক সমাজ সত্তার দিক দিয়ে বাংলার মুসলমান অথবা হিন্দু বাংলার অথবা বিশাল ভারতবর্ষের অংশ ভিন্ন যখন আর কিছু নয় তখন তার সাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা লাভের পথ এই বিশাল সত্তার সঙ্গে তার গূঢ় যোগ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই—ঝরণার সার্থকতা যেমন নদীর পুষ্টিসাধন করে'—এ সত্য যত অকপটভাবে স্বীকার করা যাবে ততই শক্তি ও শ্রী লাভের পথে আমরা অগ্রসর হব।

আজকার অসার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তর থেকে সার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তরে উপনীত হতে হলে যে সব ধাপ আমাদের অতিক্রম করতে হবে তার কিছু নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে এইভাবে :

(১) দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না।

(২) একান্ত বীভৎস না হলে কোনো সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে যে—যা প্রাচীন তা প্রাচীন বলেই বরণীয় নয়, বরণীয় তার বর্তমান কার্যকারিতার জন্য।

(৩) হিন্দু-মুসলমানের পোষাক ও নামের ব্যবধান থাকবে না অথবা অস্বীকার করা হবে।

www.nagorikpathagar.org

(৪) সামাজিক আদান-প্রদান-বিবাহ-আদি সমেত-সর্বত্র সহজ হবে।
(৫) আইন সমস্ত দেশের জন্য এক হবে।

১৩৪৮

কোরআনের আল্লাহ্

বিষয়টি বিরাট। বিজ্ঞেরা জানেন এটি কোরআন-তত্ত্বের গোড়ার কথা; উৎকট অদৃষ্ট-বাদ, মোতাজেলা যুক্তি-বাদ, সুফীর অন্তর্জ্যোতি-বাদ, ইত্যাদি মুসলিম দার্শনিক মতামতের উৎপত্তি-কেন্দ্রও প্রায় এইটি। কিন্তু এসব জটিল ব্যাপার ত্যাগ করে' আমরা বরং দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাচ্ছি মানুষের প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার দিকে। মানুষের সেই প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে কোরআন-বর্ণিত আল্লাহ্‌র কি যোগ?

কোরআনের পাঠকদের সহজেই চোখে পড়ে আল্লাহর স্বরূপ-নির্দেশ সম্পর্কে বাগবিস্তারে কোরআনের আপত্তি। কোরআনের এই ধরনের যে সব উক্তি— মানুষকে জ্ঞান সামান্যই দেয়া হয়েছে (১৭:৮৫), আল্লাহ মানুষকে যেটুকু জানান তার বেশি তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করবার শক্তি মানুষের নেই (২:২৫৫) —এ সব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, আল্লাহর স্বরূপ—জিজ্ঞাসা কোরআনের অনভিপ্রেত। অথচ কোরআনে যদি কোনো একটি ব্যাপার অত্যুগ্র হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে আল্লাহর কথা— আল্লাহর মহিমার অন্ত নেই, করুণার অন্ত নেই, চিরজাগ্রত তিনি, অন্যায়ের কঠোর শাস্তিদাতা তিনি— এ-সব কথা বারংবার কোরআনে উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভালমন্দের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, এ বিষয়ে কোরআন নিঃসন্দেহ— যেমন নিঃসন্দেহ, তিনি দুর্জ্ঞেয়, সে-সম্বন্ধে।

আর শুধু কোরআন নয়, জগতের অন্যান্য বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ ও জগতের অনেক মনীষীও 'আল্লাহ' সম্বন্ধে এই মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন—আল্লাহ্ যে স্বরূপত দুর্জ্ঞেয় অথচ এই দুর্জ্ঞেয় আল্লাহ্‌র সঙ্গেই মানুষের প্রতিদিনের জীবন নিবিড়ভাবে যুক্ত এ সব তাঁদের অন্তরতম কথা।

কিন্তু প্রশ্ন এই দাড়ায় : যাঁকে জানা যায় না অথবা অতি সামান্যই জানা যায় তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবলম্বন হবেন কেমন করে? এই কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই যোগী সুফী প্রভৃতি রহস্যবাদীরা অবলম্বন করেছেন কৃচ্ছ্রসাধনা, কল্পনাকুশলীরা প্রশ্রয় দিয়েছেন প্রতীক-চর্চা, আর সমাজ-শৃংখলা-বাদীরা জোর দিয়েছেন বিধি-নিষেধ পালনের উপরে।

এর কোন্‌টির কি মূল্য সে-সব তর্কও আপাতত আমাদের পরিত্যাজ্য; আমরা তাকাতে চাচ্ছি কোরআনের একটি বিশেষ উক্তির দিকে: সব চাইতে ভাল ভাল নাম

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর (৭:১৮০)। অন্য কথায়, কোরআনের মতে, সব চাইতে শ্রেষ্ঠগুণসমূহে আল্লাহ বিভূষিত; আর কোরআন নির্দেশ দিচ্ছেন এই সব শ্রেষ্ঠ নামে তাঁকে ডাকতে, অর্থাৎ তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ স্মরণে রাখতে। বলা বাহুল্য এই থেকেই ধর্মভীরু মুসলমানের তসবীহ্ পাঠ। কিন্তু আল্লাহর এই সব শ্রেষ্ঠ গুণ স্মরণ করার প্রকৃত অর্থ কি, তার নির্দেশ রয়েছে হজরতের এই বিখ্যাত বাণীতে : আল্লাহর গুণাবলীতে ভূষিত হও, —অর্থাৎ আল্লাহ বলতে যেসব শ্রেষ্ঠ গুণ তোমার চিন্তায় আসে সে-সব নিজের ভিতরে সৃষ্টি কর। কোরআনে মানুষকে বলা হয়েছে জগতে আল্লাহর প্রতিনিধি, সূর্য্য চন্দ্র দিবস রজনী এ সব প্রাকৃত ব্যাপারও মানুষের অধীন (১৪:৩৩) নিশ্চয় সেখানে সেই মানুষের কথা বলা হয়েছে যে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ যে বহু সদগুণসমন্বিত শক্তিমান ব্যক্তি।

ধর্মভীরু মুসলমানেরা প্রতিদিন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নাম বা গুণসমূহ স্মরণ করেন। তাঁরা তাঁকে ৯৯ নামে ডাকেন, যেমন, তিনি করুণাময়, মহিমাময়, সুন্দর, কঠোর শাস্তি দাতা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য তাঁর শ্রেষ্ঠ নামের শেষ নেই (৫:২৩)। কিন্তু এই স্মরণ করার অর্থ যে শুধু মুখে উচ্চারণ করা নয়, মন দিয়ে উপলব্ধি করা ও চরিত্রে এ-সবের প্রভাব ফুটিয়ে তোলা, সেই বড় কাজটাই চাপা পড়ে গেছে। ফলে আল্লাহর এই শ্রেষ্ঠ নামসমূহ স্মরণ ও শুষ্ক আদেশ-পালনের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু চিন্তা করলে বোঝা যাবে কোরআনের এই যে বাণী ও হজরতের এই যে নির্দেশ এর মধ্যে এমন একটি ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যা উপলব্ধি করতে পারলে দুর্জ্ঞেয় আল্লাহর সঙ্গে আমাদের এমন একটি যোগ স্থাপিত হয় যাতে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে শক্তি-সঞ্চার হয়—আমাদের জানার আকাঙ্ক্ষা খানিকটা তৃপ্ত হয়, আমাদের অনুভূতিকেও খানিকটা সজীব করে' তোলা হয়।

দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। ধরুন—আল্লাহকে বলা হয়েছে সুন্দর সেই ব্যাপারটি। আল্লাহ স্বরূপত কি, তা কে বলবে? কিন্তু তিনি সুন্দরের চরম— এই কথা ভাবতে তাঁর ভাবনা একটা অবলম্বনযোগ্য আদর্শের মতো আমার মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। সেই আদর্শ মনোগত, বস্তুগত নয়, কাজেই সেটির উৎকর্ষ হচ্ছে আমার বুদ্ধি বিবেচনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। আর সব চাইতে বড় কথা এই যে এটি আমার সৌখীন কল্পনা নয়, এটিকে আমি অবলম্বন করেছি আমার জীবনের লক্ষ্য হিসাবে— আল্লাহ পরম সুন্দর এই ভাবনা আমার ভিতরে দিন দিন এনে দিচ্ছে আমার নিজের সমস্ত কাজে ও চিন্তায় সুন্দর হবার তাগিদ। তেমনি ধরুন—তাঁর করুণাময় নাম। তাঁকে করুণার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে বুঝে আমি চেষ্টা করছি সেই করুণার ভাব আমার মধ্যে সঞ্জীবিত করে' তুলতে। এমনিভাবে বোঝা যেতে পারে তাঁর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নাম ও আমাদের জীবনের বিকাশের উপরে সে-সবের শক্তি। আল্লাহ সম্বন্ধে এই সব ধারণায় আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতি কিছু তৃপ্ত হচ্ছে এই জন্য যে, আল্লাহ দুর্জ্ঞেয় এই কথা বলে' আমরা হৃদয় ও মনে সমস্ত দাবিতে স্তব্ধ করে দিতে চেষ্টা করছি না, বরং আমরা আবিষ্কার করেছি এই দুয়ের চরিতার্থতার একটি পথ— আল্লাহ বলতে আমরা বুঝছি জীবনের এক অন্তহীন অগ্রগতির

www.nagorikpathagar.org

তাগিদ, সেই তাগিদে ও চলার পথের বিচিত্র সৌন্দর্যে আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুইই সচেতন ও আনন্দিত।

আল্লাহকে যদি এইভাবে শ্রেষ্ঠ গুণের সমষ্টি বোঝা যায়, তবে আল্লাহ বাস্তবিকই আমাদের আকর্ষণ-স্থল হয়ে দাঁড়ান—আমাদের বহু ব্যর্থতাময় দৈনন্দিন জীবনে তিনি হয়ে ওঠেন গভীরভাবে অর্থপূর্ণ। তখন মুসলমানেরা এই যে প্রতিদিনের বহুবারের প্রার্থনা—আমাদের সোজা পথে চালাও— সেটি প্রার্থনাকারীর হৃদয়-মনকে সত্যকারভাবে উদবোধিত করে, কেননা সোজা পথ বলতে কি বোঝা হচ্ছে, গতি হয়েছে আমাদের কোন দিকে, সে-বিষয়ে অনেক কথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। জীবনের অর্থ এইভাবে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে উঠলে ধর্মের বিধি-বিধানের তাৎপর্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে; তখন বুঝতে দেরী হয় না যে, ধর্মের বিধি-নিষেধ কোনো নিষ্ঠুর প্রভুর কষ্টদায়ক হুকুম নয়, বরং সে-সব হচ্ছে জীবনকে উন্নতির দিকে পরিচালনার নিয়মশৃঙ্খলা— নদীর ধারাকে পরিচালনা করার জন্য যেমন তার দুই তীর। তখন আরো বোঝা যায়, তাই ধর্ম যা জীবনের বিকাশের সহায়ক আর তাই অধর্ম যা তেমন সাহায্য করে না, যেমন তাই খাদ্য যা বল দেয়, তা খাদ্য নয় যা বল দেয় না। সুবিজ্ঞ বিচারক যেমন বিচিত্র ও জটিল আইনের মধ্যে দেখেন জীবনের প্রয়োজন ও সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখে তার সুব্যাখ্যার চেষ্টা করেন, কখনো কখনো করেন নূতন ক্ষেত্রে তার নূতন প্রয়োগ, আল্লাহর অভিমুখে যাত্রীও ধর্মের মর্মের সন্ধান পান ও জীবনের প্রয়োজনে নূতন নূতন ক্ষেত্রে তার নূতন নূতন প্রয়োগ ও পরীক্ষা করে চলেন।

পরম দুর্জ্ঞেয় আল্লাহকে কোরআন যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমন ব্যবহারযোগ্য করেছেন এ মানুষের এক বড় লাভ।

১৩৪৯

ইকবাল

ইকবালের যে প্রধান মতবাদ– আত্মতত্ত্ব বা আমিত্ব-তত্ত্ব– তার বিবৃতি পাওয়া যাবে তাঁর আসরার-ই-খুদী নামক পার্সী গ্রন্থে। ডক্টর নিকলসন Secrets of the self নাম দিয়ে এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। বাংলাতেও এ গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ইকবালের জন্ম ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপে গমনের পূর্বেই তিনি উর্দু-কবি-সমাজে একজন শক্তিমান নবীন কবিরূপে আদৃত হন। কেম্ব্রিজে তিনি দর্শন অধ্যয়ন করেন ও কৃতী ছাত্ররূপে পরিগণিত হন, আর জার্মানীর ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি লাভ করেন তাঁর The Development of the Metaphysics in Persia সন্দর্ভের দ্বারা। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন প্যান-ইসলাম-বাদে দীক্ষিত হয়ে আর কবিতা রচনায় বীতস্পৃহ হয়ে। বন্ধুদের আগ্রহে তিনি পুনরায় কবিতা রচনায় মন দেন। তাঁর আসরার-ই-খুদী প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে।

www.nagorikpathagar.org

আসরার-ই-খুদী সম্পর্কে তাঁর কেম্ব্রিজের গুরু ও বন্ধু দার্শনিক Mac Taggart এর এই চিঠিখানা অর্থপূর্ণ :

> তোমার কবিতাগুলো (Secrets of the Self) পড়ে বড় খুশী হচ্ছি, সে কথা জানাবার জন্য এই চিঠি লিখছি। তোমার চিন্তাধারা আগের তুলনায় অনেক বদলে যায়নি কি? সেদিনে আমরা দুজনে যখন একত্রে দর্শন আলোচনা করতাম তখন তুমি অনেক বেশি মরমিয়া ও সর্বব্রহ্ম, বাদী (Pantheist) ছিলে। আমি নিজে বলবৎ আছি আমার পূর্বের প্রত্যয়ে যে ব্যক্তিসত্তা-সমূহ (Selves) হচ্ছে চরম সত্তা (ultimate reality), তাদের প্রকৃত অর্থ ও সার্থকতা বোঝা যাবে অনন্তকালে (পূর্বেও আমার এ ধারণা ছিল।) কালক্রমে নয়, এবং কর্মে তত নয় যত প্রেমে। হয়ত আমাদের এই পার্থক্য বেশির ভাগ মাত্রাগত—আমাদের বিভিন্ন দেশের কি কি প্রয়োজন সেইটি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের প্রধান ভাবনার বিষয়। তুমি ঠিকই বলেছ যে ভারতবর্ষ বড় বেশি ধ্যানী। কিন্তু ইংল্যান্ড—ও ইয়োরোপ—যে যথেষ্ট ধ্যানী নয় সে—বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই শিক্ষা তোমাদের কাছ থেকে আমাদের নেবার আছে, আমাদের কাছ থেকেও যে তোমাদের কিছু শিখিবার আছে তাতে ভুল নেই।[১৫]

মরমী-বাদ ও সর্বব্রহ্ম-বাদ থেকে ব্যক্তিত্ব-বাদে, অর্থাৎ চরম সত্তায় বা ভগবানে বা আল্লাহয় ব্যক্তিত্ব—বিসর্জন-তত্ত্ব থেকে সেই চরম সত্তার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ তত্ত্বে কেমন করে' ইকবালের পরিবর্তন ঘটলো তাঁরা কাব্যের ভিতরে তার কিছু কিছু পরিচয় থাকলেও বিস্তারিত পরিচয় নেই, তাঁর কাব্যে বিস্তারিত পরিচয় আছে তাঁর ব্যক্তিত্ব-বাদেরই। তবে বাইরের কোন কোন ঘটনার প্রভাবে (Mac Taggart এর ভাষায় তাঁর দেশের কি প্রয়োজনে) তাঁর মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটে তা বোঝা কঠিন নয়।

নবীন কবি ইকবালের অন্তরে স্বদেশানুরাগ যথেষ্ট প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল— তাঁর 'হিমালয়' 'বুদ্ধ' 'নানক' 'নূতন শিবালয়' প্রভৃতি কবিতায় রয়েছে তাঁর সেই অনুরাগের পরিচয়। কিন্তু স্বদেশের দুঃখমূর্তি তাঁর চোখে প্রকট হলো বেশি। এ সম্বন্ধে তাঁর তসবীর-ই-দর্দ (ব্যথার ছবি) নামক কবিতা (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার কয়েকটি চরণ এই :

আমার কাহিনীর এ প্রার্থনা নয় যে ধৈর্য ধরে তোমরা শুনবে।
স্তব্ধতাই আমার বাণী, ভাষাহীনতাই আমার ভাষা॥

হায় হিন্দুস্থান, তোমাকে দেখে কেবল উদ্‌গত হয় আমার অশ্রু।
সব কাহিনীর মধ্যে তোমার কাহিনী স্মরণ করায় অপরাধ॥

আকাশের আস্তিনে লুকানো রয়েছে বজ্র।
এই বাগানের বুলবুলিরা তাদের কুলায়ে নিশ্চিন্ত না থাকুক।

---

১৫. The poet of the East- by Abdullah Beg.

www.nagorikpathagar.org

তাঁর স্বদেশবাসীদের তিনি বলেন "ছিন্ন জপমালা" সেই জপমালা তিনি আবার দেখতে চান গ্রথিত; অদূরদর্শী ভারতবাসীকে তিনি বলেন সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিতে একতার পথে অগ্রসর হতে।

ইয়োরোপে গিয়ে মুসলমান দেশসমূহের দুর্দশা ও বিপদ সম্বন্ধে তিনি বেশি সচেতন হন ও স্যার আবদুল্লাহ সুহরাওয়ার্দি প্রভৃতির সঙ্গে Pan Islam Society গঠন করেন।

দেখা যাচ্ছে ভারতের দুর্দশা, আর বিশেষ করে' মুসলমান-দেশ—সমূহের বিপদ, তাঁকে পরিচালিত করেছে তাঁর আমিত্ব-তত্ত্বের পানে। একালের মুসলমান চিন্তাশীলদের মধ্যে সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানীর কাছে তিনি বিশেষভাবে ঋণী। আফগানী উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক। ধ্বংসশীল মুসলিম জগতের কানে তিনি দেন বিজ্ঞান অনুশীলনের ও রাষ্ট্রশক্তি লাভের মন্ত্র। তাঁর মন্ত্র মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম-দেশসমূহে ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু এই মনীষী প্রধানত গ্রহণ করেছিলেন রাজনৈতিক প্রচারকের ব্রত। ইকবাল আরো গভীর করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন মুসলমানের পতনের কারণ। তিনি বুঝলেন, তাদের পতনের মূলে সুফীমতের আত্মবিসর্জন ও বৈরাগ্য বাদ—সেই আত্মবিসর্জন ও বৈরাগ্য-বাদ পরিহার করে' তাদের হতে হবে আত্মবিকাশশীল ও সংসারে বরেণ্য।

এই ধরনের আত্ম-তত্ত্বের সন্ধান তিনি যে পান জার্মান দার্শনিক নীটশের কাছ থেকে একথা ডক্টর নিকলসন বলেছেন। তাঁর কথা মিথ্যা নয়। তবে নীটশের শক্তিবাদে ও ইকবালের শক্তিবাদে বড় রকমের পার্থক্যও রয়েছে। নীটশে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এবং নারী ও জনসাধারণের মূল্য ও মর্যাদায়ও অবিশ্বাসী; ইকবাল ঈশ্বরে বিশ্বাসী আর পুরোপুরি গণতান্ত্রবাদী না হলেও জনসাধারণের মহত্তর সম্ভাবনায় আস্থাবান; নারীকে তিনি নরের সমকক্ষ জ্ঞান করেন, তবে নারী-প্রকৃতির মাধুর্য ও সৌন্দর্য তাঁর শ্রদ্ধার সামগ্রী, নারীকে তিনি দেখতে চান সুগৃহিণী ও জননী রূপে।

আমাদের মনে হয়েছে ইকবালের শক্তিবাদ নীটশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও এর লালনে বিশেষ সাহায্য করেছে গ্যেটের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারা। গ্যেটের প্রতি ইকবাল যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান; তাঁর "প্রতীচ্য-প্রাচ্য-দিউয়ানে"র স্মরণে ইকবাল লিখেছেন পায়াম-ই-মশরেক (প্রাচ্যের বার্তা), তাঁর বিখ্যাত Six Lectures- এ তিনি উদ্ধৃত করেছেন গ্যেটের কবিতা। মানুষের আমিত্ব যে লালনের ও বিকাশের সামগ্রী, বিসর্জন দেবার জন্য নয়, এই মত যেমন ব্যক্ত হয়েছে গ্যেটের বহু লেখায় তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বে। এ- সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে :

(১) গ্যেটে তাঁর ছেলেবেলায় এক অভিনব পদ্ধতিতে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁর পিতা অনেক খনিজ দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন। একদিন চুপে চুপে সে-সব তিনি একখানি সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডের উপরে সাজালেন। এসব হলো প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রতীক; আর সেই খনিজ দ্রব্যের স্তূপের উপরে 'প্যাসটেল' পেন্সিল রেখে তাতে আগুন ধরালেন উদীয়মান সূর্যের দিকে আতস-কাচ ধরে—উদ্দেশ্য, এইভাবে প্যাসটেলে আগুন ধরে' যে ধূম কুন্ডলী

www.nagorikpathagar.org

পাকিয়ে উঠবে তা হবে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের উপরে মানুষের মনের স্তরের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু প্যাসটেল পেন্সিল পুড়ে নিচে কাষ্ঠখণ্ডে আগুন ধরে ও তা নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনার উপরে গ্যেটে এই মন্তব্য করেছেন :

এই ধরনের ঈশ্বরলাভের বাসনায় সর্বদা যে বিপদ বিদ্যমান এই দুর্ঘটনাকে গণ্য করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে এক সঙ্কেত ও সাবধানবাণীর তুল্য। ইকবাল বলেছেন, ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরের বিসর্জন দেবার জন্য নয় বরং পরম-ব্যক্তি ঈশ্বরের গুণ আত্মস্থ করে' বিকশিত হবার জন্য।

(২) গ্যেটে তাঁর বিখ্যাত 'নরদেবতা' (Divine) কবিতায় বলেছেন : সমস্ত প্রকৃতি অন্ধ নিয়মের দ্বারা শাসিত, কেবল মানুষের মধ্যেই আছে বিবেক, এর দ্বারা সে ভালমন্দের বিচার করে, যা মহৎ তাকে লালন করে, দেবতা বলতে যে মহিমার ধ্যান তারা করে সেই মহিমার প্রতিমূর্তি তারা হোক।

(৩) গ্যেটে নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের বিরোধী ছিলেন; তিনি বলেছেন : যাতে ভাবের মুক্তি আনে কিন্তু সেই অনুপাতে আত্মাজয় এনে দেয় না তা অনিষ্টকর। তাঁর 'ফাউসট' নাটকে শয়তানকে বলা হয়েছে অস্বীকৃতিপরায়ণ আত্মা— The sprit that denies— অর্থাৎ মানুষের বা জগতের মহৎ সম্ভাবনায় সে অবিশ্বাসী, সে শুধু পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির অধিকারী। [ইকবাল আমিত্বের সাধনায় প্রেমের স্থান দিয়েছেন বুদ্ধির উপরে।]

(৪) গ্যেটে দেখতেও ছিলেন অসাধারণ। যৌবনে তাঁকে বলা হতো Apollo আর বার্ধক্যে বলা হতো Jupiter' নেপোলিয়ন তাঁকে দেখে বলেছিলেন Voila un hómme! (একটা মানুষ বটে!)

(৫) ধর্মজীবন সম্বন্ধে গ্যেটে বলেছেন— নিজেকে শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, অবশ্য এই শ্রদ্ধা অহমিকা দুরাকাঙ্ক্ষা বর্জিত।

(৬) গ্যেটের একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি চরণ এই :

কেউ পড়তে পারেনা 'নাস্তি'তে;
অব্যয় বাস করে সবার মধ্যে।
ধন্য হও তাই সত্তায়।
সত্তা চিরন্তন, নির্ধারিত নিয়মে
রক্ষা পায় তার চিরজীবন্ত সম্পদ;
তাতেই বিশ্বের মহিমময় রূপায়ণ।

নীটশে ছিলেন জরাথুস্ত্র, সীজার, হজরত মোহাম্মদ, গ্যেটে, মিরাবো প্রভৃতির ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। হজরত মোহাম্মদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর এক সঙ্গী বলেছেন যে, তাঁর মুখের পানে তাঁরা চাইতে সাহস করতেন না। আমাদের মনে হয়েছে হজরত মোহাম্মদের যে বিখ্যাত বাণী "আল্লাহর গুণে বিভূষিত হও," আর মনসুর হাল্লাজের যে বিখ্যাত উক্তি "আ'নাল হক' (সোহহম), এ-সবের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইকবালের নীটশে গ্যেটে-অনুপ্রাণিত ও লালিত শক্তিবাদ, আর শেষে তাঁর অবলম্বন হয়েছেন হজরত মোহাম্মদ, তাঁকে তিনি বলেছেন "ইনসান-ই কামেল" পূর্ণমানুষ Superman.

www.nagorikpathagar.org

প্রাচ্যে আমিত্বকে সাধারণত ভাগ করা হয়েছে দুইভাগে— রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাষায়— "পাকা-আমি" আর "কাঁচা-আমি। কাঁচা-আমি অজ্ঞান—তাড়িত দুর্বল উদব্যস্ত 'আমি', আর পাকা—আমি ঈশ্বরে বা সত্যে সমর্পিতচিত্ত প্রশান্ত 'আমি'। সেই 'আমি' সম্পর্কে

বুদ্ধদেব বলেছেন :

তোমরা নিজেরা নিজেদের প্রদীপ হও; নিজেরা নিজেদের আশ্রয়স্থল হও;

গীতা বলেছেন :

নিমিত্ত মাত্র হও— ভগবানের হাতের যন্ত্র হও;

বাইবেল বলেছেন :

জগতের অধিস্বামী হবে সহিষ্ণুরা;

কোরআন বলেছেন :

আল্লাহতে বিশ্বাস করো ও ভাল কাজ করো.....আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে চলো;

সুফীরা বলেছেন :

মরার আগে মরে যাও।

এসবের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই ঠিক তা নয়, এসব কথা মানুষের ইতিহাসকে যে-ভাবে প্রভাবিত করেছে সেদিকে তাকালে বরং যথেষ্ট পার্থক্যই চোখে পড়ে। তবে এ-সবের মধ্যে খুব মিল এইখানে যে সর্বত্রই মানুষকে বলা হয়েছে বিক্ষুব্ধ প্রাত্যহিক জীবনের উর্দ্ধে উঠতে, আর প্রশান্তিকে জ্ঞান করা হয়েছে বিশেষ কাম্য।

ইকবালের যে 'আমি' সেটি কি প্রাচ্যের এই পরিচিত পাকা-আমি? শোনা যাক ইকবাল কি বলেন :

আমিত্বের স্বরূপ হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা;
প্রতি কণায় ঘুমিয়ে আছে আমিত্বের বীর্য।

জীবন লুকিয়ে আছে অন্বেষণে,
এর মূল নিহিত রয়েছে চাই-মন্ত্রের মধ্যে।

জ্ঞান হচ্ছে জীবন রক্ষার একটি উপায়,
জ্ঞানের কাজ আমিত্বকে শক্তিমান করা।

আমি-রূপ যে আলো-কণিকা
তা এই মাটির তলায় লুকানো স্ফুলিঙ্গ।
প্রেমের দ্বারা বর্ধিত হয় এর বায়ু—
আরো তাজা হয়, আলো জ্বলে, আরো ঝলমল করে।

ইকবালের যে 'আমি', বোঝা যাচ্ছে, তা বিকাশের তাড়নায় চঞ্চল— 'প্রশান্ত' ঠিক

www.nagorikpathagar.org

নয়। কিন্তু এই 'আমি' সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন :

এক মুঠা ধূলি দিয়ে করো সোনা তৈরি,
পূর্ণ মানুষের দ্বারের ধূলি কর চুম্বন।

ওরে বেহুশ, অনুগত হতে শেখ,
আনুগত্য থেকে জন্ম হয় কর্তৃত্বের।
যার নিজের উপরে কর্তৃত্ব নেই
তার উপরে কর্তৃত্ব করবে অন্য জন।

আল্লাহর জন্য ভিন্ন যে তলোয়ার খোলে,
সেই তলোয়ারের খাপ হয় তার বুক।

সংসারে সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি হওয়া আনন্দের,
প্রকৃতির উপরে স্বামিত্ব লাভ করা আনন্দের।

এসব থেকে, বিশেষ করে, শেষ চারিটি ছত্র থেকে, বোঝা যাচ্ছে প্রাচ্যের পরিচিত প্রশান্তি আর ইকবালের আমিত্বের মধ্যে যে পার্থক্য তা ঠিক শ্রেণীগত নয়— মাত্রাগত। প্রশান্তি, ব্রাহ্মিস্থিতি, এসব যে কর্মহীন নয় তার প্রমাণ বুদ্ধ-শিষ্যের প্রচার-ব্রত গ্রহণ, অর্জনের আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, সুফীর সৃষ্টির সেবা (খেদমতে খলক)— তবে প্রাচ্যের এই সুপরিচিত প্রশান্তির প্রবণতা— সাধারণত দাঁড়িয়েছে কর্মহীনতার দিকে, সেই দিক দিয়ে ইকবালের সদা সক্রিয় আনন্ত্য লোলুপ আমিত্বের সাধনা এ যুগের প্রাচ্যে— শুধু মুসলমান-জগতে নয়— বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ, এবং সেই দিক দিয়ে তিনি— এযুগের প্রাচ্যের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এশিয়া আফ্রিকার সব চাইতে বড় প্রয়োজন যেটি সেটি হচ্ছে তার জড়তা-বিসর্জন আর প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দরতর মহত্তর করবার আগ্রহ। এ-আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে এ কালের প্রাচ্যের বহু কর্মী ও ভাবুকের বাণীতে। সেই আগ্রহ ইকবালের কাব্যে ধারণ করেছে এক প্রবল, অগ্নিশিখার মতো মোহন, রূপ। তাই তিনি যে এ যুগের তরুণ-সমাজের আপাতত মুসলিম তরুণের প্রাণের মানুষ হয়েছেন, এ অনেকটা অপরিহার্য।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই পর্যন্তই আমি ইকবালের সাহচর্য উপভোগ করতে পারি। এর পরে সেই আমিত্বের সাধনায় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন, সেখানে ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা, ঐতিহ্যের মূল্য নিরূপণ, ইত্যাদি গুরু ও জটিল বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পার্থক্য তা হয়ত মূলগত মনে হয় তিনি বিশ্বাস করেন প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর ও কাম্য, আমার ধারণায় তা এক অসম্ভব

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপার— "যে কাল যা সৃষ্টি করে তাতে মেটে সেই কলেরই প্রয়োজন"[১৬] —অতীত থেকে পাওয়া যেতে পারে কিছু প্রেরণা যদি সংকল্প সাধু হয়। সেজন্য কবি-ইকবালের সঙ্গে তুলনায় চিন্তানেতা ইকবাল আমার কাছে কিছু স্বল্পমূল্য[১৭] এবং আমার এমন আশঙ্কাও আছে যে চিন্তানেতা নীটশে যেমন পরোক্ষভাবে ইয়োরোপের বর্তমান ধ্বংসলীলার কারণ হয়েছেন তেমনি ইকবালের চিন্তাধারারও এমন অপব্যাখ্যা সম্ভবপর—এমন অপব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারায় হয়েছে— যার ফলে তাঁর মনুষ্যত্ব ও প্রতিভা তাঁর স্বদেশীয়দের আনন্দের কারণ না হয়ে দুঃখের কারণ হতে পারে দীর্ঘদিনের জন্য। —শক্তিবাদ ও শান্তি-বাদ দুই থেকেই সময় সময় যে কুফল ফলে সে সম্বন্ধে Religion of Mar গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই দুটি উক্তি স্মরণীয় :

শক্তিবাদ সম্পর্কে—

সংগ্রামশীল ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে স্বভাবতযুক্ত দৈহিক বলবিক্রম—সেই ইচ্ছা শক্তি যখন তার পূর্ণ দায়িত্ব ও সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হয় তখন থেকে জন্মলাভ করে দুর্দমনীয় লোভ, সূচনা হয় অন্তরে বস্তুর দাসত্ব, আর শেষে বিচিত্র স্বার্থবুদ্ধির ঘাত-প্রতিঘাতে দুরাকাঙ্ক্ষার সৌধচূড়া ধূলি-ধূসরিত হয়।

শান্তিবাদ সম্পর্কে—

প্রবল প্রাণশক্তির কর্মধারা যেমন পরিণত হতে পারে অর্থহীনতায় যার ফলে আত্মা নিপীড়িত হয় বস্তুসমারোহে, তেমনি ইচ্ছালোপের যে শান্তি তা পরিণত হতে পারে মৃত্যুর শান্তিতে, আমাদের আন্তর্লোক তখন হয়ে ওঠে অসংলগ্ন স্বপ্নের রাজ্য।

ইকবালের অর্থপূর্ণ প্রভাবকে এই অবাঞ্ছিত পরিণতি থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক চিন্তাশীল কর্মীর কর্তব্য; তাঁর ভক্তদের উপরে তো এই দায়িত্ব বিশেষভাবেই ন্যস্ত। এই উদ্দেশ্যে ইকবালের বাণীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদযাপিত জীবন স্মরণে রাখার যোগ্য। আকাঙ্ক্ষা (আরজুর) মহিমা কীর্তন তিনি একান্তভাবে করেছেন, কিন্তু নিজেকে বারবার বলেছেন ফকীর—নিঃস্ব—আর তাঁর এই নিঃস্বতা নির্লোভ, পদস্থ ও বিত্তশালীর দ্বারস্থ তিনি হননি কোনোদিন, অযাচিত সাহায্যও তিনি করেছেন প্রত্যাখ্যান। বারবার তিনি বলেছেন—

---

১৬. গ্যেটে-ফাউস্ট-প্রথম দৃশ্য

১৭. ইকবালের ইংরেজি জীবনী íThe poet of the East" F nëKoTJ~ cÕr KjTuxj mPuPZj : The affinities with Neitzsche and Bergson need not be emphasised. It is less clear, however, why Iqbal identifies his ideal society with Mohammed's conception of Islam, or why membership of that society should be a privilege reserved for Moslems. Here the religious enthusiast seems to have knocked out the philosopher– a result which is logically wrong but poetically right.

www.nagorikpathagar.org

আমিত্বের বিকাশ ব্যহত হয় যাঞ্চার দ্বারা আর সমৃদ্ধ হয় আকাঙ্ক্ষার দ্বারা। অন্য কথায়, তাঁর এই 'আকাঙ্ক্ষা'র অর্থ হচ্ছে মহত্ত্বের পথে অতন্দ্রিত প্রয়াস, গ্যেটে যেমন বলেছেন :

জীবন আর স্বাধীনতা তারই লভ্য ও ভোগ্য
যে প্রত্যহ নতুন করে' জয় করে এদুটি।

আর সেই সঙ্গে দরকার এই তিনটি বড় বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা : প্রথমত, তিনি মুসলমানের উন্নতি প্রাণভরে চেয়েছেন—

প্রভু, মুসলমানের অন্তরে এক জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা দাও,

কিন্তু বুঝতে হবে, সমস্ত মানুষের, সমস্ত জগতের, উন্নতি উপেক্ষা করে' তিনি মুসলমানের উন্নতি চাইতে পারেন না, চাইলে তাঁর সত্যপ্রীতি ও আল্লাহ-প্রীতি হয় অর্থহীন। তিনি কবি, তাই বিশিষ্ট, concrete তাঁর প্রিয়, 'মানুষে'র কথা তত না ভেবে 'মুসলমানে'র কথা বেশি ভাবা সেজন্য তাঁর পক্ষে কতকটা অপরিহার্য, বিশেষ করে' তাঁর চারপাশের মুসলমানের এমন পতিত দশায়। দ্বিতীয়ত, আমিত্বের যে-বিকাশ তিনি চেয়েছেন তা রাতারাতি হবার মতো ব্যাপার নয়। তাই সাধনাহীন হয়ে তাড়াতাড়ি ফল চাইতে গেলে এ-ক্ষেত্রে অনর্থ ভিন্ন আর কিছুই সম্ভবপর নয়। এ সম্বন্ধে বাউল-কবির সতর্কবাণী চির শ্রদ্ধেয় :

নিঠুর গরজী, তুই মানুষ-মুকুল ভাজবি আগুনে!
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে!
চেয়ে দ্যাখ মোর পরম গুরু সাঁই,
তিনি যুগ যুগান্তে ফুটান কমল তাঁর তাড়াহুড়া নাই।

তৃতীয়ত, বর্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতা থেকে তিনি যে মুখ ফিরিয়েছেন তাকে ধ্বংসোম্মুখ জ্ঞান করে' তাঁর শেষ বয়সের একটি লেখায় ইয়োরোপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন "এই সওদাগরের মৃগ নাভিও কুকুরের নাভি ভিন্ন আর কিছু নয়"[১৮] আর বরণীয় জ্ঞান করেছেন প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা, সেক্ষেত্রে দৃষ্টির পরিচয় না দিয়ে দৃষ্টি বিভ্রমেরই পরিচয় তিনি দিয়েছেন বেশি, কেননা, সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অকুণ্ঠিত মানব-কল্যাণ-জিজ্ঞাসা মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ আত্মিক সম্পদ— প্রাচ্যের আমিত্ব সাধনের বা প্রশান্তি সাধনের চাই তার পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

ইকবালের মহৎ বেদনা মহৎ সার্থকতা লাভ করুক।

১৩৪৯, ইকবাল স্মৃতিবার্ষিকী রাজশাহী কলেজ।

---

১৮. মুষ্‌কে ইনসওদাগরয্ নাফে সগস্‌ত্

www.nagorikpathagar.org

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান-সমাজ

আজকের দিন বাংলাদেশের পক্ষে যে এক দুর্দিন সে কথা অনেকেই বলে থাকেন। হয়ত মিথ্যা বলেন না। এমন একটা সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য, অবিশ্বাস, এমন কি শত্রুতা, আজ বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে যে, এই পরিমণ্ডলে বাস করা ভদ্রব্যক্তিদের পক্ষে রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তবে আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্তমানের এই অস্বস্তিকর অবস্থা মনে হয় ভালই। ফোঁড়া যখন পেকে ওঠে তখনকার যন্ত্রণা অসহ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সান্ত্বনাও পাওয়া যায় যে, বেদনার অবসান হতে দেরী হবে না।

এই দিনে কোনো কোনো শিক্ষিত মুসলমান বাঙালির মুখেও শুনতে পাওয়া গেছে এই প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ একজন অতি বড় কবি, মহামানব, বিশ্বপ্রেমিক, কিন্তু তাঁর বাড়ির কাছের মুসলমানদের জন্য তিনি কি করেছেন?

এরূপ প্রশ্ন বহুবার আমাকে শুনতে হয়েছে। কিন্তু একবার একজন শ্রদ্ধেয় মুসলিম সাহিত্যিক এ প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন তা মনে রাখবার মতো; তিনি বলেছিলেন : আকাশের সূর্য মুসলমানের জন্য বিশেষ কি করেছে?[১১]

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের সমালোচকদের উক্তির এইই হয়ত শ্রেষ্ঠ প্রত্যুত্তর। কবি আকাশের সূর্যের মতোই একজন সহজ মানব বন্ধু। অবশ্য যেহেতু কবি একজন মানুষ, এক বিশেষ পরিবেষ্টনের সৃষ্টি, সেজন্যে অত্যন্ত কাছে থেকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে আলোকের উৎস সূর্যেও ধরা পড়ে কালো দাগ। যে গোলাপ সৌষ্ঠব আর গন্ধে অতুলনীয় তার স্পর্শ লোভাতুর লাভ করে হাতে কাঁটার আঘাত। কিন্তু কালো দাগ সত্ত্বেও সূর্য সূর্যই। কাঁটা সত্ত্বেও গোলাপ গোলাপই। এক বিশেষ পরিবেষ্টনে জন্ম সত্ত্বেও কবি চিরন্তন মানব— তাঁর পরিবেষ্টনের সমস্ত সীমারেখা অবলীলাক্রমের অতিক্রম করে তাঁতে উৎসারিত হয় মানুষের চিরন্তন সুখ, চিরন্তন দুঃখ, চিরন্তন প্রেম, চিরন্তন অভয়। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ কবি, এবং যেহেতু মুসলমান মানুষ, সেজন্যে মুসলমান তার আজকার বিশেষ ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রভাবে বুঝুক আর নাই বুঝুক, রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিকই তার পরম বন্ধু ব্যতীত আর কিছু নন।

কিন্তু চিরন্তন যদি সত্য হয়, যা স্থানিক ও কালিক তাও তা মিথ্যা নয়। আজকের এই বিশেষ যুগে কবি-রবীন্দ্রনাথের মুসলিম দেশ-ভ্রাতাদের মনে এই অকরুণ প্রশ্ন জেগে থাকে যে তিনি তাঁদের কোন কাজে লেগেছেন, তবে সত্য-জিজ্ঞাসুকে সে প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মুসলমান প্রতিবেশীর মনে জেগেছে প্রধানত দুটি কারণে, প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্বকবি নন; বিশেষভাবে একজন ভারতীয় কবিও বটে।

---

১১. 'আমাদের দুঃখ' –প্রণেতা আনোয়ারুল কাদীর

www.nagorikpathagar.org

সেই ভারতীয়তার রূপ দান করতে গিয়ে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু মনোরম চিত্রও তিনি অঙ্কিত করেছেন, তাঁর সেই সব সৃষ্টি হিন্দুকে শুধু আনন্দিতই করেনি, গর্বিতও করেছে।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত বিরূপতা না থাকলেও, এমন কি অল্পাধিক অনুরাগ সত্ত্বেও, সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি প্রায় মৌনীই রয়েছেন তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে।

খুব সহজভাবে এই ব্যাপারের এই ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে, শিল্পীর তুলিকার অবলম্বন হয় যে-সমস্তের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয় সেই-সব। হয়ত তাঁর প্রতিদিনের পরিচিত মুখ তাঁর তুলিকায় ধরা পড়ে না, কিন্তু ক্ষণিকের দেখা এক-আধ পরিচিত মুখ তাঁর অন্তরে চাঞ্চল্য জাগায় দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ রাত্রি। শিল্পীর এই পক্ষপাতের তত্ত্ব দুরধিগম্য। কিন্তু হয়ত প্রশ্ন হবে, রবীন্দ্রনাথ তো শুধু শিল্পী নন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ জীবন-সমালোচক। সে-ক্ষেত্রে তাঁর দেশবাসী মুসলমান সম্পর্কে তাঁর প্রায় তুষ্ণীম্ভাব অদ্ভুত নয় কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের একদল অনুরাগী এই কৈফিয়ৎ দিয়ে থাকেন, যে মুসলমান সাধারণত সমালোচক-অসহিষ্ণু। এরূপক্ষেত্রে আলোচনা বা সমালোচনার পক্ষে যে অবাঞ্ছিত কলহ অপরিহার্য রবীন্দ্রনাথের রুচি তাঁকে সে-পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেছে। কিন্তু এই কৈফিয়ৎ বড় দুর্বল। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর সমালোচনাও কম করেননি, এবং সে-ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর কলহ তিনি যে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন ঠিক তা নয়। হয়ত তিনি এড়িয়ে যেতে চানও নি, চাইলে এই বাণী তাঁর জন্য অসত্য হত।

যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য বলি' উঠে খর খড়্গ সম.....

বস্তুত তাঁর দেশবাসী মুসলমান সম্পর্কে তিনি যে কম আলোচনা করেছেন তা নয়, অন্তত, তিনি যে আলোচনা করেছেন তা' গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান ধর্মের প্রতি অথবা পরধর্মের প্রতি— তাঁর যে শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর 'সতী' নাটিকায় তা তুলনাহীন। ভারতের মুসলমান দোষ ও গুণ দুই-ই তাঁর আলোচনার বিষয় হয়েছে।[২০] বিশেষত ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমানের পার্থক্য কোথায় এবং ভারতীয় মুসলিম জীবনের সত্যকার পরিণতি কোন পথে সে-সম্বন্ধেও স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন।[২১] তাঁর এই সব মত স্বীকার্য কি অস্বীকার্য তার চাইতেও বড় কথা এই যে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই তিনি এ-সব মতামত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য মুসলমানের ধর্ম বা ধর্ম প্রবর্তক সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেন নি। তিনি যে কবি— জগতের প্রাত্যহিক জীবনের সাহচর্য আর আত্ম অনুভূতি এই-ই যে তাঁর জীবনের রাজপথ— এ-বোধের সঞ্চার তাঁতে হয়েছিল তাঁর প্রথম যৌবনে আর এই স্বধর্ম থেকে

---

২০. দ্রঃ আত্মশক্তি ও আধুনিক সাহিত্য।

২১. দ্রঃ আত্মপরিচয়ঃ পরিচয়।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বিচ্যুত হন নি কখনো। একজন ব্রাহ্মনেতার সন্তান হয়ে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই পিতৃধর্মও তাঁর জন্য হয়েছিল এক প্রেরণার স্থল, পরিক্রমণের স্থল নয়। এ সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তি স্মরণীয় :

> ......ধর্ম সম্প্রদায় ব্যাপারটাকে আমরা কী চোখে দেখিব? তাহাকে এই বলিয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে, সে জলের জন্যই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গণ্ডুষে করিয়াই পিপাসা নিবৃত্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই সে পাত্রটাকেই সবচেয়ে দামি বলিয়া জানে। সেই জন্যই জল কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিক ঠিকানা নাই, পাত্র লইয়া বিষম মারামারি বাধিয়া যায়। তখন যে-ধর্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আলগা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতার জাল সৃষ্টি করিয়া বসে, সে-জাল কাটানো শক্ত।[২২]

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভিতরে সত্যের জন্য এই যে সহজাত তৃষ্ণা ছিল এই জন্যই হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সব সমাজেরই সত্যকার ধর্ম জিজ্ঞাসুদের তিনি পরম বন্ধু তা তিনি সেই সমস্ত ধর্মের বিশেষ আলোচনা ও অনুশীলন করুন আর নাই করুন। যে সমস্ত মুসলমান সমালোচক এই প্রশ্নের অবতারণা করেন— রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জন্য কি করেছেন, তাঁদের নিজেদের প্রথমে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত— মুসলমান কে, এবং কি সে চায়। যদি মুসলমানীর অর্থ এই হয় যে তা বিশেষ কতকগুলি অনড় মতবাদের সমষ্টি তবে সে মুসলমানীর জন্য রবীন্দ্রনাথ কিছুই করেন নি। এই মুসলমানীর সমর্থন কোরআন, হজরত মোহাম্মদ, এবং যুগযুগান্তের মুসলিম শ্রেষ্ঠরাও করেন নি, বরং তার প্রতিবাদ করেছেন, যেমন মহামনীষী সাদী বলেছেন—

> তরিকত ব-জুজ্ খেদমতে খালক নিস্‌ত
> ব-তসবি্‌ ও সাজ্জাদা ও দল্‌ক নিস্‌ত।

সৃষ্টির সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়, তসবিহ্ জায়নামাজ ও আলখাল্লায় ধর্ম নেই। অথবা যেমন কোরআনে বলা হয়েছে– আল্লাহ্ ভুল ধারণার জন্য মানুষ আল্লাহর রোষে পতিত হয় না, পতিত হয় দুষ্কৃতির জন্য (১১ঃ১১৭)।

কিন্তু মুসলমানীর অর্থ যদি হয় সত্যপ্রীতি, কাণ্ডজ্ঞান-প্রীতি, মানব-প্রীতি, জগৎপ্রীতি, ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ, তবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় মুসলমান এ যুগে আর কেউ জন্মেছেন কি না সে কথা এই সব সমালোচকদের গভীর বিচার বিশ্লেষণের বিষয় হওয়া উচিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় মুসলমান আজও ভুগছে একটি মানসিক বিকৃতি থেকে, ইংরেজিতে তাকে বলা হয় Inferiority complex. তারা সংখ্যায় অল্প, প্রভাবে খর্ব এই চেতনা তাদের অন্তরে সঞ্চারিত করেছে একটি মানসিক অস্বস্তি। এই মানসিক

---

২২. দ্রঃ চারিত্র পূজা

www.nagorikpathagar.org

অস্বস্তির চশমার সাহায্যে জগৎকে যথাযথভাবে দেখা ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। এই মানসিক অস্বস্তি যেদিন তার কেটে যাবে, তার পরিবর্তন তার অন্তরে সঞ্চারিত হবে অভয় ও আশা, সেদিন সহজেই সে বুঝবে দেশে দেশান্তরে মুসলমানদের মধ্যে অমুসলমানদের মধ্যে কোথায় তার পরম মিত্রেরা বাস করেছেন। সেদিনে আজকার একশ্রেণীর দুঃখী মুসলমানের এই যে প্রশ্ন— কবি ও বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাদের জন্য কি করেছেন, এটি তার অট্টহাসির সামগ্রী হবে।

১৩৪৮

বিষাদ-সিন্ধু

অনেকের ধারণা, মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' জঙ্গনামা ও এই জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সাধুভাষায় রূপান্তর মাত্র। লেখক নিজে বলেছেন: "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ সিন্ধু' বিরচিত হইল।" তা উপকরণ যেখান থেকেই তিনি সংগ্রহ করুন, এই বইখানিতে তাঁর যে-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা অনন্য সাধারণ।

পুঁথি-সাহিত্যের লেখকদের সঙ্গে 'বিষাদ সিন্ধু'-লেখকের বড় মিল হয়ত এইখানে যে দৈব-বলের অদ্ভুতত্বে বিশ্বাস তাঁরও ভিতরে প্রবল দেখা যাচ্ছে। দৈববলে বিশ্বাস মাত্রই সাহিত্যে বা জীবনে দোষার্হ নয়; কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে যখন যোগ ঘটে অজ্ঞানের ও ভয়বিহ্বলতার, তখন তা হয়ে ওঠে জীবনের জন্য অভিশাপ— সাহিত্যেও একান্ত অবাঞ্ছিত। এই বিশ্বাসের জন্য 'বিষাদ সিন্ধু' কাব্যের সাহিত্যিক ক্ষমতা যে অনেক জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে; বিশেষ করে' ধর্ম-বোধ সম্বন্ধে অতি-অকিঞ্চিতকর ধারণার পরিচয় তিনি যে অনেক জায়গায় দিয়েছেন, সে-সব সবিস্তারে বলবার প্রয়োজন করে না।

অথচ জীবন, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে অগভীর তা নয়। আজকের মুখে তিনি বলেছেন "ধার্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বরভক্তের মন এক, আত্মা এক।" মানবজীবনের জটিলতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও যথেষ্ট।

তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতা আর ধর্ম পরকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, এই দুয়ের ভিতরে যে একটি বিরোধ দেখা যাচ্ছে, এটি তাঁর সম্বন্ধে বেশ ভাববার বিষয়। শোনা যায়, বহু সাহিত্য-ব্রতীর মতো তাঁরও যৌবন উচ্ছৃঙ্খলতায় কেটেছিল। হতে পারে 'বিষাদ সিন্ধু'তে তাঁর যে নিয়তি পূজা দেখা যাচ্ছে, তা সেই উচ্ছৃঙ্খলতার এক প্রতিক্রিয়া। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ, বিশেষ করে তাঁর 'গাজী মিয়ার বস্তানি' খানি পাওয়া গেলে তাঁর চিত্তের পুরোপুরি পরিচয় পাওয়া অনেকটা সহজ হতো। যাইই হোক, তাঁর এই অসার্থক নিয়তি পূজার কথা ভুলে তাঁর সাহিত্যিক শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ যাতে লাভ হয়েছে তারই অনুসরণ কর্তব্য। কেউ কেউ বলতে পারেন, কারবালার নিদারুণ প্রান্তরে কাসেম ও ইমাম হোসেনের যে বীরমূর্তি তিনি দাঁড় করিয়েছেন, 'নিয়তি'র নিষ্ঠুর লীলা তাতে প্রকট। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

এখানে 'নিয়তি'র লীলা না দেখে এটি মানবজীবনের এক করুণ কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতি, একথাও ভাবা যেতে পারে। ইমাম-পরিবার ও তাঁদের সহচর বর্গের যে ভাগ্য-বিড়ম্বনা কারবালায় এসে উপস্থিত হয়েছেন এ তাঁরা জানেন, কিন্তু বাস্তবিকই তেমন গভীর করে' জানেন না; কারবালায় তাঁদের অবস্থিতি এক সঙ্কটময় স্থানে অবস্থিতি মাত্র। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে মীর মোশাররফ হোসেনের জন্ম। তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগ যে কত ঘনিষ্ঠ নানাদিক দিয়ে তা বিচার করে' দেখা যেতে পারে। তাঁর বাক্যের গঠন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুযায়ী– অবশ্য কিছু বেশি বাক-বাহুল্য তাতে আছে; তাঁর মন্ত্রী ও সেনাপতিদের মন্ত্রণায়, ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে এবং স্বাধীনতার জন্য দরদেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তাঁর নিবিড়তম যোগ মধুসূদনের সঙ্গেই। বিষাদ-সিন্ধু গদ্যে লিখিত হলেও গদ্য লেখকের পরিচ্ছন্নতা লেখকের দৃষ্টিতে নেই– তাঁর চোখে বরং কবির স্বাপ্নিকতা; আর এর যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যেমন এজিদ-চরিত্র, ইমাম হোসেন, কাসেম ও মোহাম্মদ হানিফার বিক্রম, সবই কাব্যসৌন্দর্য-মাখা।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্যে'র বর্ণনার ছায়া যে মাঝে মাঝে 'বিষাদ সিন্ধু'র উপরে পড়েছে শুধু তাই নয়, 'মেঘনাদবধে'র দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনার সঙ্গে এর দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনার গভীর মিল রয়েছে। 'মেঘনাদবধে'র শ্রেষ্ঠ চরিত্র রাবণ; তার শক্তি যেমন অপরিসীম, দুঃখও তেমনি অফুরন্ত। রাবণের মতনই এজিদ শক্তিমান, কিন্তু তাঁর কামনার ধন জয়নবকে তিনি লাভ করতে পারেন নি এই দুঃখে তাঁর সমস্ত শক্তি বিপর্যস্ত অস্থিরচিত্ততা তাঁর একমাত্র পরিচয়। তেমনিভাবে 'মেঘনাদবধে'র সীতা চরিত্রের মাধুর্য ও কোমলতার অনেকখানি সমাবেশ ঘটেছে 'বিষাদ সিন্ধু'র জয়নব-চরিত্রে। গ্রন্থের শেষের দিকে জয়নবের যে দীর্ঘ আত্মবিলাপ রয়েছে তার সঙ্গে সীতা ও সরমার কথোপকথনের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।

রোমান্টিক কবির যে ভাবোচ্ছ্বাস— একই সঙ্গে সেইটি 'বিষাদ সিন্ধু' কাব্যের শক্তি ও দুর্বলতার কারণ। ভাবোচ্ছ্বাসের জন্যই তাঁর গ্রন্থ চরিত্রের বৈচিত্র্যের পরিচয় যথেষ্ট থাকলেও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-সৃষ্টি কমই সম্ভবপর হয়েছে। এরও মধ্যে যাঁদের তিনি দোষে-গুণে মানুষ অথবা বিচক্ষণ সাংসারিক মানুষ রূপে আঁকতে চেয়েছেন, যেমন এজিদ, ওত্‌বেঅলীদ, আবদুল্লাহ-জেয়াদ, মারওয়ান, জাএদা, গাজী রহমান, তাঁরা অনেকাংশে এক একটি মানুষ রূপে আঁকতে চেয়েছেন, যেমন এজিদের পিতা মাবিয়া, ইমাম পরিবারের নরনারী, মদিনাবাসিগণ ও মোহাম্মদ হানিফার যোদ্ধাবৃন্দ, তাঁদের বীরত্বের প্রকাশ মাঝে মাঝে মনোরম হলেও ইমাম হাসান ও জয়নব ব্যতীত তাঁরা প্রায় সবাই মোটের উপর কথা ও ধর্মাচারের সমষ্টিমাত্র হয়ে উঠেছেন। জয়নবের কথা আগেই বলা হয়েছে; ইমাম হাসানের চরিত্র বাস্তবিক বড় মধুর করে 'বিষাদ-সিন্ধুকার' এঁকেছেন। যে বৃদ্ধ নিজের মনের বিষে তাঁকে বর্শা ফেলে মেরেছিল তার প্রতি ও তাঁর প্রাণঘাতি স্ত্রী জা-এদার প্রতি তাঁর যে ব্যবহার তা বড় সৌজন্যময়। সেকালের পীরবাদ ও সুফীমতবাদ-প্রভাবান্বিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে লেখকের জন্ম, ইমাম হোসেনের চরিত্রে যে স্নেহ ও সৌজন্য তিনি

www.nagorikpathagar.org

অঙ্কিত করতে পেরেছেন তা আমাদের একালের ওহাবী-প্রভাবান্বিত সমাজে দুর্লভ হলেও সেকালের সমাজে দুর্লভ ছিল না। চরিত্রের পরিকল্পনায় এই লেখকের বিশেষ কৃতিত্বও প্রকাশ পেয়েছে; তাঁর সমস্ত নায়ক-নায়িকাই স্বাভাবিক মানুষ, এক সীমার ব্যতীত অমানুষ "শয়তান" কেউই হয়ে ওঠে নি যদিও তিনি 'শয়তান' বিশেষণে তিনি বহু নায়ক নায়িকাকে বিশেষিত করেছেন। চরিত্র হিসাবে সীমার অবশ্য কোনো বৈশিষ্ট্য ফোটে নি, সে যেন নিয়তির হাতের যন্ত্র মাত্র।

জনসাধারণের যে সমাদর, এই শক্তিমান সাহিত্যিক নিজের বলেই তা লাভ করেছেন। তাঁর সমস্ত রচনা ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করে' তাঁর প্রতিভার প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধানিবেদন এখন সাহিত্যরসিকদের কর্তব্য।

১৩৪১

নজরুল ইসলাম

কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক জীবনের চারিটি স্তর নির্দেশ করা যেতে পারে।

প্রথম স্তর—	তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা থেকে 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত।
দ্বিতীয় স্তর—	'বিদ্রোহী' প্রকাশের পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান পর্যন্ত।
তৃতীয় স্তর—	তাঁর সঙ্গীত রচনার, বিশেষ করে, গজল রচনার যুগ।
চতুর্থ স্তর—	তাঁর যোগী- জীবন।[২৩]

প্রথম স্তর

শরৎচন্দ্রের মতো নজরুল ইসলামও অতি অল্পদিনে বাংলার সাহিত্য জগতে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পূর্বেই তাঁর নবীনতা অথবা উদ্দামতা আর ছন্দ-সামর্থ্যের প্রতি বাংলার সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ আর 'বিদ্রোহী' রচনা এর মধ্যে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর ভাব-জীবনের এই স্তরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার প্রয়োজন আছে। 'বিদ্রোহী' থেকে তাঁর মানসজীবনের গতি যে- মুখী হলো তার সঙ্গে তাঁর পূর্বের ভাব-জীবনের সঙ্গতি অসঙ্গতি দুইই রয়েছে। তাঁর এই যুগের একটি বিশিষ্ট রচনা তাঁর 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাস। এতে কবি যে তাঁর তরুণ জীবন কিছু পরিমাণে চিত্রিত করেছেন, অনেকে বোধ হয় তা জানেন।

---

২৩. এটি পঠিত হয়েছিল কবির ৪৩তম জন্মোৎসবে- ১৩৪৮ সালে। তার পরের বৎসর থেকে কবি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন।

www.nagorikpathagar.org

এই রচনায় দেখা যাচ্ছে কবি একজন অসাধারণ ভাববিলাসী ও অভিমানী, ব্যর্থপ্রেমের বেদনায় গভীরভাবে আহত। কিন্তু এই আঘাত যত বড়ই হোক এতে মুহ্যমান তিনি হননি। এই নিষ্করুণ আঘাতে তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে একটি মধু-স্রোত; কিন্তু এতে লাঞ্ছিত এমন কি ম্রিয়মাণও তিনি হননি। তবে তিনি অবলম্বন করেছেন এক দায়িত্বহীন ভবঘুরের জীবন-সেই দায়িত্বহীনতায় তাঁর সুনিবিড় আনন্দ।

এই যুগের ভাবে-ভোলা কবি ছিলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত, বিশেষ করে' রবীন্দ্রনাথের যৌবনের প্রেমসঙ্গীতে আত্মহারা: রবীন্দ্রনাথের পরে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি; আর তাঁর প্রিয় ছিলেন ইরানী-কবিতিলক হাফিজ তাঁর সুফী তত্ত্বের জন্যে নয় তাঁর প্রেমের উন্মাদনার জন্যে।

আর এক শ্রেণীর ভাবুকদের প্রতিও কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁরা বাংলার সন্ত্রাসবাদীর দল।

দ্বিতীয় স্তর

রবীন্দ্রনাথের যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' অথবা 'এবার ফিরাও মোরে' নজরুলের তেমনি 'বিদ্রোহী'। জীবনে হঠাৎ একটি বৃহৎ চেতনার আবির্ভাবের গৌরব এসবে বিধৃত কিন্তু এই দুই কবির জীবন ধারার উপরে তাঁদের এই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রভাবে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' অথবা 'এবার ফিরাও মোরে' রবীন্দ্রনাথের কবি চিত্তে যত বড় দোলা-ই দিক, এ-সবের প্রভাবে তাঁর জীবনের সাধারণ ধারায় যে পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ্যযোগ্য হয়নি দীর্ঘ দিন। মনে হয়, কবি যেমন সর্বংসহা প্রকৃতি যত বড় ঝড়-বৃষ্টিই সেই প্রকৃতির বুকের উপরে তান্ডব জমিয়ে তুলুক, পরদিন সূর্যোদয়ের হাসিমুখে জেগে উঠতে তার বাধে না। নজরুল ইসলামও 'বিদ্রোহী' রচনার পরে যে একেবারে বদলে গিয়েছিলেন ঠিক তা নয়; 'বিদ্রোহী' কবিতাতেও দেখা যাচ্ছে, একদিকে তিনি যেমন নিজের ভিতরে অনুভব করছেন সাইক্লোনের শক্তি অন্যদিকে তেম্‌নি তিনি মুগ্ধ 'চপল মেয়ের কাঁকন চূড়ির কনকনে'র ছলনায়। তবু এ কথা সত্য যে, 'বিদ্রোহী'র আকর্ষণ কবিকে বাস্তবিকই ঘর ছাড়া করেছিল। সেই দিনে তাঁর সাম্যবাদ প্রচার আর বেপরোয়া শিকল ভাঙ্গার গানের কথা যাঁদের মনে আছে তাঁরা স্মরণ করতে পারেন প্রচণ্ড ধূমকেতুর মতো কি এক ভীষণ মনোহর জীবন কবির ভিতরে সূচিত হয়েছিল।

১৩২৬ সালে– ইংরেজি ১৯১৯ সালে– নজরুল কলকাতায় সাহিত্যিক-সমাজে পরিচিত হন তখনই এক হিসাবে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। সেদিন বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল সে কথা বলা হয়েছে; সেই সঙ্গে এই কথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পূর্বেই 'শাতিল আরব' 'মোহররম' 'কোরবানী' প্রভৃতি যে-সব জনপ্রিয় কবিতা তিনি লিখেছিলেন সে-সবে ব্যক্ত হয়েছিল মুসলমান সমাজের গতানুগতিক জীবনের প্রতি ধিক্কার, এক বলিষ্ঠ নব জীবনারম্ভের জন্য তীব্র কামনা, আর অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি ও মহিমায় তাঁর প্রত্যয়। এটি ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য খেলাফত

www.nagorikpathagar.org

যুগ। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ওহাবী-বিদ্রোহ দমনের[২৪] পর থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত বাংলার মুসলমানের ইতিহাস মোটের উপর এক গভীর নৈরাশ্যের ইতিহাস। সেই নৈরাশ্যের কালোমেঘ তাদের চোখের সামনে খানিকটা কেটে গেলে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন আধুনিক শিক্ষার দিকে তাদের মন স্পষ্টভাবেই ঝুঁকে পড়লো। সেই দিনে বাংলার মুসলমানের জন্য-অন্তত শিক্ষিত মুসলমানের জন্য-আদর্শ-স্থানীয় ছিল বাংলা শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ যদিও স্বদেশী আন্দোলনে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়া এই শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। মনে পড়ে, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পরে, কলকাতায় সদ্য-আগত তরুণ নজরুল ইসলামকে মোহম্মদ এয়াকুব আলি চৌধুরীর মতো একজন চরিত্রবান ও ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান সাহিত্যিক বলেছিলেন: "আপনাকে মুসলমান বারীন ঘোষ হতে হবে।" স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার হিন্দুর যে সাফল্য, মুখ্যত তাইই প্রেরণা জুগিয়েছিল মুসলমানের এই খেলাফত আন্দোলন। কিন্তু হিন্দুর আয়োজনের ব্যাপকতা তাঁদের ছিল না, ফলে সফলতা তাঁদের জন্য হচ্ছিল সুদূরপরাহত। তাঁদের কেবল লাভ হচ্ছিল দিগদেশবিহীন এক বিক্ষুব্ধ মানসিকতা। তরুণ নজরুল, অর্থাৎ 'বিদ্রোহী, রচনার পূর্বের নজরুল, এক হিসাবে ছিলেন এই খেলাফত যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি আর 'মোহররম' কবিতায় অধুনা-পরিত্যক্ত শেষ দুটি চরণ এই সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে—

দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইসলাম-
লহু লাও, নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম।

কিন্তু 'বিদ্রোহী'তে তাঁর মানসিক কুয়াসা এতখানি কেটে যায় যে, তিনি যেন এক নূতন জীবন নিয়ে জেগে ওঠেন, নিজেকে ও জগৎকে দেখতে আরম্ভ করেন এক নতুন দৃষ্টিতে।

বাংলাদেশে এক শ্রেণীর সাহিত্যরসিক আছেন যাঁরা নজরুল ইসলামকে জ্ঞান করেন একজন যুগ-প্রবর্তক কবি। আজকার দিনে তাঁদের সংখ্যা-শক্তি কেমন জানি না, তবে নজরুলের পরিচয় আছে। তাঁদের প্রতিপাদ্যের প্রধান অবলম্বন এই 'বিদ্রোহী'। তাঁদের ধারণা, এমন একটা ওজস্বিতা নজরুলের এই 'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে যা বাংলা সাহিত্যে, সম্পূর্ণ নূতন-বাংলার দার্শনিক আবহাওয়া এ চিন্তালেশহীন ভাস্বর ললাট তারুণ্য, এই দ্বিধাহীন দুর্মদ তারুণ্যই বাংলা সাহিত্য নজরুল প্রতিভার চিরগৌরবময় দান।

যাঁদের এই মত, মনে হয় না নজরুলের এই তারুণ্য বাস্তবিকই তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই স্মরণ করা দরকার, রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র যুগে নজরুল-প্রতিভার উন্মেষ।

আমরা চলি সম্মুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে,

---

[২৪]. দ্রঃ 'বাংলার মুসলমানের কথা'

www.nagorikpathagar.org

রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে

অথবা

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে অবুঝ, ওরে সবুজ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা

অথবা

শিকল দেবীর ঐ যে পূজা-দেবী
চিরকাল কি রইবে খাড়া,
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ারে ভেদি'।
ঝড়ের মতন বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ভেড়ে
ভুলগুলো সব আন রে বাছা বাছা
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা

ইত্যাদি ছত্র সে যুগের বাংলার শিক্ষিত তরুণ-সমাজে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল- এক হিসাবে বাংলার তরুণ-আন্দোলনের গোড়পত্তন হয়েছিল এই 'বলাকা' কাব্যের সাহায্যে। দ্বিতীয়ত, নজরুলের লেখনীতে যে-তারুণ্য রূপ পেয়েছে তার সাহিত্যিক মর্যাদা কেমন সেটিও একটি বড় অনুধাবনের বিষয়। একটু মনোযোগী হলেই চোখে পড়ে, নজরুলের রচনা, বিশেষ করে তাঁর 'বিদ্রোহী' যুগের রচনা, অনবদ্য নয়। শ্রেষ্ঠ কবিদের বিশেষ বিশেষ কবিতায় কবি-কল্পনার যে পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায় নজরুলের রচনায় সেটির অভাব মাঝে মাঝে প্রায় বেদনাদায়ক হয়েছে। নজরুল যে পূর্ণাঙ্গ কবিতার রচয়িতা তেমন নন, তাঁর কবি-প্রতিভা বরং প্রকাশ পেয়েছে উৎকৃষ্ট চরণের রচনায়, এ উক্তি করা যেতে পারে। অবশ্য এমন সাহিত্য-রসিক আছেন যাঁরা কোনো কবিতার, বিশেষ করে' দীর্ঘ কবিতার, সমগ্রতার সৌন্দর্যে মনোযোগী হওয়া তেমন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন না; তাঁদের কাছে কবিতা বরং উৎকৃষ্ট চরণের অথবা বাক্যাংশের সমষ্টি মুক্তার মালা যেমন মুক্তার সমষ্টি। এই শ্রেণীর সাহিত্য-সমঝদারদের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেও বলা যায়, কবিতার বিভিন্ন চরণ অথবা বাক্যাংশ যখন একত্র গ্রথিত করবার প্রয়োজন হয় তখন তাদের একত্র-সমাবেশ যাতে অদ্ভুতদর্শন না হয় সেদিকে মনোযোগী হওয়া কবির জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু নজরুলের 'বিদ্রোহী' যুগের অনেক কবিতায় দেখা যাবে- 'বিদ্রোহী' ও সে-সবের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাবের একত্র সমাবেশের সঙ্গতি সুষমা অথবা যৌক্তিকতা বিষয়ে কবি বেশ উদাসীন হয়েছেন। কিন্তু এত ত্রুটি সত্ত্বেও এমন একটা প্রাণশক্তির ছাপ তাঁর 'বিদ্রোহী' যুগের অনেক কবিতায় মুদ্রিত হয়েছে যার জন্য তাঁর ভয়ভাবনাহীন তারুণ্যের তিনি স্রষ্টা পুরোপুরি না হলেও লালায়িত। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে এই যুগে তাঁর রেখাপাতে অপরিচ্ছন্নতাও

www.nagorikpathagar.org

এতখানি প্রকাশ পেয়েছে যে তাঁর সাহচর্য রসিক পাঠককে আনন্দ যা দেয় দুঃখও সেই তুলনায় কম দেয় না।

এই যে নজরুলের অত্যাশ্চর্য শক্তি, অথচ সাহিত্যে তার অনবদ্য প্রকাশের অভাব, এটি তাঁর সাহিত্যের পাঠকদের দুঃখের বা ক্ষোভের কারণ না হোক এটি বরং তাঁদের অন্তরে সঞ্চারিত করুক তীক্ষ্ণতার জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে, কবি তিনি নিঃসন্দেহ— অনুভূতির গোপন আয়োজন তাঁর জগতে কখনো কখনো ঘটায় বাণীর অপূর্ব বিদ্যুৎ-দীপ্তি—কিন্তু কবি তিনি যত বড় তার চাইতেও বড় তিনি যুগ মানব। যুগের বেদনা ও উন্মাদনা তাঁতে এত প্রবল যে, কবির কল্পনা লোকে অবস্থান তাঁর পক্ষে যেন দুসাঃধ্য। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ ইসলামী কবিতা 'খালেদ'। খালেদের মহিমা উদাত্ত কণ্ঠে গাইবার চেষ্টাই তিনি করেছেন; কিন্তু দেখা যাচ্ছে খালেদের বীরমূর্তি পূর্ণভাবে রূপায়িত করার চাইতে তাঁর মনে প্রবলতর তাঁর সমসাময়িক মুসলমান সমাজের জন্য বেদনা অথবা অস্থিরতা। অবশ্য কবির সৃষ্টি আকাশ কুসুম নয় কখনো, কবির কাব্য ফুল মাটির গাছেরই ফুল, অন্য কথায়, যুগধর্মের বেদনায় কবি-মানস লালিত ও গঠিত। তবু গাছ আর ফুল যেমন এক জিনিস নয়, কোনো যুগের জীবন ও সেই যুগের কাব্যও ঠিক এক জিনিস নয়। Literature is journalism that lasts (যে সাংবাদিকতা টিকে যায় তার নাম সাহিত্য) সাহিত্যের এই এক চমৎকার সংজ্ঞা একজন সাহিত্য-রসিক দিয়েছেন।[২৫] কিন্তু এই যে শেষের কথা that lasts যা টিকে যায়, এরই মধ্যে রয়েছে সাহিত্যের মূল তত্ত্ব। সাংবাদিকতা স্থায়ী হয় না, কিন্তু সাহিত্য স্থায়ী হয়, এই জন্য যে, সাংবাদিকতা প্রতিদিনের জীবনের মতো অস্থির, অপূর্ণাঙ্গ, নিয়ত-পরিবর্তনশীলতার-তা যেন প্রতিদিনের জীবনের ফটোগ্রাফ। কিন্তু সাহিত্য ঠিক তা নয়, তা অনেকখানি অচঞ্চল, অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ, কেননা, ঠিক বাস্তব-লোকে নয় কল্পনা-লোকে বা সৌন্দর্য-লোকে প্রতিষ্ঠিত হবার অবসর যেন নজরুলের নেই, রুচিও যেন তাঁর তাতে নেই প্রতিদিনের জীবনের তাড়নার তীব্রভাবে তাড়িত হয়েই তিনি চলেছেন, আর এই জন্যই নজরুলকে এ যুগের একজন অসাধারণ কবি ভাবা কঠিন,[২৬] কিন্তু এ যুগের একজন অসাধারণ ব্যক্তি তিনি অবিসংবাদিতরূপে।

বলা হয়েছে, প্রতিদিনের জীবনের তীব্র তাড়নায় তাড়িত হয়ে চলায় কবি নজরুলের বেশ আনন্দ। কথাটি আর একটু বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে। প্রতিদিনের হাসি-কান্নার জীবন চিরদিনই মানুষকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। নইলে জগৎ শ্মশানে পর্যবসিত হতো। কিন্তু প্রকৃত মানুষের মনোভাব যাইই হোক শিক্ষিত মানুষ প্রতিদিনের জীবনকে সব সময়ে যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছেন তা নয়। বরং মধ্যযুগ বলতে মানুষের ইতিহাসের যে স্তর নির্দেশ করা হয় তাতে দেখা যায়, সংসারের প্রতিদিনের জীবনের প্রতি অবিশ্বাসের

---

২৫. Robert Lynd

২৬. দ্রঃ 'আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্ণিশ'

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টিতেই শিক্ষিতেরা তাকিয়েছেন। আধুনিক যুগ এক হিসাবে তার প্রতিবাদ আর এই প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে আজকে থেকে নয়। আমাদের দেশেও এই প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে ইংরেজ রাজত্বের প্রায় সূচনায়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে এই প্রতিবাদ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে। এই প্রতিবাদ আজ আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির এক creed, ধর্ম বিশ্বাস, এক সময়ে যেমন তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস ছিল বৈরাগ্য। নজরুল একালের তেমনি প্রত্যয়শীল এক ব্যক্তি। তবে তাঁর বিশেষত্ব এই যে, এই প্রত্যয় তাঁতে অনেকের চাইতে বলবত্তর-এতখানি প্রবলতা তাঁর এই বিশ্বাসে বিদ্যমান যে, আপাতদৃষ্টিতে যে-সব মনে হয় অদ্ভুত খেয়াল-খুশী সে সবকেও মহত্তর মর্যাদা দিতে তাঁর বাধে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর 'আলেয়া' নাটক। নরনারীর প্রেমের সম্বন্ধের যথার্থ নিরূপণ এ-ক্ষেত্রে তাঁর একটি সমস্যা। অবশ্য তীব্র সমস্যা নয়। সমাধান এই দাঁড়ালো যে, কার মন যে কখন কোন দিকে ঝুঁকে পড়বে তার কিছুই ঠিক-ঠিকানা নেই। আরো একটি সমাধান দাঁড়ালো যে, শক্তিমান জীবন ভোগ করে যাবেন, সে-ভোগ যদি অন্যের জন্যে হয় দুর্ভোগ তবু চলবে তাঁর ভোগের অভিযান। কথাটি যে আপত্তিকর কবি সে-বিষয়ে সজাগ, কিন্তু এই বলে' তিনি কথাটি চুকিয়ে দিচ্ছেন যে, যৌবন বেগের এইত ধারা। বলা বাহুল্য যে-সমস্যার অবতারণা কবি করেছিলেন তার কোনো ভালো সমাধান তিনি দিতে পারলেন না ভোগের পথও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কিন্তু সমস্ত অকৃতকার্যতার মধ্যে কবি এ বিষয়ে আশ্চর্যভাবে কৃতকার্য হলেন। সহজ সরল কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করতে পারলেন, জীবন তাঁর কাছে মধুময়; আরো ঘোষণা করতে পারলেন এত সুষমাময় চমৎকারিত্বময় যে জীবন তার মায়ায় চিত্ত তাঁর বন্দী হয়ে পড়েছে না, ভুল-ভ্রান্তি, ভোগ দুর্ভোগ, সমস্তের ভিতর দিয়ে চলেছেন তিনি সামনের দিকে একালের জীবন-বাদ ও গতি-বাদের যাঁরা শ্রেষ্ঠ কবি, যেমন Walt Whitman ও রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের বাণীর সঙ্গে তুলনায় নজরুলের বাণীর ত্রুটি অনেকক্ষেত্রে চোখে পড়ে; কিন্তু সেই সঙ্গেই চোখে পড়ে বাণীর ত্রুটি তাঁতে যতই থাকুক জীবনের উপলব্ধি তাঁর সুগভীর। তাঁর বিখ্যাত কবিতা-সমষ্টি "সাম্যবাদী" সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে। এতে তাঁর যুক্তিতর্ক যেমন প্রচুর তেমনি দুর্বল। কিন্তু সে-সবের মধ্য দিয়ে যে বেদনাময় চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে তা পরম শ্রদ্ধার্হ।

নজরুলের কবি প্রকৃতি সম্বন্ধে আরো একটি বড় ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। নজরুলের ভিতরে তারুণ্য চমৎকার, জীবনের আনন্দ তিনি সহজভাবে অনুভব করতে পারেন, নানা দিকে তিনি একজন সহজ মানুষ এ-সবের কিছুই মিথ্যা নয়। কিন্তু এই সঙ্গে এ-কথাও আছে যে, অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। তাঁর এই পরম প্রিয় গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। তাঁর এই পরম প্রিয় তত্ত্বের নাম দেওয়া যেতে পারে লীলাবাদ-ইংরেজিতে যা সাধারণত Pantheism নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য শেষ পর্যন্ত নেই-ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতন, সব কিছুই ভগবানের লীলা। এই তত্ত্বকে বলা যায় একই সঙ্গে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। হিন্দু-

www.nagorikpathagar.org

চিন্তার এটি যে মর্মকথা তা না বললেও চলে, সুফী-চিন্তারও এটি মর্মকথা-এক-হিসাবে প্রাচীনকালের ভাবুকদের এটি পরম আশ্রয়। এই হিন্দু-মুসলমানের মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গির দিনেও নজরুল যে অবলীলাক্রমে শ্যামাসঙ্গীত ও বৃন্দাবন গাথা রচনা করে চলেছেন, তৌহীদেরও (একেশ্বর-তত্ত্বের) শক্তিশালী ব্যাখ্যা দিতে পারছেন, তার রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর এই মূল বিশ্বাসের ভিতরে। কিন্তু এই বিশ্বাস যে তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে কিঞ্চিত বিঘ্নও ঘটিয়েছে সেইটিই আমাদের প্রধান বক্তব্য। কবিদের অথবা শিল্পীদের কেউই হয়ত সর্বপ্রকারে 'বিশ্বাস বর্জিত নন, কিন্তু তাঁদের বিশেষত্ব এই যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনার যথার্থ উপলব্ধির আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁদের থাকে–সেই উপলব্ধির সময়ে তাঁরা যেন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষবর্জিত ও অপূর্বভাবে সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠেন।

এই যে পূর্ণ আত্মবিস্মরণ ও বিষয়-নিষ্ঠতা এটি নজরুলের পক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ মুহূর্তেও প্রায় অসম্ভব হয়েছে লীলাবাদে তাঁর অপরিসীম আনন্দের জন্যে। এই লীলাবাদ তাঁর জন্য এক ধরনের আত্মবিস্মৃতি এনে দিয়েছে, তাঁকে আশ্চর্যভাবে নিরহঙ্কার ও সৌন্দর্য পিপাসু করেছে, কিন্তু কবিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে এটি এই বাধা উপস্থিত করেছে যে এর ফলে বর্হিমুখী না হয়ে অন্তর্মুখী তিনি হয়েছেন অনেক বেশি; রূপ বৈচিত্র অঙ্কনের চাইতে Type বা প্রতীক সৃষ্টির দিকে তাঁর মন ঝুঁকেছে।

"বিদ্রোহী" কবিতাটি সম্পর্কে আরো একটু আলোচনা হয়ত অসঙ্গত নয়। প্রাক 'বিদ্রোহী' ও 'বিদ্রোহী' যুগের পার্থক্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'বিদ্রোহী'তেই দুইটি ধারা-এক দিকে তাঁর অন্তরে জাগে অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়, অন্যদিকে তিনি নিজেকে জ্ঞান করেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে দুঃস্থ মানবতার অগ্রনায়ক।

এর 'বিদ্রোহী' নামকরণ সঙ্গত হয়েছে বলা যায়, কেননা হঠাৎ যে গভীর উন্মাদনা কবির অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে তা গতানুগতিকার বিরুদ্ধে এর তীব্র বিদ্রোহই বটে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে এ এক অপূর্ব উন্মাদনারই কবিতা, কোনো বিদ্রোহীবাণী এতে বিঘোষিত হয়নি। এর যে বিখ্যাত চরণ আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন এটিও ঠিক বিদ্রোহ-বাণী নয় বরং এক হিসাবে গভীর ঈশ্বর-নির্ভরতার বাণী। এ সম্পর্কে তাঁর এই কালেরই রচনা 'দুর্দিনের যাত্রী'র এই কথাগুলো অর্থপূর্ণ :

এমন যার কোনো গুরু বা বিধাতা নেই যাকে ভয় বা ভক্তি করে' সে নিজের আত্মাকে ফাঁকি দেয় শুধু সেই সত্য স্বাধীন, মুক্ত স্বাধীন। এই অহম-জ্ঞান আত্মজ্ঞান-অহঙ্কার-নয়, এ হচ্ছে আপনার ওপর নিজের বিপুল শক্তির ওপর অটল বিরাট বিশ্বাস।

অন্যত্র :

......'যার অন্তরে আপন সত্য আপন ভগবান সহজে জাগে না তাদের ভগবান এমনি করে বুকে লাথি খেয়ে তাবে জাগে।'

অন্যত্র :

.....'বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই-কল্যাণ আসবেই।

www.nagorikpathagar.org

দুর্বল, এমন কি অনাবশ্যক, চরণ থেকে 'বিদ্রোহী' মুক্ত নয়। এ ক্রটি মারাত্মক। কিন্তু এত ক্রটি সত্ত্বেও বাংলা কাব্যে 'বিদ্রোহী'র জন্য যে একটি সম্মানিত স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে তা নিঃসন্দেহ। সমস্ত অদ্ভুতত্ব সত্ত্বেও এর উন্মাদনা অপূর্বভাবে প্রাণপূর্ণ।

যে-লীলাবাদে 'বিশ্বাস কবির মজ্জাগত বলেছি, তারও সঙ্গে আমাদের প্রথম স্পষ্ট পরিচয় হচ্ছে এতে, বিশেষ করে' এই এই সব চরণে-

জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ
স্বর্গ পাতাল মর্ত।
আমি উন্মাদ আমি উন্মাদ-
আমি চিনেছি আমারে আজিকে আমার
খুলিয়া গিয়েছে সব বাঁধ।

'বিদ্রোহী' তে কবির ঈশ্বর-বিদ্রোহ প্রকাশ পায়নি বটে, কিন্তু এর পরের 'ধুমকেতু' কবিতায় সে-বিদ্রোহ পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছে-

জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে হয়নি যাহাও হবে তাও,
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি...............
ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, রাশিয়ার সাম্যবাদের দিকে কবি এখানে বিশেষভাবে ঝুঁকেছেন বোধ হয় তাঁর এই সময়ের প্রধান বন্ধু কমরেড মুজাফফর আহমদের প্রভাবে। তাঁর 'বিদ্রোহী' যুগের প্রায় সমস্ত কবিতায় এই সাম্যবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু পুরোপুরি সাম্যবাদী নজরুল কখনো হননি, হলে তাঁর এই সাম্যবাদ প্রচারের দিনে 'খালেদ' 'ওমর' 'জগলুল' প্রভৃতি প্যান ইসলামী ভাবের কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না। সাম্যবাদের প্রভাবে তাঁর ভিতরে ঘনীভূত হয়েছে দুঃস্থ ও বঞ্চিত মানবতার জন্য তাঁর দরদ। তাঁর ঈশ্বর-দ্রোহ মানব সমাজের দুর্বল ন্যায়-অন্যায়-বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-অভিমানের ভঙ্গিতে; তার বেশি কিছু বলে' মনে হয় না।

তৃতীয় স্তর

'বিদ্রোহী' -যুগ নজরুল সাহিত্যের আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে এই যুগের রচনা। কিন্তু এই যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই 'বিদ্রোহী' যুগের উদ্দীপনা পূর্ণ-পরিণতি লাভ করবার পূর্বেই বিস্মিত দেশবাসী তাঁর কণ্ঠে শুনতে পেলো 'বাঁগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল' অথবা 'আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদি' ইত্যাদি গজল।

'বিদ্রোহী' -যুগ নজরুলের জন্য জনপ্রিয়তা আনলেও তাঁর কাব্য সাধনা ব্যাপক সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর গানে, এ বিষয়ে বাংলার কাব্যরসিকরা বোধ হয় একমত। রেখাপাতের যে অপরিচ্ছন্নতা 'বিদ্রোহী'- যুগের অনেক রচনায় লক্ষ্য করা গেছে, তা যে

www.nagorikpathagar.org

'গানে'র যুগে প্রায় অর্ন্তহিত হয়েছে, শুধু অনবদ্য চরণ নয় অনবদ্য কবিতা তাঁর কলম থেকে উৎরেছে, তা মিথ্যা নয়। তাঁর রচিত গান সম্বন্ধে একটি উপভোগ্য রচনা তাঁর 'বুলবুল সঙ্গীত-গ্রন্থের ভূমিকা রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। লেখক তাতে নজরুলের অনেক চরণের সৌন্দর্য সমন্ধে যে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছে তা সমর্থনযোগ্য। শুধু একটি ব্যাপার তিনি লেখানে লক্ষ্য করেন নি, সেটি এই যে, নজরুলের এই সব সুন্দর প্রেমের কবিতা সংখ্যায় কম আর শীগগিরই পুনরুক্তি দোষ তাঁকে ঘটেছে। Type বা প্রতীক সৃষ্টির দিকে তাঁর যে বিশেষ ঝোঁক তারও প্রমাণ এই সব গানে রয়েছে।

যিনি খ্যাতি লাভ করলেন বিদ্রোহী রূপে, কাব্য-লক্ষ্মীর প্রসাদ অজস্র ভাবে তিনি লাভ করলেন প্রেম-সঙ্গীতের রচয়িতা রূপে! বাংলা সাহিত্যে এ ব্যাপারটি কিন্তু নতুন নয়। বীররস, মহাকাব্য, এসব বাংলার ধাতে যেন সহ্য হয় না। মধুসূদন বিরাট আয়োজন করলেন, কিন্তু সে-চেষ্টায় বীররস যতখানি সৃষ্টি হলো তার চাইতে অনেক বেশি হলো করুণ রস। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তো নাস্তানাবুদ হলেন । রবীন্দ্রনাথ বাংলার এই ধাত বুঝে এ পথে পা দিলেন না, তবে নিজের বিরাট জীবন সাধনার গুণে অজানিতভাবে বীররসের সৃষ্টি করলেন কোনো কোনো কবিতায়- যেমন 'বর্ষশেষ'। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম রণ-দামামা আর লেফট রাইট মার্চের ধ্বনি কানে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। এর সঙ্গে তাঁর নতুন উত্তেজনা ও উন্মাদনা লাভ হলো রাশিয়ার লাল পল্টনের রণ-হুঙ্কারে। এই বিপুল উত্তেজনা ও উন্মাদনা যে তার কাব্য-প্রয়াসে ব্যর্থ হলো তা বলা যায় না, কিন্তু সার্থকতা যা লাভ হলো চেষ্টার অনুপাতে তা কম! অথচ করুণ রস, বিরহ, এ-সব বাংলায় জমে' ওঠে যেন সহজে। সেকালে চণ্ডীদাস অমর বিরহ-গাথা রচনা করে গেছেন, বাংলার মাঠে বাটে আজো তার ধুয়া শোনা যায়। এর কারণ মনে হয় বাংলার বিশেষ জীবন-ধারা। বৃহত্তর জীবন সৃষ্টির চেষ্টা বাংলার যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু কেমন করে' যেন সে-সব শেষ পর্যন্ত জমে' ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত বাঙালির অবলম্বন হয়েছে তার নগণ্য গৃহ, তার বহতা নদী, তার সবুজ গাছপালা, ফসল ক্ষেত আর নীল আকাশ, আর তার প্রেমময়ী নারী। এই পরিবেষ্টনে আর মহাকাব্য যদি না জমে তবে দুঃখ করা চলে না। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বাংলার যে আবহমান প্রাণ-ধারা তার সঙ্গে নজরুলের যোগ আশ্চর্যভাবে নিবিড়।

নজরুল যে প্রেম-সঙ্গীত রচনা করেছেন তা বুঝতে গেলে সহজেই চোখে পড়ে, তাঁর 'বাধন-হারা' পত্রোপন্যাসে তাঁর প্রথম জীবনের যে ব্যর্থ প্রেমের ছবি তিনি অঙ্কিত করেছিলেন সেইটিই হয়ে রয়েছে তাঁর সারা জীবনের ধুয়া। কিন্তু তাঁর প্রেম যেমন রাধিকার 'নতুন-মন-ধন জীবন যৌবন তব পায়ে সমর্পণের প্রেম নয়, তাঁর বিহরও তেমনি রাধিকার বুক-ভাঙা বিরহ নয়। যে-বিরহচ্ছবি তাঁকে মুগ্ধ করেছে সেটি সংসার অনভিজ্ঞ, অবুঝ, কিশোর-কিশোরীর বিরহ। এ বিরহে তাদের জীবন যে ব্যর্থতায় তিক্ত হয়ে উঠেছে ঠিক তা নয়, হয়ত দৈনন্দিন জীবন তাদের চলেই যাচ্ছে, কিন্তু এ বিরহ বোধ তাদের জন্য হয়েছে যেন জীবনের এক অতুলীয় অভিজ্ঞতা-জীবন যেন পরম সমৃদ্ধ হয়েছে এই বিরহের

www.nagorikpathagar.org

স্পর্শমণির ছোঁয়ায়। ভাব-বিলাসিতা বলে' এই বিরহ-ছবি আজকের মতো এতখানি মনোরম না-ও হতে পারে; কিন্তু এই সত্য যে কবির সমসাময়িকেরা কবির এই বিরহ-সঙ্গীত নিবিড়ভাবে উপভোগ করেছেন ও করছেন; এই প্রভাব বাংলার সমসাময়িক গানের উপরেও অসামান্য।

এইসব প্রেমসঙ্গীত রচনার সঙ্গে সঙ্গে নজরুল ইসলামী সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনায় মন দেন। ইসলামী সঙ্গীতের অধিকাংশ প্রচলিত উর্দু গজল ও 'নাতিয়া'র (প্রশস্তি) ভঙ্গিতে রচিত। কবির নিজের কাছে এই সব সঙ্গীত যথেষ্ট মূল্যবান, কেননা এই সব সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই বাংলার মুসলিম জনসাধারণের চিত্তের তিনি প্রবেশ পথ পেয়েছেন। মুসলিম জনসাধারণও এতে যে কিছু প্রীত না হয়েছে তা নয়। কিন্তু আমরা এ-বিষয়ে কবির সঙ্গে একমত হতে নারাজ। এক শ্রেণীর সুফীর যে উৎকট গুরুভক্তি, মুখ্যত তাই রূপ পেয়েছে এই সব গানে। ভাব বিলাসিতাও এ-সবে প্রচুর। কিন্তু মনে হয়, ধর্ম সম্পর্কে এই ভাব-বিলাসিতার দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এর চাইতে হজরত মোহাম্মদের সবল কাণ্ডজ্ঞান, চরিত্র মাহাত্ম্য, এ-সব কেন্দ্র করে যদি গান রচনা সম্ভবপর হতো তবে তার সার্থকতা হতো অনেক বেশি। ইসলাম এক হিসাবে ধর্ম-জগতে এক বিদ্রোহের সূচনা করেছে প্রতীক-চর্চায় আপত্তি জানিয়ে; আর বিদ্রোহী যে তার সত্যকার মহিমা নিরন্তর বিদ্রোহে।

ইসলামী সঙ্গীতের চাইতে শ্যামাসঙ্গীত রচনায় নজরুল সার্থকতা অর্জন করেছেন অনেক বেশি। বাংলার শ্যামাসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবের বস্তু, বিশেষ করে' রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত। কিন্তু বাংলার প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতে একটা বিশিষ্টতা ফুটেছে। কাব্যে রূপ বর্ণনা একই সঙ্গে রূপ ও অরূপের বর্ণনা। কিন্তু অধিকাংশ শ্যামাসঙ্গীতে-যেমন অনেক ধর্ম সঙ্গীতে রূপ স্থূল হয়ে উঠেছে, অরূপের মহিমা ক্ষুণ্ন হয়েছে বড় বেশি। কিন্তু নজরুলের কোনো কোনো শ্যামাসঙ্গীতে উপভোগ্য কবিতা হয়েছে।

বৈষ্ণব সঙ্গীতে শ্যামাসঙ্গীতের মতো সাফল্য সাধারণত নজরুলের লাভ হয়নি। তার কারণ বোধ হয় তাঁর অনুভূত প্রেমের চাঞ্চল্য। বৈষ্ণব পদকর্তারা এক্ষেত্রে এত বড় সাফল্য অর্জন করে গেছেন যে, তাঁদের পরে তাঁদেরই ভঙ্গিতে তাঁদের সেই গান জমানো সুকঠিন। কিন্তু সম্প্রতি নজরুল যে অনুভূতির ভিতর দিয়ে চলেছেন তার ফলে তাঁর এখনকার বৈষ্ণব সঙ্গীত অপরিসীম মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর সম্প্রতি রচিত "অভিসার" সঙ্গীত-সমষ্টি।[২৭] প্রেমের চাঞ্চল্য, দেহ, চেতনা, এ-সব আশ্চর্য ভঙ্গিতে উঠে গেছে এক উন্নততর স্তরে। তাঁর এখনকার প্রেমের গান পূর্ণ আত্মনিবেদনের গান হয়ে উঠেছে, এবং মনে হয়, তাঁর পূর্বের অনেক শ্রেষ্ঠ প্রেমসঙ্গীত তাঁর এখনকার ভাবধারার আলোকে নূতন মহিমা লাভ করেছে।

---

২৭. কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

তবে তাঁর আধুনিক জীবনের পরিণতি কোথায়, বলা সোজা নয়। এর ফলে তাঁর কবি জীবনের অবসান ঘটাও বিচিত্র নয়- যে তাত্ত্বিকতা তাঁর জীবনের মর্মমূলে আমরা দেখেছি তাই হয়ত জয়ী হবে পূর্ণভাবে। অথবা, এর ফলে সমৃদ্ধতর চিত্ত তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি নিয়ে তিনি নূতন করে জীবনে ও সাহিত্যে প্রবেশ করতে পারেন।

কবি নিঃসঙ্গ নন- কোনো সমাজের বা জাতির তিনি প্রতিনিধি। নজরুল এ যুগের বাঙালি জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রধানত জড়তার বিরুদ্ধে বারবার সংগ্রাম ঘোষণা করে' ও নির্যাতিত জনসাধারণের পক্ষ সমর্থন করে'; আর মুসলমান-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের মন নব নব আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করে', বিশেষ করে' বাংলার বা ভারতের আবহমান প্রাণ ধারার সঙ্গে তাদের প্রেমের নিবিড় যোগ স্থাপন করবার আহ্বান জানিয়ে।

কবি একই সঙ্গে জ্ঞানী ও প্রেমিক। জ্ঞানী যদি তিনি কিছু কম হন তবু খুব ক্ষতি হয় না, কিন্তু প্রেমিক হওয়া চাই তাঁর পুরোপুরি। সেই প্রেমের সাধনাই মুখ্যত নজরুলের সাধনা হয়েছে। দেশ ও জাতির প্রতি সেই প্রেমে সেই পূর্ণ আত্মনিবেদনে নজরুলের এ কালে মুসলমানদের মধ্যে অথবা হিন্দু-মুসলমান সবার মধ্যে, এক সম্মানিত ব্যক্তি -যে বৃহৎ জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের চেতনা দেশে অনুভূত হয়েছে তাতে তাঁরও প্রতিভার স্পর্শ লেগেছে। এই জনজাগরণের দিক দিয়ে দেখলে সহজেই চোখে পড়ে নজরুলের ঐতিহাসিক মর্যাদা কত বড়।

১৩৪৮

মুসলমানের পরিচয়

স্যার সুরেন্দ্রনাথ তাঁর A Nation in Making গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সূচনা স্বদেশী আন্দোলন থেকে, তার পূর্বে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক মধুর ছিলো। এ-ধারণা শুধু স্যার সুরেন্দ্রনাথের নয়, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির। এর বিশেষ অর্থের আলোচনা আমরা তৃতীয় বক্তৃতায় করবো। আপাতত বলা যায়, কোনো কোনো অর্থে একথা সত্য, যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "বিচ্ছিন্ন জিনিস জড়ের মত পড়িয়া থাকিলে তবু টিকিয়া থাকে, কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে; তাহার অন্তরের সমস্ত দুর্বলতা নানা মূর্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়।"[২৮] স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে-রাজনৈতিক স্বার্থ-বোধ দেশে জাগলো তার ফলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ উত্তরোত্তর প্রবল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

---

২৮. দ্রঃ 'পথ ও পাথেয়'

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে এ দেশে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ মধুর ছিল ঐতিহাসিক সাক্ষ্য তার বিরুদ্ধে। এমন কি, দেশের এই দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ শুধু অপরিচয়ের সম্বন্ধ ছিল এও বলা যায় না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরিদপুরে ও যশোরে মুসলমান চাষী ও নমঃশূদ্রদের ভিতরে দীর্ঘকালব্যাপী একাধিক দাঙ্গা হয়েছিল, তাতে সেই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানদের অনেকে দুই পক্ষে যোগ দিয়েছিল।[২৯] মোঘল শাসনের শেষভাগে গুজরাটে ও কাশ্মীরে যে দুটি ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল বিখ্যাত ইতিহাস 'সিয়ারুল মোতা'আখেরী'ন- এ তার উল্লেখ আছে এইভাবে :

সম্রাট ফেরোখশিয়ারের সিংহাসনারোহণের বৎসরে আহমদাবাদে এক হিন্দু গৃহস্থ হোলির সময়ে তার বাড়ির উঠানে হোলি জ্বালালে। তখন হোলির সময়ে বিষম মাতামাতি হতো। আঙিনা-সংলগ্ন ও আঙিনার অতি অল্প অংশের অধিকারী মুসলমান গৃহস্থেরা তাতে আপত্তি করলো। হিন্দু গৃহস্থ সে আপত্তি শুনলেন না, বল্লে প্রত্যেকের তার নিজের বাড়িতে সর্বময় কর্তৃত্ব আছে। পরের দিন পড়লো হজরত মোহাম্মদের মৃত্যু-বার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যে মুসলমান গৃহস্থেরা একটি গরু কিনে এনে সেই আঙিনায় জবাই করলে। এতে সেই অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু উৎক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করলে মুসলমানেরা পালিয়ে যে যার বাড়িতে আশ্রয় নিলে। তখন সেই উৎক্ষিপ্ত হিন্দু জনতা গোহত্যাকারী কশাইয়ের সন্ধান করলে; তাকে না পেয়ে তার চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছেলেকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই গোহত্যার স্থানে বলি দিলে। তখন শহরের সমস্ত বিক্ষুব্ধ মুসলমান ও আফগান সৈন্য কাজীর বাড়ি উপস্থিত হলো। কাজী জানতেন শাসনকর্তা দায়ুদ খাঁ পণী এ ব্যাপারে হিন্দুদের পক্ষ নিয়েছেন, তিনি এদের মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা উত্তেজিত হয়ে কাজীর বাড়ির সদর দরজা ভাঙলে—হয়তো কাজীরই গোপন ইঙ্গিতে—ও তারপরে আরম্ভ করলে শহরের হিন্দুদোকানে আগুন দিতে। অচিরেই কাপূর চাঁদ নামক একজন রত্ন-বণিক লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের বাধা দিলে। কয়েকদিন এভাবে গণ্ডগোল চললো। শেষে শাসনকর্তা মুসলমানদেরই বেশি দোষী সাব্যস্ত করলেন।

কাশ্মীরের দাঙ্গাটি এর কিছুকাল পরে ঘটে। সেখানকার আব্দুল নবী ওরফে মাহাতাবী ভয়ানক হিন্দু-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। এই অরাজকতার কালে একদল ভবঘুরে উচ্ছৃঙ্খল মুসলমান জুটিয়ে তাদের নেতা হয়ে সে স্থানীয় শাসনকর্তা ও কাজীর কাছে এই প্রস্তাব করলে যে এর পরে হিন্দুদের আর কোনো সম্ভ্রমসূচক যান-বাহন বা বস্ত্রাদি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না; বাগান ও স্নানের ঘাটও তাদের জন্য নিষিদ্ধ হবে। সহকারী-শাসনকর্তা ও কাজী বললেন, মহামান্য বাদশাহের যা হুকুম তাই-ই কাশ্মীরে চলবে। বলা বাহুল্য এতে মাহাতাবী খাঁ সন্তুষ্ট হলো না। এর পর তার কাজ হলো সুবিধা পেলেই হিন্দুদের আক্রমণ করা ও তাদের উপর অত্যাচার করা। একদিন সাহাব রায় নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত হিন্দু এক

২৯. ফিরোজাবাদের দাঙ্গার তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতেও এই ধরনের দাঙ্গা সেখানে হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

বাগানে উৎসব করছিলেন। সেই নিরপরাধ লোকদের উপর সে তার দলবল নিয়ে হামলা করলে এবং যত পারলে খুন জখম করলে। সাহাব রায় পালিয়ে সহকারী-শাসনকর্তার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। তাঁর বাড়ি এই মাহাতাবী খাঁর দল ইচ্ছামত লুটতরাজ করলে সেই অঞ্চলে কোনো হিন্দুবাড়ি বাদ গেল না। এই সব বাড়িতে আগুন দেওয়াও চললো। যে সমস্ত মুসলমান এই হতভাগ্যদের জন্য দুকথা বলতে এলেন তারাও খুন জখম হলেন। এই মাহাতাবী খার দলের সঙ্গে কাশ্মীরের রাজপুরুষেরা এঁটে উঠতে পারলেন না, তাঁরা পালিয়ে গেলেন। তাঁদের আশ্রিত হিন্দুদের উপরে তখন হলো অকথ্য অত্যাচার। জয়ী হয়ে মাহাতাবী খাঁ স্থানীয় মসজিদে নিজেকে "দিনদার খাঁ" (ধর্মরক্ষক) বলে' ঘোষণা করলে ও শাসনকাজ চালাতে লাগলো। রাজপুরুষদের একজনের চক্রান্তে মাহাতাবী ও তার দুই শিশুপুত্র নিহত হলে তার দল উৎকট হত্যাকাণ্ড চালালে। প্রায় তিন হাজার লোক তাদের হাতে মারা পড়লো— তার অধিকাংশই মোঘল। কয়েক মাস ধরে' এই দাঙ্গা চলে।

শেষের এই ঘটনাটি "সয়ারুল মোতা' আখেরীন" এর লেখক বলেছেন একদল শয়তানের কাজ। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ যাঁরা বুঝতে চান তাঁদের জন্য সেখানের এই দুটি ঘটনাই খুব অর্থপূর্ণ। একালের কলকাতা, ঢাকা, কানপুর, চাঁটগা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সঙ্গে এসবের আশ্চর্য মিল রয়েছে।

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের মূল কারণ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন— The Muhammadan is a bully and the Hindu is a coward মুসলমান গুন্ডা আর হিন্দু কাপুরুষ। এই কথাই কেউ কেউ তত্ত্বের ভাষায় বলেছেন মুসলমান রাজসিক, হিন্দু সাত্তিক, তবে দুই-ই কিছু কিছু বিকৃত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রকৃতির ভেদ আছে; তাও সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এমন স্পষ্ট ভেদ আছে কি না সন্দেহ। সে-ক্ষেত্রে দুটি বিরাট ধর্ম-সম্প্রদায়কে মানস প্রকিতর দিক থেকে স্পষ্ট দুইভাগে ভাগ করবার চেষ্টা বিপত্তি ঢের। বাস্তবিক, কি সেকালের দাঙ্গা কি একালের দাঙ্গা কোনোখানেই হিন্দুর শুধু কাপুরুষতার মুসলমানের শুধু জঙ্গবাহুদুরীর পরিচয়ই যে আছে তা নয়। কোনো কোনো শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের ভিতর কিছু পার্থক্য থাকলেও এই দুই বিরাট সমাজের ভিতরে আশ্চর্য কোনো পার্থক্য যে নেই তার প্রমাণ স্বরূপ এই কটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে :

প্রথমত, গুন্ডার ভাব দুপক্ষের প্রকৃতিতেই আছে, কেননা নৃশংসতার পরিচয় কোনো পক্ষে কম নেই, দাঙ্গায় আগ্রহী হবার অপরাধ থেকেও কোনো পক্ষ মুক্ত নয়; ভীরুতাও দুই পক্ষেই আছে। ঢাকার দাঙ্গায় দেখেছি হিন্দুরা মুসলমানের ভয়ে পালিয়েছে, মুসলমান-বস্তি সারারাত জেগে কাটিয়েছে এই ভয়ে যে কখন হিন্দুরা এসে ঘর জ্বালিয়ে দেবে। দ্বিতীয়ত, যাঁরা বলেন, ভারত বিশেষভাবে অহিংসার ও পরধর্মপ্রীতির দেশ তাঁদের দৃষ্টি এই ঐতিহাসিক ব্যাপারের দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত—

www.nagorikpathagar.org

(ক) হিন্দু ও বৌদ্ধের বিরোধিতায় বৌদ্ধ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, বৌদ্ধদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছিল কোনো কোনো খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের এই মত,[৩০] বৌদ্ধদের যে একটি বিরাট সংস্কৃতি ছিল একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মনীষী আলবেরুনী তাঁর ব্রাহ্মণ আচার্যদের কাছ থেকে সে-সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ পাননি।

(খ) যদি চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ও বৌদ্ধজাতক ভারতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য মনে করা না হয় তবে বলা যায়, স্বজন-শোণিত রঞ্জিত সিংহাসন শুধু পাঠান ও মোঘল ভারতের বিশেষত্ব নয়, হয়ত ভারতের বিশেষত্ব। তৃতীয়ত, মুসলমানের ইতিহাস হিন্দুর মতন দীর্ঘ না হলেও কম দীর্ঘ নয়, ঘটনাবহুল তো বটেই। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও নাস্তিক্য, একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ, একান্ত দৈবানুগত্য ও একান্ত পুরুষকার-বাদ, একান্ত শাস্ত্রানুগত্য ও একান্ত মুক্তবুদ্ধিপ্রবণতা, প্রেম ও অহিংসা এবং সংকীর্ণ দৃষ্টি ও পরধর্ম বিদ্বেষ এর কিছুই হিন্দু ও মুসলমান কারো ইতিহাসে দুর্লভ নয়। আর সব চাইতে বড় কথা এই— দুই সম্প্রদায়ই জীবন্ত, কারো অভিব্যক্তি থেমে যায় নি।

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের কারণ কি সোজাসুজিভাবে এই দুরূহ প্রশ্নের সম্মুখীন না হওয়াই ভাল। তার পরিবর্তে মুখ্যত তাদের বর্তমান চিন্তা-ভাবনার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে এ-বিরোধ মীমাংসার অন্তত এ বিরোধে অভিভূত না হবার, কিছু শক্তি আমাদের লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। মুসলমান কম পরিচিত, সেজন্য তার পরিচয় আগে নেবার দরকার। কিন্তু তার একালের পরিচয় লাভের জন্যও অল্প-বিস্তর পূর্বাভাসের প্রয়োজন।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা মোহাম্মদের প্রচারক-জীবন সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করে দেখেন— মক্কার জীবন ও মদিনার জীবন। তাঁরা বলেন মক্কার জীবনে তিনি ছিলেন ধর্ম প্রচারক—অন্যান্য ধর্ম প্রচারকের মতো সত্যদ্রষ্টা মানব-প্রেমিক নীতির প্রবর্তক। এ সব বিশেষণ তখন তাঁর জন্য শোভন; কিন্তু মদিনার জীবনে তিনি বিজয়ী বীর ও রাষ্ট্রের অধিনায়ক। অপরপক্ষে মুসলমান চিন্তাশীলেরা তাঁর মদিনার জীবনকেই বেশি মর্যাদা দেন, কেননা মুসলমান-মণ্ডলী তাঁদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন নির্দেশ তাঁর মদিনার জীবন থেকেই লাভ করে আসছেন। এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে রয়েছে দুই রকমের ভুল। অমুসলমান দলের ভুল— তাঁরা ধর্ম বলতে প্রধানত প্রাচীন আচার্যদের জীবনাদর্শ ও মতামতই বোঝেন; কোনো নূতন আদর্শ ও মত হজরত মোহাম্মদের জীবনের ও সাধনায় রূপ লাভ করেছে কিনা সে-কথাটি বুঝে দেখবার মতো ধৈর্যের ও বিনয়ের তাঁদের অভাব। আর মুসলমান দলের ভুল—যাঁকে তাঁরা ধর্মগুরু জ্ঞান করেছেন তাঁর সব কাজই তাঁরা মনে করে বিচারের অতীত।

---

৩০. ভারতীয় বিশেষজ্ঞ শ্যাম শাস্ত্রীর মতে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের কৌশলে পর্যুদস্ত করেছিল বলে নয়। "ঋশমফর্লধমভ মত অভঢধটভ মেফধডহ" দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

যাই হোক, হজরত মোহাম্মদের মদিনার জীবনের প্রভাবেই মুসলমান জগৎ গড়ে উঠেছে। সেই জীবনের ভূমিকা হচ্ছে মুসলমান মণ্ডলীর প্রতি পৌত্তলিক ও ইহুদি আরবদের নির্মম শত্রুতা যার জন্য নায়কের একান্ত অনুবর্তিতা, একচিত্ততা বিপক্ষের প্রতি সন্দেহশীলতা, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের জন্য অবশ্যকাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যারা বলেন, মদিনার মোহাম্মদ মুখ্যত রাষ্ট্রনেতা, তাঁরা এই বড় ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে ভুলে যান যে তাঁর জীবনের এই কালে তাঁর প্রেরণা-লব্ধ কোরআনে যে-সব নির্দেশ প্রকাশ পেয়েছে আর মুসলমান সমাজে সে-সবের যে-রূপ লাভ হয়েছে তা তাঁর শিক্ষার চিরন্তন রূপ না বলে সাময়িক রূপও বলা যেতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মদিনায় অবতীর্ণ একটি "সুরা'র শেষে বলা হয়েছে— "হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহর রোষে যারা পতিত হয়েছে সেই দলের লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না (৬০:১৩)। টীকাকার বলেছেন, এখানে ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে। সমসাময়িক মুসলমানেরা হত এই কথাই ভাল করে' বুঝেছিলেন এবং তাঁদের অনুবর্তিতায় পরবর্তী মুসলমানেরা হয়ত বুঝে নিয়েছেন যারা মুসলমান-সম্প্রদায়-ভুক্ত নয় তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরআনের অনভিপ্রেত। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় এই বাক্যের সত্যকার মর্যাদা যে ক্ষুণ্ন হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। একথা স্বীকার করা যেতে পারে যে সেই দিনে মুসলমান বিশেষভাবে ধর্মপ্রাণ ছিলেন আর তাঁদের ধ্বংসকামী গর্বিত ইহুদি ধর্মপ্রাণ ছিলেন না। কিন্তু ধর্মপ্রাণতা কোনো সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়, তাই কালে কালে এমন অবস্থার উদয় সম্ভবপর যখন মুসলমান-সমাজের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বন্ধু সেই সমাজে দুর্লভ হতে পারে ও সেই সমাজের বাইরে সুলভ হতে পারে। এ সম্ভাবনার কথা মুসলমান অমুসলমান উভয়পক্ষই যে কোরআনের এই ধরনের বাণীর ব্যাখ্যাকালে বিস্মৃত হয়েছেন একে শোচনীয় না বলে উপায় নেই। তবে মুসলমানের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারায় এই স্থূল ব্যাখ্যাই একমাত্র সত্য নয়; যদিও প্রবল সত্য; মুসলমান দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরা ও ভক্তরা অনেকখানি স্বতন্ত্রভাবে কোরআন ও হজরত মোহাম্মদের জীবন বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। এর একটি দৃষ্টান্ত বড় অদ্ভুত। যে যুগে সুলতান মাহমুদ ভারতের মন্দির ধ্বংস করে' ধনরত্ন আত্মসাৎ করেছিলেন সেই যুগে ইসলামে পরম শ্রদ্ধান্বিত আলবেরুনী অশেষ যত্নে ও শ্রদ্ধায় হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান করছিলেন, তার উৎকর্ষাবকর্ষের বিচার করে' জ্ঞানীদের দরবারে উপহার দিচ্ছিলেন।

ইসলামের পরিস্ফূর্তির মূলে এই যে বিশেষ রাজনৈতিক প্রভাব একই সঙ্গে এটি ইসলামের শক্তির ও দুর্বলতার কারণ হয়েছে। শক্তির কারণ এই জন্য যে ধর্মাদর্শের সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপলাভ তার সার্থকতার জন্য একান্ত বাঞ্ছিত, নইলে তা রয়ে যায় শুধু সম্ভাব্যতার দেশের ব্যাপার। এর দৃষ্টান্ত—ইসলামে সাম্য-নীতি। অন্যান্য ধর্মাচার্যও সাম্য-নীতি প্রচার করেছিলেন, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ এই জন্য যে ধর্মাদর্শের কোন বিশেষ রূপই তার চরম রূপ নয়; আদর্শের বিকাশ আছে তার রূপেরও বিকাশ আছে; কিন্তু ধর্মাদর্শের সাধারণত কঠিন-দেহ, কোনো ধর্মাদর্শ যদি একবার কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ লাভ করে তবে তারও রূপান্তর সহজ সাধ্য হয় না। এর

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টান্ত বিপক্ষের সঙ্গে মুসলমানের সম্বন্ধ। সে-ক্ষেত্রে একবার যে তলোয়ারের সম্বন্ধ বড় হয়েছিল তারপর সে তলোয়ারকে কোষবদ্ধ করা দুঃসাধ্য হচ্ছে; যদিও হজরত মোহাম্মদের বহু কর্মের ও কোরআনে বিপক্ষের সঙ্গ সম্পর্কে প্রীতি অগ্রগণ্য হয়েছে, মুসলমান সভ্যতাও মাঝে মাঝে এর প্রকাশ মনোজ্ঞ হয়েছে।

মুসলমানের চিন্তার ইতিহাসে খুব বড় যে ব্যাপারটি চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে বিচার-বুদ্ধি ও শাস্ত্রানুগত্য এই দুইয়ের ভিতরে কঠোর সংগ্রাম, আর সে সংগ্রামে জনসাধারণের প্রাধান্য। ভারতেও বিচার-বুদ্ধি ও বেদানুগত্যের ভিতরে যে সংগ্রাম হয়েছিল তা কঠোর, কিন্তু সে সংগ্রামে জনসাধারণ হয়েছিল অনুবর্তী, নেতা নয়। এর বড় কারণ হয়ত এই যে ইসলামের বাহন হয়েছিল একটি দুর্ধর্ষ চির-স্বাধীন জাতি। বহু বিরুদ্ধতার পরে একবার তারা হয়ত মোহাম্মদের বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করেছিল; কিন্তু বিকাশোন্মুখ মানুষকে যে নানা মতবাদের কাছে বারবার নত করতে নয়, অবশ্য কৌতূহলে ও অনুরাগে, সে-কথা ভাল করে বুঝবার মতো অনুকূল অবস্থার সৃষ্টির পূর্বেই আর একটি দুর্ধর্ষ জাতি, অর্থাৎ তাতার জাতি এসে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল ইসলামের পরিচালনার। তাই ইসলামের আবির্ভাব থেকে প্রায় চারশত বৎসরের মধ্যে চিন্তার প্রভূত বৈচিত্র্য মুসলমান জগতে প্রকাশ পেলেও সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্য একাল পর্যন্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী হয়ে আছে দুটি বিষয়—কোরআন ও হজরত মোহাম্মদের বাণী, অথবা, সোজাসুজি ভাবে এই দুইয়ের অনুবর্তিতা। এর বাইরে আর একটি ব্যাপারও দীর্ঘকাল তাদের চিত্ত আকৃষ্ট করেছিল— সুফীর অধ্যাত্ম-বাদ বা অন্তর্জ্যোতিবাদ, বিরাট ব্যক্তিত্বশালী ইমাম গাজ্জালীর প্রভাবে এই মতবাদের বিস্তার ঘটে। কিন্তু শাস্ত্রানুগত্যের সঙ্গে যেভাবে যুক্ত করে' এই তত্ত্ব তিনি জনসাধারণকে দিয়েছিলেন তারই ভিতরে নিহিত হয়েছিল এর ভবিষ্যৎ অসার্থকতার বীজ। মুসলমানের চিন্তার ইতিহাসে বিচার-বুদ্ধির পরাভব ব্যাপারটি বেশ বুঝে দেখবার মতো। মুসলমান চিন্তাশীলদের তিনটি বড় দলে ভাগ করে দেখা যেতে পারে— বিচার পন্থী, মধ্য পন্থী, একান্ত শাস্ত্রানুগত্য পন্থী। বিচার-পন্থীরাও এক হিসাবে শাস্ত্রানুগত্য-পন্থী, তবে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যায় বিচার বুদ্ধির সহায়তা তাঁরা বিশেষভাবে গ্রহণ করতেন। এই দলের এক আদি ব্যক্তি আব্বাসীয় শাসনের প্রারম্ভের ইমাম আবু হানিফা। তাঁর মতানুবর্তী হানাফী দল মুসলমান জগতে, বিশেষ করে' ভারতবর্ষে, সংখ্যাগরিষ্ঠ; কিন্তু নামে হানাফী হলেও তাঁর শিষ্যদের প্রভাবে প্রায় প্রথম থেকেই তাঁরা মধ্যপন্থী অর্থাৎ শাস্ত্রানুগত্যই তাঁদের জন্য বড় কথা, তবে বিচার বুদ্ধির সাহায্য তাঁরা কখনো কখনো নেন। একান্ত শাস্ত্রানুগত্য পন্থীর দল মুসলমানের গৌরব-যুগে, যেমন আব্বাসীয় যুগে, তেমন প্রবল প্রতাপ হননি। কিন্তু এই আব্বাসীয় যুগেই বিচারপন্থীরা এই দলের নেতা ইমাম হাম্বলের উপরে যে কঠোর অত্যাচার করে তার ফলে বিচার পন্থীদের প্রতি মুসলমান জনসাধারণের ঘৃণা ও অবিশ্বাস প্রবল হবার সুযোগ পায়। এর পরে সর্বপ্রকারে যুক্তিবাদের অসারতা ইমাম গাজ্জালী যখন বিশেষ দক্ষতা সহকারে প্রতিপন্ন করলেন এবং শাস্ত্রানুগত্য ও অন্তর্জ্যোতিঃ-তত্ত্ব সত্যান্বেষীদের জন্য শ্রেয়ঃ জ্ঞান করলেন তখন বিচার-বাদ স্বভাবতঃই

www.nagorikpathagar.org

দুর্দশাগ্রস্ত হলো। ইমাম গাজ্জালীর মত খণ্ডন করে বিচার-বাদের ধ্বজা পুনর্বার উত্তোলন করতে চেষ্টা করেন স্পেনীয় দার্শনিক ইবনে রুশদ (Averroes)। কিন্তু তিনিও যুক্তিবাদ জনসাধারণের জন্য কাম্য জ্ঞান করেননি। তাঁর মতের সমাদর হয় ইহুদিদের কাছেও তাঁদের সহায়তায় ইয়োরোপে। ইয়োরোপীয় বুদ্ধির মুক্তির ইতিহাসে (Averroes) এর আসন যে গৌরবের ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা সে-কথা স্বীকার করেন। ইসলামের বিচার-বাদ এইভাবে যে সাগর-পার হয়ে গেছে তারপর তাকে ফিরিয়ে আনবার কিছু সজাগ চেষ্টা করেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ ও আমির আলি। তাঁদের পূর্বে রামমোহনের ভিতরে এই বিচার-বাদের প্রভাব বুঝতে পারা যায়।

আব্বাসীয় যুগের ইমাম হাম্বলের পরে একান্ত শাস্ত্রানুগত্য-বাদের বড় নেতা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের ইমাম ইবনে তায়মিয়া। "আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্তন-বাদকে তাঁর অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে তিনি পূর্ণাঙ্গতা দান করেন। কেবল কোরআন ও বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত হজরত মোহাম্মদের বাণী মুসলমানের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়, একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা জানানো যায়, পয়গাম্বর ইমাম সুফী এঁদের কাছে প্রার্থনা জানানো ধর্মবিরুদ্ধ— এই সব মত তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। সুফীর অন্তর্জ্যোতিঃ-তত্ত্ব তিনি আদৌ শ্রদ্ধা করতেন কি না বলা শক্ত, তবে কোরআন ও হজরত মোহাম্মদের বাণীর সহজ অর্থের একান্ত আনুগত্য তিনি মুসলমানদের জন্য যে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন এ সর্ববাদিসম্মত। তদানীন্তন সমাজের সুফী প্রাধান্যের জন্য তাঁকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল; কিন্তু জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা তিনি লাভ করেন। তাঁর অষ্টাদশ শতাব্দীর শিষ্য আবদুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর অনুবর্তিগণ এই মতবাদের প্রচারে সফলকাম হন, আবদুল ওয়াহ্হাব নাম অনুসারে এই চিন্তাধারার সাধারণ নাম হয়েছে ওয়াহ্হাবী মত। সত্য বটে পীর পূজা প্রভৃতি ওহাবী নিন্দিত কর্ম ও মত এখনো মুসলমান সমাজে লোপ পায়নি, কিন্তু এসব শাস্ত্রবিরুদ্ধ অতএব প্রশস্ত নয়, এই বাণী মুসলমান জনসাধারণের কর্ণেও প্রবেশ করেছে।

এই ওহাবী মত বা "আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্তন"—বাদ বর্তমান মুসলিম জগতে, বিশেষ করে' ভারতের মুসলমানদের মধ্যে, প্রবলতম মত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে এই মতের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পাঞ্জাবে মুসলমানদের উপরে শিখেরা অত্যাচার করে; ওহাবীরা সেখানে জেহাদ ঘোষণা করে। এই সংঘর্ষ ক্রমে ইংরেজও— ওহাবীতে বর্তে। ওহাবীদের দমন করতে ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু ওহাবী মত তখন যা ছিল এখন তার কিছু কিছু বদল হয়েছে। ভারতবর্ষ অমুসলমান রাজ্য, মুসলমান ধর্মকর্ম এখানে বাধাগ্রস্ত, এই বিবেচনায় ওহাবীরা একে "দরুল হরব' বলে ঘোষণা করে' 'দারুল হরব' এ শাসনকর্তার বিরুদ্ধে প্রয়োজন মত জেহাদ ঘোষণা করা ধর্মকর্ম।[৩১] কিন্তু এখন ভারতবর্ষকে সাধারণত "দারুল হরব" বলে গণনা করা হয় না "দারুল ইসলাম" বলা

---

৩১. Imperial Gazetter, Vol-VII, P. 437 দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

হয়, কেননা এখানে মুসলমানদের ধর্মকর্ম বাধাগ্রস্ত নয়। কাজেই ওহাবী মত এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধং দেহি ভাব পরিত্যাগ করে' (এর মতে) ভারতের তথাকথিত মুসলমানদের মুসলমানীকরণে মন দিয়েছে। তাই বাংলার সাধু-সংকল্প হিন্দু যখন দুঃখিত হয়ে বলেন মুসলমানদের চাষীরা তো আগে আমাদের পূজা আর্চায় বেশ যোগ দিত, আমাদের বাড়িতে খেতেও তাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু দিন দিন সব কেমন হয়ে যাচ্ছে—তখন তাঁর প্রতিবেশীদের ঘরের খবর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয় তিনি দেন।

এই ওহাবী মত ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এমন প্রভাব বিস্তার করলে কেন সে-কথাটি বুঝে দেখার মতো। কিন্তু বিশাল ভারতের চাইতে এই সমস্যাটি মুখ্যত বাংলাদেশে সংকীর্ণ করে' দেখাই নানা কারণে সঙ্গত মনে করি। এই সম্পর্কে বাংলার মুসলমানদের উৎপত্তি-কথার কিঞ্চিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে আদম শুমারীর রিপোর্টে মিঃ বেভেরলি (Mr. H. Beverley) বলেন, বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বাংলার হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর থেকে উদ্ভূত—ইসলামের তলোয়ারের জোরে তারা মুসলমান হয়। রিজলি সাহেব তাঁর Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহকারে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে বাংলার মুসলমান, বিশেষ করে' মুসলমান চাষী, বাংলার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বংশধর।[৫] এই মতের প্রতিবাদ করেন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি। তাঁর The Origin of the Mussalmans of Bengal গ্রন্থে (এটি তাঁর পার্শীতে লেখা "হকিকত-ই-মুসলমান-ই-বাঙ্গালা'র ইংরেজি অনুবাদ) তিনি এইভাবে এ মত খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন:

(১) তলোয়ারের জোরে এদেশে ইসলাম প্রচার হয়ে থাকলে উত্তর ভারতে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত। সেখানে মুসলমানের তলোয়ারের জোর বাংলার চাইতে কম ছিল না।

(২) বাংলার মুসলমান বাংলার উচ্চ বা নিচ কোনো স্তরের হিন্দুর বংশধর যে মুখ্যত নয় তার ঐতিহাসিক প্রমাণ এই :

(ক) "তারিখ-ই-ফেরেশতা", আবদুল কাদির বদাউনির "মনতাখাবাত্তাওয়ারিখ" প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বাংলায় মুসলমানের আগমন থেকে আরম্ভ করে নবাব সুজা খাঁর রাজত্ব কাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমান শাসকরা এদেশে মুসলমানদের বসবাসের সুবিধার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা অনেক মুসলমান পরিবারকে জায়গীর প্রভৃতি দান করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহু মুসলমান সৈন্যও এদেশে আগমন করেন।

(খ) দিল্লী রাষ্ট্রবিপ্লবের কেন্দ্রস্থল ছিল বলে অনেক মুসলমান সুদূর বাংলায় বসতি স্থাপন নিরাপদ মনে করতেন।

(গ) সম্রাট আকবর অনেক স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমানকে বাংলায় নির্বাসিত করেন।

(ঘ) সমুদ্র-পথে অনেক বিদেশী মুসলমান বাংলায় আগমন করে এবং বসতি স্থাপন করে।

(ঙ) বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরে ভাষাগত পার্থক্য আছে। দুজনেই বাংলা বলে কিন্তু ঠিক এক বাংলা নয়। মুসলমানের বাংলায় আরবী ফারসী শব্দের সংখ্যা অনেক বেশি।

(চ) রিজলি সাহেবের পদ্ধতি নির্ভুল নয়। কেননা, তিনি সব শ্রেণীর মুসলমানের নাকের মাপ নিয়ে গড় কষেননি, বেছে বেছে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের নাকের মাপ নিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

দেওয়ান সাহেবের গবেষণায় অন্তত এই কথাটি প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলায় বাংলার বাইরের মুসলমান কম আসেন নি, অবশ্য দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার কত ভাগ তা বলা শক্ত। কিন্তু তাঁর সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে এই বড় যুক্তিটি দাঁড় করানো যেতে পারে, যুক্তিটি মুসলিম-ইতিহাস-বেত্তা ঢাকার হাকিম হবিবুর রহমানের। বিজেতারা সাধারণ বিজিত দেশ থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করে থাকেন, ভারতবিজয়ী মুসলমানদের বেলায়ও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি, হিন্দুস্থানী সৈয়দ, হিন্দুস্থানী শেখ, হিন্দুস্থানী মোগল ও হিন্দুস্থানী পাঠানের উদ্ভব এইভাবে— এই তাঁর মত। এ মত যে গ্রহণযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। তাহলে দেওয়ানী সাহেব যে বাংলার মুসলমানকে হিন্দু রক্তের সংস্রবশূন্য মনে করেছেন তা আর টেকে না। এদেশের প্রাচীন মুসলমানদের স্ত্রী-গ্রহণ সম্পর্কে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার ইবনে বতুতার ভ্রমণ-কাহিনীতে আছে। মুসলমান রাজত্বের প্রায় সূচনায় তিনি এদেশে আসেন। তিনি লিখেছেন এদেশে স্ত্রীরূপে গ্রহণযোগ্য দাসী অল্প মূল্যে পাওয়া যেত, তাঁর সামনে একটি সুন্দরী যুবতী বিক্রীত হয়েছিল এক স্বর্ণ দিনারে অর্থাৎ দশ টাকায়। তিনিও প্রায় এই মূল্যে একটি অতি সুন্দরী দাসী কিনেছিলেন। অবশ্য এই সব দাসী কোন জাতীয় ছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে শুধু মুসলমানদের কণ্যাই যে এইভাবে বিক্রীত হতো তা মনে করবার হেতু নেই।

দেওয়ান সাহেব রিজলী সাহেবের মত যেভাবে খণ্ডন করতে চেয়েছেন তাও আপত্তিকর। বাংলার চাষী সম্প্রদায়ের অনেকে হিন্দুর সন্তান এই তাঁর প্রতিপাদ্য। সেক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের তিনি যদি তাঁর গবেষণার বিষয় বলে গণ্য না করে থাকেন তবে তাঁর সেই কাজটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দিক দিয়ে অসঙ্গত হয় না। অবশ্য আজকাল নাকের গঠন দিয়ে জাতি নির্ণীত হয় কি না তা নৃতত্ত্ববিদরাই ভাল জানেন।

দেওয়ান সাহেবের প্রতিপাদ্যের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি হান্টার সাহেবের গেজেটিয়ারে আছে। তিনি বলেছেন, কিছুদিন পূর্বেও বাংলার অনেক মুসলমান দুর্গা-কালী-লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা করতো।

কিন্তু হান্টার সাহেবের এই যুক্তির বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে বাংলার কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানও দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা করতেন একথা সুপ্রসিদ্ধ। এর বড় কারণ বোধ হয় এই যে ওহাবী প্রভাবের পূর্বে মুসলমানদের মানসিক অবস্থা প্রতীক চর্চার একান্ত বিরোধী ছিল না। পীরের কবরে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন, দিনক্ষণ পুরোপুরি মেনে চলা, সমাজে এক শ্রেণীর জাতিভেদ স্বীকার করা, এসব ব্যাপারে মুসলমানের মনোভাব প্রায় হিন্দুর মতোই ছিল। তাছাড়া মুসলমান লিখিত কাব্যে প্রতিমা পূজারির ভক্তি নিবেদনের সৌন্দর্য অনেকদিন থেকে বর্ণিত হয়ে আসছিল; কাব্য-কল্পনায় আর বাস্তব জীবনে ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলার চেষ্টা অনেক সময় মানুষের সমাজে হয়।

বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের ভাষাগত যে পার্থক্যের কথা দেওয়ান সাহেব এবং একালের কোনো কোনো পদস্থ মুসলমান বলেছেন সে সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে পূর্বে হিন্দুর ব্যবহৃত বাংলা ভাষায়ও আরবী ফারসী শব্দের সংখ্যা এখনকার চাইতে অনেক বেশি

www.nagorikpathagar.org

ছিল, টেকচাঁদের সাহিত্য তার এক প্রমাণ। একালে সাহিত্য যেভাবে গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে মুসলমানের চাইতে হিন্দুর যোগ অনেক বেশি বলে হিন্দুর মুখের ভাষায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

দেওয়ান সাহেব তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি খণ্ডন করতে ভুলে গেছেন। অথবা ইচ্ছা করেই সেটি তোলেন নি। সেটি এই যে অনেক মুসলমান ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে এদেশের অনেক লোক মুসলমান হয়েছিল। শ্রীহট্টের শাহজালালের প্রভাবে সেই অঞ্চলের বহু অধিবাসী যে মুসলমান হয়েছিল ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে তার উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের বেশভূষা যে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র রকমের ছিল— এখনও যেমন আছে— সে কথা সিয়ারুল মোতা' আখেরীন এর অনুবাদক প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে উল্লেখ করে গেছেন। তিনি তাদের নামে মাত্র মুসলমান বলেছেন কেননা তারা মুসলমানী রীতিনীতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের মাথায় যে টুপি নেই এটি মুসলমানের পক্ষে তিনি খুব অদ্ভুত বিবেচনা করেছেন।

দেখা যাচ্ছে দেওয়ান সাহেবের মতের বিপক্ষেই যুক্তি প্রবল। বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বাংলার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সন্তান, কি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সন্তান, সে-তর্ক অবশ্য অর্থহীন। ছোট বড় হয়, বড় ছোট হয়। কোনো একশ্রেণীর লোককে সম্ভাবনার দিক দিয়ে বড় ভাবা কুসংস্কার। তাছাড়া বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বাংলার বিশাল বৌদ্ধ-সমাজ থেকে উদ্ভূত হবার সম্ভাবনা বেশি।[৩২]

কিন্তু দেওয়ান সাহেব প্রমুখ মুসলিম স্বাতন্ত্র-বাদীদের যুক্তি অপ্রবল হলেও একথাটি মানতেই হবে যে হিন্দু ও মুসলমান চাষীদের ভিতরে চরিত্রগত পার্থক্য বিদ্যমান। হিন্দু চাষী-শ্রেণীর লোকদের চাইতে মুসলমান চাষী কম শান্ত ও কষ্টসাধ্য কাজে মাথা দিতে বেশি অগ্রসর। এর কারণ কি? হিন্দু ও মুসলমানের এ রকম পার্থক্য শত বৎসর পূর্বে রামমোহনও লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এর কারণ মাংসাহার। কিন্তু পল্লীর মুসলমান মাংস অতি অল্পই খায়। হিন্দু-মুসলমানের একালের মারামারির পর থেকে কিন্তু বাস্তবিকই তা নগণ্য। খাদ্যের দিক দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরে এতদিন বড় পার্থক্য ছিল পেঁয়াজ আর রসুনের ব্যবহারে। কিন্তু এদুটি যদি এমন মহাশক্তি হবে তবে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা দিন দিন হীনবীর্য হয়ে পড়ছেন কেন?

চিন্তা ও বিশ্বাস-আদির পার্থক্য এই চরিত্রগত পার্থক্যের প্রধান কারণ বলে মনে হয়। এমতের সমর্থন পাওয়া যায় বাংলার হিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্ন স্তরের লোকদের চরিত্রগত পার্থক্যের কথা ভাবলে। বাস্তবিকই চরিত্রগত পার্থক্য একালের বাংলার হিন্দু সমাজের এই দুই অংশের ভিতরে প্রকট হয়েছে। বহুদোষ সত্ত্বেও সে-সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের বলা যায় সাহসী ও চলন্ত-মন-বিশিষ্ট, বহুগুণ সত্ত্বেও তার নিম্ন স্তরের লোকদের বলা যায়

---

৩২. দ্রঃ 'বাংলার মুসলমানের কথা'

www.nagorikpathagar.org

সাহসী ও চলন্ত মন বিশিষ্ট বহুগুণ সত্ত্বেও তার নিম্নস্তরের লোকদের এই সব বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। হিন্দু সমাজের নানা আচার ও সংস্কারের চাপ থেকে সে-সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা কিছু অব্যাহতি পেয়েছে জ্ঞানকৃত চেষ্টায়, আর বাংলার মুসলমান সমাজের নিম্ন অংশের লোকেরা জীবনে কিছু সহজ সরল হতে পেরেছে উচ্চস্তরের লোকদের অবহেলার ফলে। বাংলার মুসলমান সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা বাংলার হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মতো কেন দিন দিন মুখ্যত আচার-ধর্মী হয়ে হয়ে পড়ছে তার উত্তর পাওয়া যাবে এই বিবরণের বহুস্থানে।

বাংলার এই মুসলমান-সমাজ, বিশেষ করে' এর সুবিশাল নিম্ন অংশ, যে অসার্থক জীবন যাপন করতো না তার পরিচয় রয়েছে সেকালের লোক-সাহিত্যে। ওহাবী প্রভাবের পূর্বে মুসলমান সমাজের উপরে প্রবল ছিল সুফী প্রভাব। মোটের উপর সেটি উদার মানবতার প্রভাব, কিন্তু আচার পরায়ণতা অলৌকিকতাপ্রীতি এসবও ছিল তার সঙ্গে যুক্ত।

এই সমাজ মানস শক্তির দিক দিয়ে তেমন সবল না হলেও ওহাবী- প্রভাবকে বাধা দিতে যে চেষ্টা না করেছে তা নয়। লালন ফকির প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান বাউলদের গানে রয়েছে সেই প্রতিবাদের ঝঙ্কার। সে-চেষ্টা সফল হয়নি কেন সে সম্বন্ধে এই কটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

(১) অলৌকিকতার উপরে সুফী ও ওহাবী দুই মতেরই শ্রদ্ধা। কাজেই ওহাবীরা যখন পরম অলৌকিক কোরআন ও হজরত মোহাম্মদের পয়গাম্বরত্বের দোহাই দিলেন মুসলমান হিসাবে তখন অপর পক্ষের প্রায় কোনো উত্তরই রইল না।

(২) অনুবর্তিতা দুইয়েরই ধর্ম। সে-ক্ষেত্রে পীরের অনুবর্তিতার চাইতে পয়গাম্বরের অনুবর্তিতার মহিমা বেশি মনে হওয়া স্বাভাবিক।

(৩) এই মুসলমান-সমাজে কদাচার যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন ইসলামের উন্নততর আচারের সামনে সেসব নতশির না হয়ে পারেনি।

কিন্তু দীর্ঘকালের জীবনধারার প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক মমতা তাকে এই সব যুক্তি জয় করতে পারতো না যদি রাজনৈতিক কারণ এর সহায় রূপে এসে না দাঁড়াত। বস্তুত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ওহাবী আন্দোলনকে এক রাজনৈতিক আন্দোলন বলেও গণ্য করা যেতে পারে— ধ্বংসশীল মুসলিম জগতের গা ঝাড়া দেবারও এক চেষ্টা। ভারতে অথবা বাংলায় রাজনৈতিক কারণ যে এর প্রভাবের মূলে তা বোঝা যায় ব্রিটিশ শাসন-কালে মুসলমানদের অবস্থার ইতিহাসের কথা ভাবলে। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই :

হিন্দু সমাজের পদস্থ ব্যক্তিদের আনুকূল্যে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনে মুসলমানেরা যে খুব বিচলিত হয় নি তা বোঝা যায় এই দুটি ব্যাপার থেকে—

১. ইংরেজের অধিকৃত বাংলায় প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলিকাতা মদ্রাসা ইংরেজের আনুকূল্যে মুসলমানদের লাভ হয়;

২. ইংরেজ শাসনের সূচনায় হিন্দু প্রধানত রাজস্ববিভাগ ও মুসলমান প্রধানত বিচার-বিভাগে নিযুক্ত থেকে জীবিকা অর্জন করতে থাকে। সেদিনে বাংলার মুসলমান যে

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে উন্নততর সম্প্রদায় ছিল রামমোহন রায় তাঁর বিলাতে সাক্ষ্যদানকালে ও হান্টার সাহেব তাঁর Indian Mussalmans গ্রন্থে সে কথা বলেছেন— "When the country passed under our Rule the Muslims were the superior race."

মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হলো দশসালা বন্দোবস্ত থেকে, আর তাদের সম্ভ্রান্তদের আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌছলো সনদ দেখাতে না পেরে যখন তাঁদের বহু নিষ্কর জমিজমা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল— ইংরেজিতে এর নাম Resumption Proceedings আর যখন আদালতের ভাষা পার্শীর পরিবর্তে ইংরেজি হলো। দশসালা বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার কেমন পরিবর্তন হলো সে সম্বন্ধে হান্টার সাহেবের উক্তির সারাংশ এই :

Muslim landlords or collectors of revenue did not directly deal with the Muslim peasants, and they employed Hindu bailiffs to collect the revenue direct from the peasantry. So the Hindus in fact formed a Subordinate Revenue Service, and took their share of the profits before passing the collection on to the muslim Superiors. The latter however were responsible to the Emperor and formed a very essential link in the Muslim fiscal system. The series of changes introduced by Lord eornwallis and Sir John Shore ending in the Permanent Settlement in 1793 put an end to this fiscal system of the Muslims.

The Permanent Settlement most seriously damaged the position of Mahomedan houses, for the whole tendency of the settlement was to acknowledge as the landlords the subordinate Hindu Officers who dealt directly with the husbandmen.

It elevated Hindu collectors, who up to that time had held but unimportant posts to the position of the landlords, gave them a proprietory right in the soil and allowed them to accumula e wealth which would have gone to the Muslims under their own Rule.[৩৩]

এসব ব্যবস্থা যে মুসলমানদের শক্তিহীন করবার জন্যই করা হয়েছিল তা মনে হয় না, রাজস্ব যাতে বেশি পাওয়া যায় ও নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায় এইই ছিল শাসকদের প্রধান

৩৩. ১০৪–৫ পৃষ্ঠায় হান্টার সাহেবের মূল বক্তব্য দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্য। কিন্তু এর ফল মুসলমানদের জন্য শোচনীয় হলো। এই সময়ে ভারতে আসে ওহাবী আন্দোলন। বাংলার ওহাবী আন্দোলন যে মুখ্যত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তা বোঝা যায় বাংলার ওহাবীনেতা তিতুমিঞার বিদ্রোহ থেকেও ঃ-

Titu belonged to the Wahhabi Sect of Muhammadan fanatics, and was excited to rebellion in 1831 by a beard-tax imposed by Hindu landholders. He collected a force of insurgents 3000 strong, and cut to pieces a detachment of Calcutta militia which was sent against him. The magistrate collected reinforcements but they were driven off the field. Eventually the insurgents were defeated by a force of regulars and their stockade was taken by assault. (Imp. Gazt. Vol. XXIV–p. 71.)

ওহাবীরা ইংরেজের হাতে যখন অনেকখানি নিস্তেজ হলো তখন ইংরেজ ও মুসলমান সম্পর্ক দাঁড়াল এই— ইংরেজ সহজেই সকল মুসলমানকে শত্রুপক্ষ ভাবলো এবং তাদের সঙ্গে ব্যবহারের সদয়তা তার পক্ষে সম্ভবপর হলো না; মুসলমানদের সবাই যে ওহাবী মতাবলম্বী হলো তা নয় কিন্তু ইংরেজের প্রতি বিরূপতা তাদের ভিতরে ব্যাপক হলো। পার্শীর পরিবর্তে ইংরেজিকে রাজভাষা করা হলে মুসলমানরা প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু প্রতিবাদের ফল না পেয়ে তারা ইংরেজি শিখতে এগোলো না। হান্টার সাহেব বলেছেন— ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক-বিবর্জিত শিক্ষা মুসলমানেরা পছন্দ করতে পারলো না। কিন্তু মুসলমানদের খুব বড় অন্যায় এই হলো যে নতুন ব্যবস্থা সম্বন্ধে না-ই তারা বললে, ভাল করে বাঁচতে হলে কোন কোন ব্যাপারে হাঁ-ও বলতে হবে সে চেতনা তাদের ভিতরে দেখা দিল না। অচিরেই তাদের অবস্থা এমন হীন হয়ে পড়লো যে সিপাহী বিদ্রোহের পরে স্যার সৈয়দ আহমদ প্রধান কর্তব্য জ্ঞান করলেন শাসকদের বিষ-দৃষ্টির পরিবর্তে প্রসন্ন দৃষ্টি মুসলমানদের জন্য লাভ করা।

মুসলমানদের দুর্গতির সঙ্গে চললো হিন্দুদের উন্নতি-চেষ্টা ও তাদের প্রতি শাসকদের আনুকূল্য। তাই ওহাবীরা যখন শান্ত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মুসলমানের ধর্ম ও সমাজের সংস্কারকরূপে এলেন তখন মুখে তাঁদের অনুবর্তিতা তেমন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত না হলেও ধীরে ধীরে এদেশের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের মনে এ ধারণা দৃঢ়মূল হওয়া বিচিত্র নয় যে ধর্মের আদিম ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া ভিন্ন ইহকাল ও পরকালের জন্য তাদের আর কি করবার থাকতে পারে। হিন্দু-সমাজের সূচিত জাগরণ এ প্রতিক্রিয়া রোধ করতে সমর্থ হলো না কেন দ্বিতীয় বক্তৃতায় তার উত্তর দিতে চেষ্টা করা হবে।

আমরা দেখলাম ওহাবী প্রভাবে এদেশের মুসলমানদের একটি বিশেষ চেতনা লাভ হলো। এ আন্দোলনে তাদের কোনো উপকার যে না হয়েছে তা নয়— এর ফলে ভাববিলাসিতা থেকে কিছু উদ্ধার তারা পেয়েছে, কিছু সঙ্ঘবদ্ধও তারা হয়েছে। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

আদর্শ হিসাবে এর দুর্বলতা এইখানে যে এ অতীতের ব্যবস্থার দিকে যাওয়াই সব চাইতে বড় কাজ মনে করে— সেই ব্যবস্থাই এর কাছে চিরন্তন ধর্ম। বলা বাহুল্য এ মত সর্বপ্রকার চিন্তার সম্প্রসারণের বিরোধী; সমস্ত রকমের নতুন পরীক্ষা সন্দেহের চোখে দেখা এর প্রকৃতি। এ মত যে উন্নতিকামী জাতীয়তাবাদী আধুনিক মুসলিম জগতে বর্জিত হচ্ছে তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতের মুসলমান একে বর্জন করতে পারছে না— তার নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে চেতনা তার এ-মতের বর্জনের পথে বাধা হচ্ছে।

এই দশা থেকে এদেশের মুসলমান কি মুক্তি পাবে? না, নানা দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এইখানেই তার দৃঢ়স্থিতি হবে! এর সদুত্তর নির্ভর করছে অনেকগুলো ব্যাপারের উপরে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তৃতায় সে-সবের আলোচনার চেষ্টা হবে।

২৬ মার্চ, ১৯৩৫

ব্যর্থতার প্রতিকার

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আমাদের সামনে যে-রূপ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাকে অবিশ্বাস করেন। তাঁরা বলেন—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বহুরকমের পার্থক্য আছে, তার জন্য তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য কম, এসব কথা মানা যায়, কিন্তু তাদের যে উৎকট বিরোধ আজ দেশে জেগেছে তার যথেষ্ট কারণ এই ধরনের মনোমালিন্যই নয়, তাদের বিরোধের যা কারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে তা সনাতন, তার ইংরেজি নাম Divide and Rule এর উত্তর বহুবৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন এ ভাবে সমস্যাটাকে দেখলে এর কোনো মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেননা আমরা, অর্থাৎ দেশের হিন্দু ও মুসলমান, বড় দুর্বল আর যাঁরা Divide and Rule করেছেন তাঁরা অত্যন্ত সবল, বিচ্ছিন্ন কোনো দিন মিলিতের সঙ্গে বিরোধে জয় লাভ করতে পারে না।

কিন্তু সম্প্রতি তাঁরও মতের পরিবর্তন হয়েছে মনে হয়। অন্তত তাঁর "রাশিয়ার পত্রে" এই কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য মুখ্যত দায়ী ভারতের শাসকবর্গ। রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় তখন ঢাকায় দাঙ্গা হয়। পরজাতির সামনে তাঁর স্বদেশবাসীদের সেই মূঢ়তা ও বর্বরতা তাঁর যে গভীর লজ্জার কারণ হয়েছিল, মনে হয়, তারই জন্য এমন একটি ক্ষোভের সৃষ্টি তাঁর মধ্যে হয়েছিল।

যাঁরা বলেন সরকারী Divide and Rule নীতি দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য দায়ী তাঁদের মোট বক্তব্য এই— ভারতে এখন হিন্দু কিছু প্রবল হয়েছে, তাকে দমিয়ে দেওয়া রাজনীতির দিক দিয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই নীতি যদি বাস্তবিকই দেশের পরিচ্ছন্ন শাসন নীতি হতো তাহলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এক পক্ষেরই বেশি জয়ী

www.nagorikpathagar.org

হওয়া স্বাভাবিক হতো। তা অবশ্য হয়নি। খবরের কাগজের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে বলতে হয়, এই সব বিরোধে কোনো কোনো স্থানে মুসলমান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এমন ধরনের দাঙ্গা অনেক সময় হয়ে ওঠে হাটের মারামারির মতো; হাটে মারামারি লাগলে কে যে কার শত্রু অনেক সময়ে সেই জ্ঞানই পায় লোপ, কেবল চলে অন্ধ আঘাত আর প্রতিঘাত; কেউ নিরপেক্ষও থাকতে পারে না; সেইভাবে কোনো কোনো সরকারী কর্মচারীও কখনো কোনো পক্ষে ভিড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর নারদমনোবৃত্তিসম্পন্ন কর্মচারীও একান্ত দুর্বল না হতে পারেন। রাজশক্তির তরফ থেকে দেশের অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের অকৃত্রিম উন্নতিচেষ্টা দেশের উন্নত অসম্প্রদায়ের লোকদের মনোদুঃখের কারণ হলেও প্রকৃত রাজনীতি—ভেদনীতি নয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধে স্পষ্ট ভেদ-নীতির দোষ শাসকদের না থাকলেও অন্য রকমের দোষ থেকে তাঁরা মুক্ত নন। সেটি হচ্ছে এদেশের সমাজ ও ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপে তাঁদের ভীতি। সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি হয়ত তাঁরা মন থেকে মুছে ফেলবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ভারতবাসীর মনোভাবে যতটা অন্ধতা ছিল তার প্রভাব তাদের উপরে যে কম হয়েছে এ কথা স্বীকার করাও তাঁরা হয়ত সুবিবেচনা মনে করেন না। কিন্তু অন্ধতার প্রতিকার অন্ধতার দ্বারা হয় না। এদেশ যদি আচার-প্রধান হয়, অর্থাৎ বিচার এদেশের লোকদের কাছে সমাদৃত না হয়, তবে দেশের শাসন কার্যের লক্ষ্য হবে সেই সব বিচিত্র আচারকে শুধু বিবদমান হতে না দেওয়া এ নীতিতে বুদ্ধির পরিচয় থাকলেও দৃষ্টি ও শক্তির পরিচয় নেই। সেই জন্য এ নীতি শান্তির প্রার্থী হলেও পায় অশান্তিই; কেননা, বিবাদের অবসানরূপে যে শান্তি জীবনে তা লাভ করা সম্ভবপর নয়। জীবনে শুধু লাভ করা যায় সৃষ্টিধর্মের যে শান্তি অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি বর্ধমান শ্রদ্ধা, তাই।

কাজেই যারা ভেদনীতিকে দেশের সমস্ত ব্যাধির মূল কারণ বলে' বুঝেছেন তাঁদের মত বদলাবার ক্ষমতা আমাদের না থাকলেও তাঁদের মতের বিরুদ্ধে যে যুক্তি আছে সে কথা বলবার অবসর আমাদের আছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের যত কারণই থাকুক তাদের নিজেদের বহুকালের বিকৃত বুদ্ধি যে তার মূলে এ কথাটা সূত্রস্বরূপ ধরে নেওয়া সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নয়, কেননা শুধু ইতিহাস নয় বিচার ও আত্মবিশ্বাস এর অনুকূলে। পল্লীর খড়ের ঘরে যে আগুন লাগে তার আশু-কারণ হয়ত আগুন ও গৃহস্থের অসাবধানতা, কিন্তু যিনি এর প্রতিকারে অগ্রসর হবেন তাঁর কাজ হবে সহজদাহ্য এই গৃহগুলির সংস্কার। আর এ সংস্কারে গৃহস্থের আগ্রহাতিশয্যই স্বাভাবিক।

হিন্দু ও মুসলমানের বিকৃত বুদ্ধিই যে তাদের বিরোধের মূলে এ চিন্তা আমাদের দেশের গত কয়েক শতাব্দীর শ্রেষ্ঠদেরও। তাঁরা এর নিরাকরণের চেষ্টাও কম করেন নি। তাঁদের সেই সব চেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষ এদেশে যখন হয়েছে তাদের মিলনের চেষ্টাও প্রায় তখন থেকে হয়ে আসছে। পাঠান-যুগের অনেক সাধু-সন্তের বাণীতে তার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু এ-চেষ্টা বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে কবীর ও আকবরের মধ্যেই। আকবরের হিন্দু

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানের মিলনের চেষ্টার মূল্য তেমন দেওয়া হয়নি। তাতে অন্যায় তেমন হয়েছে মনে হয় না, কেননা আকবর অপূর্ব প্রতিভার অধিকারী হলেও তাঁর হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় চেষ্টায় খেয়ালিত্ব রয়েছে ঢের। তিনি যে বিভিন্ন ধর্মের কিছু কিছু আচার গ্রহণ করেছিলেন সে-সমন্বয় তাঁর নিজেরই জন্য, সেটি সকলের হোক এ কামনা তিনি করেছিলেন ভাবা কঠিন। আকবরের ভিতরে কবি-প্রকৃতি ছিল, বিভিন্ন রূপের পূজায় মুখ্যত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই মনে হয়। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সম্পর্কে তাঁর বড় কীর্তি হচ্ছে অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার— মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠদের বা সর্বযুগের প্রেমিকদের যা সাধারণ ধর্ম।

মধ্যযুগের সমন্বয়কারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বোধ হয় কবীরের ও তাঁর পরে দাদু ও রজ্জবজীর। এক হিসাবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় এঁদের চিন্তায়ই রয়েছে। মানুষকে এঁরা সব স্থূল আবরণ উন্মোচিত করে' দেখেছেন, আর সেই দেখাই যে সত্যকে দেখা সে-কথা পরম মনোহর ভাষায় প্রকাশ করে' গেছেন। তাই তাঁদের চিন্তা সমসাময়িকরূপে যা পেয়েছিলেন তাইই সে সবের চরম রূপ নয়। সব বিক্ষোভের ভিতরে সত্যকে শান্ত হয়ে দেখবার সঙ্কেত এসবে আশ্চর্যভাবে সঞ্চিত আছে।

কিন্তু এঁদের চেষ্টায় যে আশানুরূপ ফল ফলেনি তার কারণ শুধু জনসাধারণের অক্ষমতাই নয়। এই ব্যর্থতার কারণ এঁদের বাণীর ভিতরেই নিহিত আছে মনে হয়। হিন্দু ও মুসলমানের যে বিরোধ দেশে জাগলো তা শুধু চিন্তাধারার বিরোধ নয়, সেই বিরোধের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রূপও প্রবল। কিন্তু সে সবের মীমাংসায় এই জ্ঞানীদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয়নি। কবীর বললেন— বেদ ও কোরআন ভব-বন্ধন স্বরূপ, ও সবের ভিতরে তুমি কেবল ঘুরপাক খেয়ে মরবে। তাঁর এ কথায় হিন্দু ও মুসলমানের আচার—পূজা যোগ্যভাবেই তিরস্কৃত হলো। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ জীবনে আচার অর্থাৎ নিয়ম-কানুন বিসর্জন সম্ভবপর নয়, তাই বেদ ও কোরআনের প্রবর্তিত আচার যদি গ্রহণ না করা হয় তবে অন্য কি আচার গ্রহণ করতে হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ আবশ্যক। বলা বাহুল্য, মানুষের বৃহত্তর সমাজ জীবনের প্রয়োজন এই জ্ঞানীদের বাণীতে মেটেনি বলে এদের বাণীর বিদ্যুচ্ছটায় মানুষের অন্তর আলোকিত হয়েছে কিন্তু বিদ্যুতের মতোই ক্ষণকালের জন্য। সে-উপলব্ধিকে সমাজ জীবন সার্থক করা যাবে কি উপায়ে সে-সম্বন্ধে তেমন কোনো নির্দেশ না পাওয়ার ফলে প্রাচীন চিরাচরিত পন্থাই তাদের জন্য পন্থা রয়ে গেছে।

উচ্চচিন্তার এই যে সামাজিক রূপ গ্রহণে কুণ্ঠা, মনে হয় এ ভারতীয় চিন্তার মজ্জাগত দুর্বলতা। একে যদি কেউ ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য বলতে চান তিনি তা বলতে পারেন। এর স্বপক্ষেও কিছু বলা যে না যায় তা নয়। কিন্তু এ দুর্বলতাই কেননা, শুধু সুবিবেচনা নয় ভয়ও এর সঙ্গে সমাবেশ ঘটেছিল তার ফলে আচার প্রাধান্যের সাহায্যে দেশে শৃঙ্খলা বিধানের চেষ্টা হওয়া বিচিত্র নয়। সেই থেকে আচার ধর্ম এদেশে যে বড় ধর্ম হয়ে আছে তা বার বার কিছু কিছু আঘাত পেলেও মোটের উপর বিশেষ প্রতিপত্তিই সম্ভোগ করে আসছে। মধ্যযুগের জ্ঞানীরাও এদেশের সমাজ জীবনে হস্তক্ষেপ করতে সঙ্কুচিত হয়েছেন

www.nagorikpathagar.org

এ কথা বলা যায়। এই আচার প্রাধান্যের জন্যই দেশের উচ্চচিন্তা যে মানসলোক থেকে কর্ম-লোকে পদার্পণ করতে এমন সঙ্কোচ বোধ করছে সেজন্য অদ্ভুতত্ত্বের সঙ্গে এসবের সংস্রব দুর্লভ হয়নি। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—একদিন মহাপ্রভু চিন্তিত হলেন এই কথা ভেবে যে যবনজাতি "গোব্রাহ্মণ" হিংসা করে মহাদুরাচার, তাদের উদ্ধারের কোনো উপায় দেখা যায় না; তখন হরিদাস বলেন তাদেরও মুক্তি অনায়াসে হবে, কেননা হারাম হারাম বলে তারা প্রকারান্তরে রাম নাম উচ্চারণ করবে— নৃহিংস পুরাণে আছে "দ্রংষ্ট্রীদ্রংষ্ট্রাহতে ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন", (অন্তলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। এ প্রসঙ্গ বাস্তবিকই চৈতন্যদেবের সঙ্গে হয়েছিল, না নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এটি ভক্তদের অতি রঞ্জিত, তা শক্ত; তবে "চৈতন্যচরিতামৃতে"র মতো একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে এ কথা যে স্থান পেয়েছে এই থেকে অনেকটা বোঝা যাচ্ছে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠদের চিন্তা-ভাবনার ধারা। সত্যকে নানা রকমে বার বার পরীক্ষা না করে' পূর্ণ সত্য বলে' গ্রহণ করার যে মনোবৃত্তি মোটের উপর তা অজ্ঞানতার সঙ্গে আপোষ। আর সত্যের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রূপ লাভ না হলে না বলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে দেশে যে জাগরণ এলো মধ্যযুগের মতন মুখ্যত তা ধর্মান্দোলন একথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু সেদিক দিয়ে মধ্যযুগের চাইতে এযুগের আন্দোলন দুর্বল কেননা ব্যাপকভাবে মানুষের আত্মিক উৎকর্ষের কথা এ যুগের নায়করা যতটা ভেবেছেন তার চাইতে বেশি ভেবেছেন নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকদের পারমার্থিক ও আর্থিক উৎকর্ষের কথা। (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলেছিলেন বটে, ব্রাহ্ম হিন্দুর অংশ মাত্র নয়, কিন্তু সেটি এক অমূল্য মুহূর্তের প্রেরণার ফল, নিজেকে হিন্দু বলে পরিচিত করবার আগ্রহ তাঁরও ভিতরে কম নয়)। হিন্দু-মুসলমানবিরোধের মীমাংসা-চেষ্টা এযুগে হয়েছে গৌণভাবে মুখ্যভাবে নয়। তবু এই গৌণ চেষ্টার মূল্যও কম নয়। দেশের একটি স্থানে যদি প্রকৃত উন্নতি চেষ্টা চলে তবে তার প্রভাব সর্বত্র সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ-চেষ্টা যে সমাজধর্মী হয়েছিল এজন্য দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ক্ষেত্রে তার মর্যাদা মধ্যযুগের সাধনার চাইতে কম নয় বরং বেশি। সেই চেষ্টা কিভাবে রাজনৈতিক মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়েছে তা আমরা দেখেছি। বাস্তবিক, দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে যে প্রকৃত সংস্কার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল এইই হয়ত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বলতে যা বোঝায় দেশের সেই দুরবস্থা উত্তরোত্তর অপনোদন করে চলত। এতেই এ সমস্যার মীমাংসা হয়ত হতো না, তবু বর্তমানে এ বিরোধ ঘৃণিত রূপ ধারণ করছে তা থেকে দেশ রক্ষা পেত।

দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আত্ম-অন্বেষণ চেষ্টা অনেকটা রুদ্ধ হলেও হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা বরাবরই হয়ে আসছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সে-চেষ্টা অপ্রবল, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে তার প্রাবল্য কম নয়। এই চিন্তার ক্ষেত্রে একালের দুজনের চেষ্টাই বিশেষ শ্রদ্ধার্হ হয়েছে রামকৃষ্ণের ও রবীন্দ্রনাথের।

রামকৃষ্ণ দেবের "যত মত তত পথ" বাণী জগতের বিরোধ সামঞ্জস্যের এক বড়ো মন্ত্র বলে কোনো কোনো মনীষী মত প্রকাশ করেছেন। সে চিন্তা-পদ্ধতিতে সত্য দৃষ্টির

www.nagorikpathagar.org

চাইতে শুভ ইচ্ছা যে বড়ো একথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি; কেননা পথ নির্দিষ্ট আছে এ সত্য নয়, পথ বারবার আবিষ্কার করতে হয় এইই সত্য রামকৃষ্ণ দেবের পথও চিরাচরিত পথ নয়, আবিষ্কৃত পথ।[৩৪] তবে দেশের লোকদের যে অবস্থা তাতে এ চিন্তারও বিশেষ মূল্য আছে। দেশের লোকে যদি অন্তত এই কথাটা বুঝতে পারে যে মানুষ বিচিত্র, মানুষের মতও বিচিত্র, সব এক ছাঁচে ঢালাই সম্ভবপর নয়, তাহলেও বিরোধ-শান্তির অনেকটা সহায়তা হয়। "যত মত তত পথ" কথাটিতে নবসৃষ্টি-প্রবণতা যতখানি তার চাইতে সমাজ ও ধর্মের প্রাচীন রূপের পূজার আগ্রহ বেশি। এর মধ্যে যে কাব্যসৌন্দর্য আছে তাতেই আকৃষ্ট হয়েছে অনেক ভাবুক ব্যক্তির চিত্ত, কিন্তু মানুষ আজ এত কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছে যে তাদের দেশকালের পটে সাজিয়ে সাজিয়ে কল্পনার চোখে না দেখে সহজভাবে খোলা চোখে দেখবার প্রয়োজন বেশি হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়-বাদের দুইটি ধারা। একদিকে, তাঁকেও বলা যায় "যত মত তত পথ" বাদী— বিভিন্ন শ্রেণীগত ও দেশগত বৈশিষ্ট্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি শ্রদ্ধাপূর্ণ; আর একদিকে তিনি বিশেষভাবে সৃষ্টিধর্মী-মানুষকে দেশ কালে বিভক্ত না দেখে এক অখণ্ড বিকাশমান সমাজের সভ্যরূপে দেখেছেন, সমাজ-জীবনে উৎকর্ষ লাভ যার জন্য পরম সত্য। তাঁর Religion of Man গ্রন্থে তাঁর এই মত বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই যে বিকাশ-ধর্মী মানুষ সমাজ জীবনে অক্লান্তভাবে সৃষ্টিশীল হয়ে চলা যার জন্য সার্থকতার পথ, এর অভ্যুদয় দেশে না হলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বলতে আমাদের যে দুঃখ বোঝায় তা দূর হবে না এইই আমাদেরও প্রধান নিবেদন।

এই বিকাশ-ধর্ম অথবা সৃষ্টিধর্ম কি? খুব ঘোরালো না করে' সহজভাবে বলা যায় জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের যে অন্তহীন কৌতূহল সেইটি তার সৃষ্টিধর্ম। শুধু নতুন কিছু করবার ঝোঁককে সৃষ্টি-ধর্ম বলা অসার্থক, কেননা, জ্ঞান সেখানে তেজোহীন। যুগে যুগে মানুষ যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছে, নূতন নূতন কর্মের উদযাপনে প্রাণপাত করেছে, সে-সব তার সৃষ্টিধর্মেরই প্রেরণায়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে সৃষ্টিধর্মের প্রভাবে মানুষ রাতারাতি আগাগোড়া বদলে গিয়ে অদ্ভুত কিছু হয়ে ওঠে। হয়ত অন্তরের নতুন উপলব্ধির গাঢ়তার দিক দিয়ে সে বদলেই যায়; কিন্তু আসলে, মানুষ জীবনের পথে ধীরে ধীরেই চলে, একেবারে নতুন হয়ে ওঠা তার শক্তির বাইরে। চারপাশের জীবনের সঙ্গে মানুষ যে নিবিড় যোগে যুক্ত সৃষ্টিধর্ম তাকে কখনো অস্বীকার করে না, বরং পূর্ণভাবে স্বীকার করে তাকে ফুটিয়ে তোলে নতুন সম্ভাবনা—আর ক্রমাগত চলে এর কাজ।

এই যে মানুষের ক্ষমতা— পরিবেষ্টনকে নিয়ে নতুন হয়ে ফুটে ওঠা— এ শুধু পরমাশ্চর্য নয় অত্যাবশ্যক, যেমন অত্যাবশ্যক দেহের কোষাণুসমূহের অক্সিজেন সংস্পর্শে প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ ও পুনর্গঠিত হওয়া। আর যে-কারণে দেহ-শুদ্ধির এই প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে— অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষায় অমনোযোগ অথবা ব্যাপক অমনোযোগ— সেই কারণেই

---

৩৪. দ্রঃ রামমোহন রায়

www.nagorikpathagar.org

ব্যাহত হয় সমাজজীবনে সৃষ্টিধর্ম। সমাজ-জীবনে এই অমনোযোগ বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করে, এত রূপে যে সে-সবের নামকরণ অসম্ভব— যেমন স্বাস্থ্যের এক নাম, কিন্তু ব্যাধির নামের অন্ত নেই— তবে আমাদের দেশে এর বড় পরিচয় স্থূল হয়েছে ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। সে-ধারণায় অমনোযোগ, অন্য কথায় চারদিকের জীবনের সঙ্গে সংস্রবের অভাব এবং মোহের প্রভাব, এমন আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে যে তার প্রাচীনত্ব রীতিমত সম্ভ্রমের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

হিন্দু জাগরণ সম্বন্ধে আমাদের আরো আলোচনা করবার আছে। সেই জাগরণ-তত্ত্বেও দেখা যাবে, সেই প্রাচীন অমনোযোগের প্রভাব। হিন্দু-সমাজে সূচিত হয়েছিল এই জাগরণ এজন্য যদি একে হিন্দু জাগরণ বলতে হয় তবে জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সাধনার সাম্প্রদায়িক রূপকে অসঙ্গতভাবে বড় করে দেখা হয়। তার চাইতে, এ জাগরণে হিন্দুত্ব কতখানি অহিন্দুত্বই বা কতখানি তা বোঝা যাবে যাঁরা জাগ্রত হয়েছিলেন তাঁদের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে। যে সব কর্ম, যে সব চিন্তা এমন কি যে সব ব্যক্তি থেকে তাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে সবে হিন্দুত্ব যতখানি আছে অহিন্দুত্ব তার চাইতে মোটেই কম নেই; আর যাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন, প্রগাঢ় স্বজনপ্রীতি সত্ত্বেও, কোনটি হিন্দু কোনটি অহিন্দু এই বিবেচনার দ্বারা তাঁরা প্রেরণালাভের পথে চালিত হননি। বাস্তবিক, যাঁরা সৃষ্টিধর্মী, সত্য ও সৌন্দর্যের প্রেরণা তাঁরা যে জগতের যে কোনো স্থান থেকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন, দেশ জাতি কাল এর কোনো ব্যবধান তাঁদের জন্য ব্যবধান হয় না, এই দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট কথা আমাদের দেশের অনেক সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিও যে মাঝে মাঝে কেমন করে বিস্মৃত হয়েছেন একথা ভাবলে বিস্ময়ে বিহ্বল হতে হয়। এর মুখ্য কারণ বোধ হয় এই যে সৃষ্টি-প্রবণতা তাঁদের মধ্যে স্বল্পক্ষণস্থায়ী হয়েছে, আর দেশের উচ্চশ্রেণীর ভিতরেও অজ্ঞানতার বহু বিস্তারের জন্য বিচারের পথ তাঁদের মনে হয়েছে দুস্তর।

দেশের একালের এই জাগরণের মূলে যত বিচিত্র প্রভাবের ক্রিয়া আছে সেসব বিস্মৃত হয়ে এবং সমস্ত দেশের জন্য এ জাগরণ কত অর্থপূর্ণ সেই বৃহৎ দায়িত্বের পাশ কাটিয়ে হিন্দু-সমাজে আরব্ধ জাগরণ যে শুধু হিন্দু জাগরণ নাম পেল এই মোহ অথবা অমনোযোগ ধর্ম— মোহ না পাবারই যোগ্য। ধর্মের যে গোড়ার কথা মনুষ্যত্ব-বোধ তার সঙ্গে মোহের নিত্য-বিরোধ; এ-ধর্ম হচ্ছে দীর্ঘকালের বিচারহীন আচারপ্রিয়তা—সাংসারিক জীবনের প্রচ্ছন্ন ব্যর্থতা-বোধ এই আচার মোহকে অথবা ধর্ম মোহকে এমন মধুর করেছে মনে হয়। ধর্ম-মোহই যে এদেশে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃষ্টি ধর্মের ব্যর্থতার প্রতিরূপ তার একটি বড় পরিচয় এই যে হিন্দু-জাগরণের প্রতিক্রিয়ায় দেশের মুসলমানদের ভিতরে বিশেষভাবে জাগলো সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বুদ্ধি।

কিন্তু ধর্মকে যাঁরা আগাগোড়া মোহ বলেন তাঁদের মত আমরা গ্রহণ করি না, কেননা জীবনের সার্থকতা ধর্ম-বোধে, অর্থাৎ, সত্যে অথবা কোনো আদর্শে সমর্পিত চিত্ততায়। প্রচলিত ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেও এরূপ সমর্পিত চিত্তদের জন্ম হয়েছে। কাজেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়— প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়কে মোহ থেকে মুক্ত করে'

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃত ধর্ম-প্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করাই কি দেশের চিন্তাশীল কর্মীদের শ্রেষ্ঠ কাজ নয়? এই ভাবেই কি মানুষের সৃষ্টি ধর্ম বা বিকাশ-ধর্ম সক্রিয় করে তোলা হবে না।

বলা বাহুল্য আমাদের দেশে এতদিন প্রধানত এই চেষ্টাই হয়েছে। তাতে ফল যে হয়নি সে-কথা না বললেও চলে। কিন্তু ফল হয়নি চেষ্টার দোষও বটে; দেশের বিভিন্ন ধর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করে' শুধু এই বিশ্বাসকে পাথেয়রূপে অবলম্বন করা হয়েছে যে সব ধর্মের ভিতরেই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সত্য নিহিত রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অর্থাৎ— ধর্ম-বিধানের জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছে।

এ-অনর্থের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভবপর হয় যদি ধর্মকে চিরস্থির বিধানরূপে গণ্য না করে' আবিষ্কার বিষয় বলে' ভাবা যায়, তাহলে ধর্মগ্রন্থ ও মহাপুরুষ হবেন জগতের চিন্তাশীল ও তাঁদের বাণীর মতো মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু— তার পূজা আরতির বস্তু নয়। কিন্তু ধর্ম-বিধানের পূজারি যাঁরা তাঁরা তাঁদের সাধ্যানুসারে উদারতম হয়েও এতে স্বীকৃত হবেন মনে হয় না। ধর্ম বিধানের উপরে বিচার-বুদ্ধির স্থান দান তাঁদের চোখে ঘোর অধর্ম বলে' বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক, যদিও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরা প্রতিনিয়ত বিচার-বুদ্ধিকে বিধানের উপরে স্থান দান করছেন, কেননা বিধানের ব্যাখ্যার পরিবর্তন নিয়তই হচ্ছে।

আমাদের দেশে ধর্মের যা প্রকৃতি তাতে নিছক আচার-পূজা না বলে' উপায় নেই, সৃষ্টি-ধর্ম তাই তার তরফ থেকে বাধাই বিশেষভাবে পায়। এহেন ধর্মকে জীবননিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া বাস্তবিকই বিপত্তিকর। কতখানি বিপত্তিকর তা বোঝা গেছে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা থেকে। তিনি প্রত্যেক ধর্মকে এমন পূর্ণাঙ্গ জানেন যে ধর্মান্তর-গ্রহণ তাঁর চিন্তার অতীত। তিনি সজাগভাবেই এ-মত প্রকাশ করেছেন। ধর্ম বলতে তিনি যা বোঝেন তার ভিতরে আচার প্রিয়তা থাকলেও প্রবল বিচার-বুদ্ধি বেশি করে' আছে; তাই তাকে জীবন নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া অসঙ্গত বা অশোভন হয় না। কিন্তু তাঁর চিন্তার সেই অভিনবত্বের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট না করে' তিনি যে তাদের হতে বলেছেন স্বধর্মে নিষ্ঠাবান এতে প্রকৃত ধর্ম-ভাব নয় ধর্মমোহই দেশে প্রবল হবার সুযোগ পেয়েছে। একালের বিবর্ধিত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য তিনি আংশিকভাবে দায়ী একথা তাই বলা যায়। অসাবধানতা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। ধর্মের ক্ষেত্রে যাঁরা তাকে মনে করে সার্থকতার পথ, এত অভিজ্ঞতার পরে আমাদের বলতেই হবে, তাঁরা ভুল করেন।

কাজেই এই যে সুপরিচিত সিদ্ধান্ত যে হিন্দু হিন্দুত্বে নিষ্ঠাবান হলে' এবং মুসলমান মুসলমানত্বে নিষ্ঠাবান হলে তাদের মিলন সম্ভবপর হবে এর উপরে যাঁদের নির্ভর তারা সাধু-উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েও অন্ধকারে পা বাড়ান। এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে তাঁদের যাচাই করা উচিত—হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব বলতে তাঁরা কি বোঝেন। কিন্তু তেমনভাবে যাচাই করতে গেলে তাঁদের অবলম্বন হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব হবে না, হবে এই দুয়ের অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্ম। অন্যভাবে কথাটা বললে দাঁড়ায়, হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব অতীতে ও বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল ও করছে তাইই সে-সবের প্রকৃত রূপ একথা

www.nagorikpathagar.org

অর্থহীন, তার পরিবর্তে এই সব ধর্ম ভবিষ্যতে কিভাবে মানুষের জ্ঞান ও কর্ম শক্তির সূতিকাগার হবে এইই হওয়া চাই হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকদেরই বিশেষ সাধনার বিষয়। এই কথাই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীতে— যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।[৩৫]

এই সৃষ্টি-ধর্ম অদ্ভুত বা দুঃসাধ্য কিছু যে নয় প্রতিদিন তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। মানুষ আরো বড় হবে আরো সুন্দর হবে এ-বিশ্বাস মানুষের মর্মমূলে। এত যে ধর্ম জগতে প্রবর্তিত হয়েছে, এত বিচিত্র সভ্যতার বিকাশ হয়েছে, এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হচ্ছে, সৃষ্টি-ধর্ম বা বিকাশ-ধর্ম ভিন্ন এসবের মূলে আর কিসের প্রেরণা থাকতে পারে! তবে, মানুষ সৃষ্টিধর্মী হলেও জাগ্রতভাবে নয়। জগতের মানুষ একালে প্রায় এক পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সজাগ চেষ্টার পরিমাণ তাই যথেষ্ট বাড়াবার প্রয়োজন।

সৃষ্টিধর্মী না হলে দেশের যুগযুগান্তরের সংগৃহীত আচারের দাসত্বই যে দেশের লোকদের জন্য বড় হয়ে থাকবে, এদেশের মানোজীবন ও সমাজ জীবনের নব নব সম্ভাবনা তাদের মনে হতে থাকবে দুরাশামাত্র, একথাটা আরো মহামূল্য জ্ঞান করি বলেই যে-সব চিন্তাশীল বলেন, ভারতের যে বিশেষ প্রকর্ষ-ধারা জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক তারই হওয়া উচিত ভারতবাসীর জীবনের নিয়ামক, তাঁদেরও কথা আমাদের মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক করে। এই চিন্তাধারা যাঁদের তাঁরা খুব বড় এই কথাটি বলেন যে দেশের যে বহুকালের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও জীবন-ধারা তা সেই দেশের লোকদের স্বভাবের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, সেই স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে না চললে স্বভাব সময়ে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়। এঁরা আহার-বিহার পোষাক পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে বিশেষ বিশেষ আদর্শের অনুসরণ পর্যন্ত জীবনের সর্ব ব্যাপারে দেশের লোকদের যে দেশের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে বলেন এ খুব সঙ্গত কথাই বলেন। কিন্তু এই চিন্তাধারার ভিতরে দুর্বলতা এই যে স্বভাব যে সৃষ্টিশীল আর সেই সৃষ্টিশীলতা মন্দ গতি হলেও অশ্রান্ত-গতি, মানুষের কোনো দুর্বলতার প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেমন তার স্বভাব নয় তেমনি কোনো দুর্বলতাকে বরং দুর্বলতা জ্ঞান করাও তার স্বভাব নয়— এই বড় কথাটা এর শ্রদ্ধার বিষয় তেমন নয়। একটু ভাবলেই বোঝা যায়, এই চিন্তার অধিনায়করা বেশ একটি সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করলেও মোটের উপর নির্দেশহীন এঁদের বাণী। ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কোন সংস্কৃতি বোঝা হবে— বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, মরমী, মোগল অথবা ব্রিটিশ? যদি এসবের মিশ্রণ হয় তবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সে-মিশ্রণ কি কি ধরনের হবে কেন হবে? এসব প্রয়োজনীয় কথা সম্বন্ধে এঁদের কোনো সদুত্তর নেই। আসলে, এসব কথা যাঁরা বলেন তাঁদের শ্রেষ্ঠরা সৃষ্টিধর্মী, সেই সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁরা ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় থেকে কিছু কিছু প্রেরণা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত তাঁদের

---

৩৫. পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীও এই অভিমত প্রকাশ করেন; লিখিত শাস্ত্রই পূর্ণাঙ্গ ধর্মশাস্ত্র নয়, ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন বিবেক।

www.nagorikpathagar.org

মতো সবাই যে কেবল ভারতের ইতিহাস থেকে প্রেরণা লাভ করবেন এ সম্ভবপর নয়, অপ্রয়োজনীয় এবং কতকটা অসম্ভবও বটে। তাঁরাও কেবল ভারতের ইতিহাস থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেননি। শুধু বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় নয় জীবনের অনেক ব্যাপারে বিশ্বজোড়া একাকারত্ব একালে যেমন অপরিহার্য তেমনি বাঞ্ছনীয়। এরপরও বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য মানুষের জন্য দুর্লভ হবে না, যেমন এক পরিবারে বহু রুচির লোকের জন্ম হয়, একই ভাষায় বহু মতের সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে।

একালের হিন্দু চিন্তাশীলদের (ভারতীয় না বলে হিন্দু বলাই সঙ্গত কেননা এক্ষেত্রে মুসলমান চিন্তাশীলরা হিন্দু চিন্তাশীলদের অনুকারী মাত্র) এই যে বৈশিষ্ট্য-প্রীতি এটি ভাল করে' বুঝে দেখবার সময় এসেছে। কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞান, অর্থাৎ গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে না যাওয়ার ভাবটি, যে এর মধ্যে আছে সেটি অবশ্য ভাল, কিন্তু এ ভিন্ন এর বাকি সবটাই মনে হয় প্রচ্ছন্ন অভিমান, আরো সংকীর্ণ করে বলা যায়, প্রচ্ছন্ন জাতি-অভিমান অথবা ব্রাহ্মণত্বের অভিমান। যাদের রাজনৈতিক ভাগ্য মন্দ তাদের পক্ষে এমন অভিমানও মন্দ নয় কারো কারো এই মত, কিন্তু অভিমানের জন্য যে মন্দভাগ্য অচল হয় তা যথার্থ, কেননা অভিমান ও সৃষ্টি-ধর্ম পরস্পর-বিরোধী। এই অভিমান হিন্দুর জীবনী-শক্তির এক পরিচয়-চিহ্ন এই মত দেশে প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু হিন্দুর জীবনী-শক্তি বলতে যে ব্যাপারটার প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় সেটি এত প্রশংসার্হ কি না তাও ভাবা দরকার। হিন্দু বেঁচে আছে এ যতটা সত্য, নিজের চোখে ও জগতের চোখে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে বেঁচে আছে এ তার চাইতে কম সত্য নয়। তার চাইতে গ্রীক মরে' গেছে কিন্তু মরে' গিয়েও সে জগতের প্রেরণা-স্থল হয়ে আছে, এর গৌরব হয়ত বেশি। শুধু বেঁচে থাকাই অবশ্য গৌরবের নয়, তাহলে সে-গৌরব হিন্দুর প্রাপ্য নয়। হিন্দুর গৌরব এই জন্য যে এক সময়ে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্ম হয়েছিল তাঁদের প্রভাব আজো তাদের জীবনে সক্রিয়। কিন্তু তাইই যদি সত্য হয় তবে অভিমানের অবকাশ নেই, কেননা শ্রেষ্ঠদের প্রভাব সক্রিয় হয় তাদের পূজা— প্রদক্ষিণে বা গৌরব কীর্তনে নয় তাঁদের মতো সৃষ্টিশীলতায়—আর সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে একান্ত যোগ বিনয় ও সত্যানুসন্ধিৎসারই। ভারতীয় সংস্কৃতিবাদ প্রভৃতি চিন্তা জীবনের দায়িত্ব পূর্ণভাবে স্বীকার না করারই নামান্তর বলে' মনে হয়। পরিবেষ্টনের সঙ্গে নিবিড় যোগের বাণী যে এতে প্রচারিত হয়েছে সেটি মহামূল্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সৃষ্টির ব্যাপারে স্বদেশ বিদেশ সবই উপকরণের ক্ষেত্র একথাও পুরোপুরি স্বীকার করতে হবে। যে সৃষ্টিধর্মী সে স্বদেশ-দেবতার অর্চনা করে বিশ্বজ্ঞান ও বিশ্বসৌন্দর্যের আলোকে।

পরিবেষ্টনের সঙ্গে নিবিড় যোগ এই কথাটি দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের দুইভাবে বুঝবার প্রয়োজন আছে মনে হয়। মুসলমান-সমাজের নিম্ন অংশ সহজেই দেশের সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত। এই বাংলাদেশে তাদের সেই যোগের অনবদ্য পরিচয় রয়েছে লোক-সাহিত্যে ও লোক সঙ্গীতে। কিন্তু মুসলমান-সমাজের উচ্চ বা সম্ভ্রান্ত অংশ সম্বন্ধে একথা তেমন ভাবে বলা যায় না। অথচ অল্প কিছুকাল পূর্বেও এই সম্ভ্রান্ত অংশ নিজেদের পূর্ণভাবে

www.nagorikpathagar.org

স্বধর্মনিষ্ঠ জেনেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দান, অতিথী-সৎকার, দেশের গুণীদের সমাদর, ইত্যাদি ব্যাপারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁদের বর্তমান আর্থিক অস্বাচ্ছল্য এর একটি বড়ো কারণ তা সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কারণ যে তাঁদের পরিবর্তিত মনোভাব বা "ওহাবী প্রতিক্রিয়া" সে কথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি। তা কারণ যাইই হোক দেশের সঙ্গে সহজ প্রীতির যোগের অভাব তাঁদের মধ্যে যে ঘটেছে, এ শুধু তাঁদের জন্য লজ্জার কথা নয় শঙ্কার কথাও বটে, কেননা, এ তাঁদের জীবনের ব্যর্থতার এক নিদারুন পরিচয়-চিহ্ন। আর হিন্দুর জন্য এই পরিবেষ্টনের সঙ্গে যোগ অনেকটা স্বাভাবিক মনে হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তা নয়। হিন্দু সমাজ জীবনে উচ্চ ও নিচের ভিতরে যে ঘোর ব্যবধান তাইই তার জন্য প্রিয় করেছে রক্ষণশীলতা বিচিত্র ধরনের আত্মসম্পূর্ণতায় যার প্রকাশ। সে-রক্ষণশীলতায় জীবন কোনো রকমে রক্ষা পেলেও তার বিকাশ অথবা সৃষ্টি-ধর্ম যে কেবলই বাধা পায় সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে শিক্ষিত হিন্দুর অপারগতা শিক্ষিত মুসলমানের দেশাত্মবোধের অভাবের মতনই ভয়ঙ্কর। এক হিসাবে ভারতের যুগযুগান্তরের ইতিহাস ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ইতিহাস। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, সব যুগেরই এই রূপ-ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় রাজশ্রিত আর জনসাধারণ ভারবাহী। এমন ব্যাপার প্রাচীনকালে অবশ্য সব দেশেই ঘটেছে; কিন্তু এ-ব্যবস্থা ভারতে যে এমন চিরস্থায়ী হবার উপক্রম করেছে, মনে হয়, তার মূলে দেশের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উৎকট রক্ষণশীলতাই পরিবেষ্টনের সঙ্গে যোগ যেখানে বিকৃত।

এই দুই ভাগ্য বিড়ম্বিত দলের বিরোধ বর্তমানে এমন দশায় এসে পৌছেছে যে একটিকে নির্মূল করে বিরোধ শান্তির কথা ভাবা অপরটির পক্ষে বিচিত্র নয়। এটি আসুরিক অতএব নিন্দনীয় এই কারো কারো মত। কিন্তু আসলে এ সম্ভবপর নয়। দেশের হিন্দু ও মুসলমান কারো গায়ে এত জোর নেই যে অপরকে পর্যুদস্ত করতে পারে। তাই সে-চেষ্টায় অগ্রসর হলে কিছুকাল মারামারি ও তারপর রেষারেষি এই হবে সার। যাঁরা বলেন এমন মারামারিতে দেশের লোকদের ক্ষাত্রতেজ বাড়বে তাঁদের মহাতেজা ক্ষত্রিয়দের কুরুক্ষেত্রে সম্মিলিত হওয়ার কথা স্মরণ করা ভাল। শুভ ও শুভ ইচ্ছা চিরদিনই অশ্রান্ত সাধনার অপেক্ষা রাখে।

কিন্ত এমন সাধনার দিকে দেশের লোকদের মন রুজু হতে পারার অবস্থায় আছে কি না সেটিও অবশ্য জিজ্ঞাসা। দেশের কর্ম-ও চিন্তানেতা যে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সে-নৈরাশ্য তাঁদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বলে ভাবাই ভাল। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ-ব্যাধি থেকে দেশকে মুক্ত করাবার চেষ্টা যথেষ্ট হয়নি এ মিথ্যা নয়। মধ্যযুগ থেকে একাল পর্যন্ত এই বিরোধ-মীমাংসার যত চেষ্টা দেশে হয়েছে সেসব থেকে নূতন প্রেরণাই আমরা লাভ করে' চলব যদি সে সবের সত্যকার মূল্যের দিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকে, আর এই জ্ঞানের অভাব আমাদের ভিতরে না হয় যে দেশকে সুন্দর ও সার্থক করতে আমাদের অক্ষমতা আমাদের জীবনের চরম অসার্থকতার নামান্তর।

এইখানেই বড় প্রয়োজন সৃষ্টিধর্মী নব নেতাদের। অতীতের প্রতি তাঁরা হবেন

www.nagorikpathagar.org

শ্রদ্ধান্বিত, তার পূজারি কখনো নয়— তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হবে বর্তমান ও ভবিষ্যত। সেইজন্য সুপ্রাচীন "হিন্দু" ও "মুসলমান" এর মিলন তাঁদের কাম্য হবে না, কেননা তা অসত্য ও অসম্ভব, তাঁদের কাম্য হবে একটি নব জাতি গঠন যার সূচনা নানাভাবে বহুকাল ধরে' দেশে হয়েছে, দেশের একালের জীবনের জন্য যার প্রয়োজনের অন্ত নেই। মনোজীবন ও রাষ্ট্রজীবন দুই ক্ষেত্রেই অশ্রান্তভাবে চলবে তাঁদের সৃষ্টির কাজ। একালের যে ধর্ম সম্প্রদায়গত রাষ্ট্রজীবন সেটি কদাচ তাঁদের সমর্থনের বিষয় হবে না, কেননা, তার ফলে এদেশের অভিশাপ-রূপ জাতি-ভেদ নব নব সম্ভাবনা লাভ করে' চলবে; তাঁদের সাধনার বিষয় হবে দেশের রাষ্ট্র-জীবনের, অথবা জীবনের, সত্যকার বিকাশ সম্ভাবনা।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞের অভিমত কতকটা এই। তবে মনে হয় তাঁরা বেশি খেয়ালী। তাঁরা যে বলেন যে বৈদেশিক শাসনের ফলে দেশের আর্থিক ও অন্যান্য বহুবিধ দুঃখ যত বেড়ে গেছে সেসব থেকে দেশকে মুক্ত করে' তবে তার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে, এ মোটের উপর চমকপ্রদ কথাই বেশি। এর পরিবর্তে সৃষ্টিধর্মী কর্মীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত জাপানের দিকে। মাঝে মাঝে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ক্ষতি-স্বীকার তার নিয়তি কিন্তু সেই নিষ্ঠুর নিয়তি স্বীকার করে' চলছে তার উন্নতি চেষ্টা। মহাত্মা গান্ধী তাঁর কোনো এক কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন, One step is enough for me এক পা বাড়াতে পারলেই আমি খুশী-কর্মের ক্ষেত্রে এ পাকা কথা। কোনো রকমের মোহ নয়, সত্যাশ্রয়িতা, প্রতিপদে সৃষ্টিধর্মী কর্মীদের অবলম্বন।

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা নয় জ্ঞান ও জাতীয়তা দেশের লোকের শরণ্য হবে, নিঃসন্দেহে; কিন্তু জাতি বলতে কি বোঝা হবে? বাঙালী, মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী? —না ভারতীয়? ভারতবর্ষ বহুকাল ধরে' একটি দেশ। ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় না হয়ে ভারতবাসীর পরিত্রাণও নেই। তবু আপাতত বাঙালী, মান্দ্রাজী ও পাঞ্জাবী হওয়াই বেশি ভাল মনে হয়; কেননা তা বেশি স্বাভাবিক ও কম কষ্টসাধ্য। অবশ্য ভারতীয়ত্বের বিরোধী যে বাঙালীত্ব মান্দ্রাজীত্ব বা পাঞ্জাবীত্ব তা কদাচ কাম্য নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে ইসলাম-দেহ ও বেদান্ত-মস্তিষ্ক। তার চাইতে এই কথা বলাই ভাল, ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ ও পূর্ণাঙ্গ মানব-মস্তিষ্ক, সৃষ্টি-শক্তির প্রকাশ যার ভিতরে হবে অবাধ। ইসলাম ও বেদান্ত মানুষের সৃষ্টি-শক্তিরই পরিচয় চিহ্ন। মানুষের সেই সৃষ্টি-শক্তি কোনো দিন নিঃশেষিত হবে না, চিরদিন অক্লান্ত ও অম্লান থাকবে, এইই তার জন্ম-অধিকার। সে-অধিকার সত্য হোক।

২৮ মার্চ, ১৯৩৫।

www.nagorikpathagar.org

রামমোহন রায়

বাল্যজীবন

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রামমোহন রায়ের জন্ম। মিস্ কলেটের এই মত নেবার যোগ্য।

তাঁর বালক-কালের দুইটি ব্যাপার বেশ চোখে পড়বার মতো; একটি, তাঁর মেধাশক্তি, অপরটি, গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে ভক্তি। প্রথমটির বাঞ্ছিততম পরিণতি তাঁর পরিবর্তী জীবনে ঘটেছিল একথা সবাই জানেন; দ্বিতীয়টির পরিণতি কিছু অদ্ভুত। কোনো কোনো ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষের জীবনে এমন পরিণতি দেখতে পাওয়া গেছে, যেমন, বাল্যের চঞ্চল ও তার্কিক নিমাই হয়েছিলেন ভক্তিরসাপ্লুত শ্রীচৈতন্য। কিন্তু অনেকের জীবনে এমন পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় না। বালক-বুদ্ধদেবকে আমরা দেখতে পাই সহানুভূতিসম্পন্ন ও পর্যবেক্ষণশীল; বালক-মোহম্মদ সম্বন্ধে যে-সব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সমসাময়িক উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভিতরে তাঁর স্বাতন্ত্র্য; আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নাকি পুরোহিতের সন্তান হয়েও দেবতার সম্মুখে নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারতেন না। —তবে রামমোহনের বাল্যের এই ভক্তিপ্রবণতা উত্তরকালে একটি সুন্দর পরিণতিও লাভ করেছিল। রামমোহনের যোদ্ধৃবেশ বন্ধুর চোখে এত মহিমময় ও শত্রুর চোখে এত নিষ্করুণ যে তাঁর অন্তরের পরমাশ্চর্য কোমলতা তাঁদের চোখে পড়বার অবকাশ পায় না। একটি অন্তঃপ্রবাহী ভক্তিধারা তাঁর ভিতরে ছিল, শুষ্ক জ্ঞানমার্গী তিনি ছিলেন না, একথা আজ সুবিদিত; তার সঙ্গে একথাও আমরা জানি যে এই পুরুষসিংহ অভিনয়ের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি, বিগত জীবন বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অশ্রু-তর্পন তাঁর জন্য ছিল অতি স্বাভাবিক। ইংল্যাণ্ডের লোকদের তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছিল— The oriental gentleman, versatile, emotional yet dignified,[৩৬] এটি যথার্থ ধারণা।

এই মেধাবী বালকের ভবিষ্যৎ যাতে গৌরবোজ্জ্বল হয় পিতা রামকান্তের সে-কামনা ছিল। তৎকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভের জন্য বাল্যশিক্ষা সমাপনান্তে রামমোহন পাটনায় প্রেরিত হন নয় বৎসর বয়সে।

রামমোহন ও মুস্লিম-ধারণা

পাটনায়[৩৭] কিশোর-রামমোহনের অবস্থিতিকাল সুদীর্ঘ নয়। কিন্তু তাঁর জীবনের উপরে এর প্রভাব গভীর। এই প্রভাবের স্বরূপ একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

---

৩৬. (তিনি) একজন প্রাচ্যদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি৷ বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, ভাবপ্রবণ, কিন্তু প্রভাববান্। কথাটি মিস্ কলেটের লিখিত জীবনীতে আছে।

৩৭. 'রামমোহনের বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্য' দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

হিন্দু ও খ্রিস্টান শাস্ত্রের যে-সব আলোচনা রামমোহন করেছিলেন সৌভাগ্যক্রমে সে-সবের অধিকাংশই আমাদের জন্য রক্ষিত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে-সব সুসম্বদ্ধ ও বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছিলেন, অথবা করবেন আশা করেছিলেন, তার কিছুই আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয় নি। তুহ্ফাতুল্-মুওহ্হিদীন গ্রন্থে অবশ্য কোরআনের কয়েকটি বচন ও হাদিস সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আছে; কিন্তু সে আলোচনা তিনি করেছেন শাস্ত্র বিসর্জন দিয়ে, শাস্ত্র স্বীকার করে' নয়। তবু এই তুহ্ফাতুল-মুওহ্হিদীন গ্রন্থ ও তাঁর রচনার নানাস্থানে ইস্‌লাম ও মুসলমান সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত উক্তি-আভাস-ইঙ্গিত ইত্যাদি থেকে মুস্‌লিম সাধনা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব, অথবা তাঁর চিত্তের উপরে মুস্‌লিম সাধনার প্রভাবের স্বরূপ, অনেকখানি বুঝতে পারা যায়।

অনেকেই বলেছেন, তাঁর স্বসম্প্রদায়ের প্রতীক-উপাসনার প্রতি তাঁর যে বিতৃষ্ণা, তাঁর মূলে রয়েছে কোরআনের শিক্ষা। —শুধু এইই নয়। খ্রিস্টান সমাজের ত্রিত্ব-বাদ, যিশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, এ সমস্তের প্রতি তাঁর যে বিরূপতা, অথচ যিশু খ্রিস্টের প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা, এ-সমস্তেরও মূলে রয়েছে কোরআনের শিক্ষা। যথা:

> তারা বলে, আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁরই প্রশংসা! তিনি পরম সমৃদ্ধ। আকাশে ও মাটিতে যা কিছু আছে সব তাঁর। এর সমর্থক কিছু তোমাদের নেই। এমন কথা কি বলছ তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা তোমরা জান না? (১০:৬৮)
>
> আর আমরা মেরী-তনয় যীশুকে পরিচ্ছন্ন নির্দেশ দান করেছিলাম ও তাকে "রুহুল্ কুদুস" (Holy Sprit) দ্বারা বলীয়ান করেছিলাম (২:৬৭)। যিশুর প্রার্থনা নামে কোরআনে একটি আয়াত আছে, তার অর্থ এই :
>
> "তুমি যদি তাদের শাস্তি বিধান কর (তবে) —তারা তোমারই দাসানুদাস; আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর (তবে) —তুমি মহান ও জ্ঞানময় (৫:১১৮)।"
>
> প্রসিদ্ধি আছে যিশু খ্রিস্টের এই কোরআনোক্ত পরম নির্ভরতার প্রার্থনাটি একদা হজরত মোহাম্মদ সমস্ত রাত্রি আবৃত্তি করেছিলেন।

শুধু এই-ই নয়। কোরআনের বহু বাণী রামমোহনের মর্ম স্পর্শ করেছিলো। কোরআনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, প্রকৃতির দিকে, মানুষের ইতিহাসের দিকে, কোরআন বারবার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরমকবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলা হয়েছে— সূর্য চন্দ্র মেঘ বৃষ্টি বসন্ত—বায়ু কেমন করে' আল্লাহ্র মহিমাকীর্তন করছে, মানুষের সেবায় এ সবের নিয়োগ হয়েছে, ফলে জলে শস্যে মানুষের কেমন পরিতোষ-সাধন হচ্ছে, এবং এই সব বিশ্বপাতার অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রামমোহন তাঁর তুহ্ফাতুল্-মুওহ্হিদীন গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে এইসব যুক্তি যথেষ্ট অনুরাগের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

বিধর্মীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে-সম্বন্ধেও কোরআনে কয়েক জায়গায় সুন্দর উপদেশ আছে, যথা :

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ ভিন্ন তারা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে তাদের গালি দিও না, পাছে তারা অজ্ঞানবশত সীমা অতিক্রম করে' আল্লাহকে গালি দেয় .... (৬:১০৯)।

যারা... ভালোর দ্বারা মন্দ বিদূরিত করে, তারা সুখকর আশ্রয় লাভ করবে। (১৩:২২)।

আমার ভৃত্যদের বল যা উত্তম তাই তারা বলুক (১৭:৫৩)।

তারাই পরমকারুণিকের দাস যারা বিনম্র হয়ে ধরণীবক্ষে বিচরণ করে, আর অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, "সালাম" (শান্তি) (২৫:৬৩)।

নারীজাতির পক্ষ রামমোহন আজীবন সমর্থন করেছেন। নারীর প্রতি সুবিচার ও সদয় ব্যবহার করবার উপদেশ কোরআনে বিস্তৃতভাবে আছে। যথা :

হে বিশ্বাসীগণ, এটি তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবে, আর তোমরা তাদের যা দিয়েছ তার কিছু অংশ ফিরে পাবার জন্য তাদের বিপন্ন করো না অবশ্য যদি তারা জ্বলজ্যান্তভাবে অন্যায়াচরণ না করে, আর তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর; এরপর যদি তোমরা তাদের ঘৃণা কর তা'হলে, হতে পারে, তোমরা এমন একটি জিনিস অবজ্ঞা করলে যার ভিতরে আল্লাহ্ পর্যাপ্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন (৪:১৯)।

নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ব্যবহার হজরত মোহাম্মদের নিজের চরিত্রেও লক্ষ্যণীয়। যখন তিনি মদীনার রাজা তখন তাঁর ধাত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁকে দেখেই তিনি গাত্রোত্থান করলেন ও নিজের উত্তরীয় বিছিয়ে দিলেন তাঁর বসবার জন্য।

কিন্তু কোরআন থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটি রামমোহনের লাভ হয়েছিল সেটি মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতের অল্প কয়েকটিতে ঈশ্বরের মহিমা অতি সুন্দর রূপ লাভ করেছে, সে-সবের পাশে পাশে কোরআনের কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করা যাচ্ছে:

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পারে।
সে অতীত গুণত্রয়
ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তার কেমনে সম্ভবে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে।

কোরআন :

.... তার তুলনা ব্যক্ত করবার মতনও কোনো কিছু নেই (৪২:১১)।

আকাশ ও পৃথিবীর অপূর্ব স্রষ্টা, আর যখন তিনি কোনো কিছু সংকল্প করেন তিনি শুধু সেটিকে বলেন, হোক, আর তা প্রকাশ পায় (২:১১৭)।

ভাব সেই একে জলে স্থলে শূন্যে যে সমভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার
আদি অন্ত নাহি যার
যে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।

www.nagorikpathagar.org

কোরআন :

তিনি জানেন তাদের অগ্রে কি আছে ও তাদের পশ্চাতে কি আছে, তাঁর যেটুকু অনুগ্রহ সেটুকু ভিন্ন তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারণা করতে পারে না; তাঁর সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত, আর এই উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না.... (২:২২৫)।

কে বুঝিবে তার মর্ম
ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম
গুণাতীত পরব্রহ্ম সকল কারণ।

কোরআন :

দৃষ্টি তাঁকে দর্শন করতে পারে না, কিন্তু তিনি (সব) দৃষ্টি দর্শন করেন। তিনি সূক্ষ্মের পরিজ্ঞাতা সদাজাগ্রত (৬:১০৪)।

ঈশ্বর, আত্মার বা প্রত্যাদেশ, ইত্যাদির স্বরূপ-চিন্তার মানুষ বিব্রত হবে এ কোরআনের অভিপ্রেত নয়, যথা :

অভিপ্রেত নয়, যথা :

"তারা তোমাকে প্রেরণা (প্রত্যাদেশ, আত্মা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে, বল, আমার প্রভুর হুকুমে প্রেরণা আসে, আর জ্ঞানের অতি অল্প অংশই তোমাদের দান করা হয়েছে" (১৭:৮৫)।

ব্রহ্ম স্বরূপত দুর্জ্ঞেয়, তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে বুঝতে হয়, এ কথা রামমোহন বারবার বলেছেন।

অনেকের ধারণা— কোরআনের আল্লাহ্ এক দোর্দন্ডপ্রতাপ অধীশ্বর, তাঁর ভয়ে সমস্ত প্রাণী ভীত, দণ্ড বা পুরস্কার যা খুশী তাই তিনি সৃষ্ট জীবকে প্রদান করেন। এ-সব ভাব যে কোরআনে নেই তা বলবো না। কিন্তু কোরআন একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়লে বুঝতে পারা যায়— কোরআনের আল্লাহ্ অনন্তমহিমান্বিত সদাজাগ্রত আর প্রেমপ্রবণ। এই আল্লাহ্র বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য কোরআনে বারবার বলা হয়েছে— "আমানু ও আমালুস্ সালেহাত" —বিশ্বাস কর ও সৎকর্মশীল হও। এই সৎকর্ম বলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সৎকর্মের কথাই ভাবা হয়েছে, যদিও অনেক মুসলমান-ধর্মাচার্য সৎকর্মের এই সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যার উপরে বেশি জোর দেন না। সৎকর্ম (লোকশ্রেয়ঃ) বলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সৎকর্মের কথাই যে রামমোহন বুঝতেন সে কথা সর্ববাদিসম্মত।

মুসলমানের চিন্তায় কোরআনের স্থান সর্বোচ্চে। কিন্তু এই কোরআন কিভাবে বুঝতে হবে সে সম্বন্ধে সব মুসলমান নিশ্চয়ই একমত নন। মানুষের অন্তর্নিহিত বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে সব মুসলমান কোরআন বুঝতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মোতাজেলা-দল সুবিখ্যাত। মানুষের অন্তরের অনুভূতি বিশেষভাবে তার সত্যোপলব্ধির সহায়ক, এই মত যে-সমস্ত মুসলমান পোষণ করতেন তাঁদের মধ্যে সুফী সম্প্রদায়ের কোনো কোনো শাখা সুবিখ্যাত। রামমোহনের চোখে যে-ইসলাম মহিমা বিস্তার করেছিল

www.nagorikpathagar.org

সে-ইস্‌লাম সর্বসাধারণ মুসলমানের ইস্‌লাম তেমন নয়। ইস্‌লামের সেই পরিচিত রূপে যে তৃপ্ত হতে পারেন নি, তা বুঝতে পারা যায় তাঁর Second Appeal to the Christian Public –এর এই উক্তি থেকে।

Disgusted with the puerile and unsociable system of Hindoo idolatry, and dissatisfied at the cruelty allowed by Mussalmanism against Non-Mussalmans, I, on my searching after the truth of Christianity, felt for a length of time very much periplexed with the difference of sentiments found among the followers of Christ (I mean Trinitarians and Unitarians, the grand division of them) until I Met with the explanation of the unity given by the divine Teacher himself as a guide to peace and happiness. (Panini Office Edition, 1906, Page–580).[৮]

তিনি যে ইসলাম থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে ইসলাম মোতাজেলাদের ও শ্রেষ্ঠ সুফীদের ইসলাম।

সাদী হাফিজ প্রমুখ সুফী-সাহিত্যিকদের রচনা তাঁর চিত্তের সন্তোষ সাধন করেছিল। তাঁর কয়েকটি অতি প্রিয় বচনের মধ্যে একটি হচ্ছে হাফিজের একটি গজলের এই দুই চরণ :

ইহকাল ও পরকালের আরাম এই এক কথায়—
বন্ধুদের নিয়ে উৎসব কর, শত্রুদের সঙ্গে আপোষ কর ॥

তাঁর তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন— এ হাফিজের আরো দুইটি বাণী উদ্ধৃত হয়েছে :

বায়াত্তর দলের ঝগড়া নিরর্থক,
সত্য না বুঝে তারা খেয়াল ও মূঢ়তার পথে চলেছে ॥
কারো অনিষ্টাচারী হয়ো না, আর যা খুশী কর,
আমাদের পন্থায় এ ভিন্ন আর কোনো পাপ নেই ॥

আর সাদীর এই বাণীটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল;

জীবের সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়।
তস্‌বিহ্ জায়নামাজ (আসন) ও আলখাল্লায় ধর্ম পাই ॥

---

৮. হিন্দুর অসামাজিক ও বালকোচিত পৌত্তলিকতায় বিরক্ত হয়ে আর অমুসলমানদের প্রতি মুসলমান-ধর্মের নির্মমতায় দুঃখিত হয়ে আমি খ্রিস্টধর্মের সত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হই; কিন্তু খ্রিস্টঅনুবর্তীদের মধ্যে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদী ও একত্ববাদী এই দুই বড় দলের মধ্যে যে-মতভেদ তা দেখে বহুদিন আমার দ্বিধাসন্দেহে কাটে। অবশেষে শান্তি ও আনন্দের নির্দেশ স্বরূপ সেই স্বর্গীয় আচার্যের প্রদত্ত একত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

তিনি নাকি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপ্রকাশ করতেন, এই বচনটি যেন তাঁর সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ হয়। আর ভারতীয় কৃষকদের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য East Indian Company-র কর্মকর্তাদের তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন সাদীর এই বাণীটি উপহার দিয়ে—

প্রজাদের সঙ্গে প্রীতিবদ্ধ হও ও (এই ভাবে) তোমার
শত্রুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও।
কেননা ন্যায় পরায়ণ নরপতির সৈন্য হচ্ছে তার প্রজা ॥

সুফীদের যে সব— বাণী তিনি উদ্ধৃত করেছেন, সে সবের ভিতর দিয়ে তাঁর চিত্ত সুস্পষ্টভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সবাই জানেন, ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ সম্পর্কে সুফী সাহিত্যে অনেক তত্ত্বপূর্ণ কথা আছে। মৌলানা জালালুদ্দিন রুমির কবিতায় অদ্বৈত-তত্ত্ব আশ্চর্য সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ করেছে। সে-সবে রামমোহন কতখানি আনন্দিত হতেন তা তেমন জানতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সুফীদের সুগভীর মানব-প্রেম বা জীব-প্রেম যে তাঁর পরম আনন্দের বিষয় ছিল সেটি অতি সুন্দরভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে। —বিশেষজ্ঞেরা আজ এ বিষয়ে একমত যে বিশ্বমানবের একত্বের ধারণা রামমোহন সুস্পষ্টভাবে করেছিলেন। সেই বিশ্বমানবের একত্ব সম্বন্ধে সাদীর এই বাণীটি সুবিখ্যাত—

আদম-সন্তানরা একে অন্যের অঙ্গস্বরূপ
কেননা তাদের উৎপত্তি একই মূল থেকে।
যদি এক অঙ্গে বেদনা বাজে
তাহলে অন্য অঙ্গও শান্তিতে থাকে না।
মানুষের দুঃখ যদি তুমি না বোঝো
তাহলে মানুষ নাম নেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে।

সুফী-সাহিত্য রামমোহনের অন্তরকে আনন্দিত করেছিল, কিন্তু তাঁর অন্তর ও বাহির উভয়কে বীর্যবন্ত করেছিল মোতাজেলা-বাদ। তাঁর যুক্তিবাদের কয়েকটি প্রধান সায়ক গৃহীত হয়েছিল মোতাজেলাতূণ থেকে, যথা ঃ—

১. ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কিন্তু তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না, তাঁর সমকক্ষ আর একজন ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন না।
২. ঈশ্বরের গুণ তাঁর সত্তা থেকে পৃথক নয়, গুণের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করলে ঈশ্বরের একত্ব নষ্ট হয়। প্রধানত এই যুক্তির দ্বারা রামমোহন বিভিন্ন দেবদেবীর ঈশ্বরত্বের দাবি খণ্ডন করেছেন।
৩. রামমোহন বলেছেন বেদ নশ্বর। মোতাজেলারা বলতেন, কোরআন সৃষ্টবস্তু, স্রষ্টার মতো চিরন্তন নয়। প্রধানত এই মতের জন্য মোতাজেলারা সর্বসাধারণে মুসলমানের বিরাগভাজন হন।

তবে মোতাজেলাদের সঙ্গে রামমোহনের বড় পার্থক্য হয়ত এই— মোতাজেলারা সাধারণত বিচারপন্থী পণ্ডিত, রামমোহনের পাণ্ডিত্য অনন্য সাধারণ, কিন্তু বিচারপন্থী পণ্ডিত

www.nagorikpathagar.org

তিনি যতখানি তার চাইতে বেশি তিনি বিচারপন্থী কর্মী— স্বদেশ প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক।

মুসলমান নৈয়ায়িকদের কাছে রামমোহন যে বিশেষভাবে ঋণী সে কথা সবাই স্বীকার করেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত তর্ক-বিজ্ঞানের 'যথেষ্ট হেতু'— বাদ "তর্‌জি বেলা মুরাজ্জেহ্" (Principle of sufficient reason) আধুনিক বিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

রামমোহন মুসলিম সাধনাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সেই দৃষ্টি তাঁর সমকালে কোনো মুসলমানের ভিতরে ছিল কি না, তার পরিচয় পাওয়া যায় না।[৩৯] শুধু তাঁর জীবন-চরিতে পাওয়া যাচ্ছে, মুসলমানরা তাঁর কোনো কোনো মন্তব্যের জন্য এক সময়ে বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কলিকাতা-বাসকালে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মেছিল। এমন কি মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব বেশি ছিল বলেই তাঁর স্বসম্প্রদায়ের লোক তাঁর উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন,— তাঁরা সন্দেহ করতেন, হয়ত মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর পানভোজনও চলে। তৎকালের উচ্চশ্রেণীর মুসলমান রাজকর্মচারীরা যে কৃতবিদ্য ও দক্ষ ছিলেন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রবলে শারীরিক বীর্যে পোষাকে-পরিচ্ছদে তৎকালের মুসলমান যে তৎকালে হিন্দুর চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিলাতে সাক্ষ্যদান-কালে স্পষ্টভাবেই তিনি সে কথা বলেছিলেন।

কিন্তু তবু মনে হয়, মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর এই যে সম্প্রীতি, সম-মতের সম্প্রীতি এ নয় সম-বৈদগ্ধ্যের এ সম্প্রীতি। মুস্‌লিম সাধনা ও তৎকালের মুসলিম প্রকর্ষ তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু এসবের প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। তাই পার্শীর পরিবর্তে ইংরেজিকে রাজভাষা করবার পরামর্শ তিনি শাসকদের দিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য, এর ফলে দেশের জনসাধারণের বিচারালয়ে কিছু সুবিচার পাবে, আর দেশবাসীর পক্ষে ইয়োরোপীয় বিদ্যালাভের পথ সুগম হবে।

রামমোহন ও হিন্দু-সাধনা

পাটনা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে পিতার সঙ্গে রামমোহনের মতান্তর ঘটে। তার ফলে তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেন ও তিব্বত গমন করেন। তিব্বত গমনের বাসনা হয়তো পাটনা-বাস-কালেই তাঁর হয়েছিল, তাতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল, পার্বত্য জাতিদের বিচিত্র পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়লাভও তাঁর অবাঞ্ছিত ছিল না। এইভাবে নরপূজা পিশাচ-পূজা ইত্যাদি বিচিত্র অজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়েই নিরাকার একেশ্বরবাদের দিকে তাঁর অত প্রবণতা জন্মেছিল মনে হয়।

---

৩৯. সিয়ারুল্‌ মোতা অখেরীন এর লেখক সৈয়দ গোলাম হোসেন রামমোহনের অব্যবহিত পূর্বের লোক। তাঁর স্বদেশ-প্রেম ও কাণ্ডজ্ঞান প্রশংসার্হ, কিন্তু ধর্মে তিনি রামমোহনের মতো উদারহৃদয় নন।

www.nagorikpathagar.org

তিব্বত প্রভৃতি ভ্রমণের পরে তাঁর জীবনের বড় ঘটনা হচ্ছে কিছুকাল কাশীবাস ও হিন্দুশাস্ত্র চর্চা। এই চর্চা তিনি যে গভীরভাবে করেছিলেন পণ্ডিতেরা সে কথা স্বীকার করেন। আর রামমোহন যত শাস্ত্রের চর্চা করেছিলেন তার মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রের চর্চাই এ পর্যন্ত বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে। হিন্দু-সমাজও তাঁকে আশানুরূপভাবে গ্রহণ করেন নি, তবু তাঁরাই যে তাঁকে বেশি গ্রহণ করেছেন এ সত্য।

নগেন্দ্র-চট্টোপাধ্যায় কৃত রামমোহন-চরিতকথায় তাঁর হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বেদান্তের শঙ্করভাষ্য অবলম্বন করলেও রামমোহন জোর দিয়েছেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের উপরে, আর শঙ্করাচার্য জোর দিয়েছেন সন্ন্যাসের উপরে, এসব কথা বলা হয়েছে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে পূর্ণ অদ্বৈতবাদ না বলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা দ্বৈতবাদ বলতে চান। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রাধাকৃষ্ণন শঙ্করদর্শনের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মনে হয়, হিন্দু-মনীষার এই শ্রেষ্ঠ উপার্জন অদ্বৈতবাদ রামমোহন যে-ভাবে বুঝেছিলেন সেইভাবেই তা বোঝা হয়ত সঙ্গত। যথা—

> Sankara does not assert an identity between God and the world but only denies the independence of the world..... If we raise question as to how the finite rises from out of the bosom of the infinite, Sankara says that it is an incomprehensible mystery, maya. We know there is the absolute reality, we know that there is the empirical world, we know that the empirical world rests on the absolute; but the how of it is beyond our knowledge..... The greatest thinkers are those who admit the mystery (of the relation of God to the world) and comfort themselves by the idea that the human mind is not omniscient Sankara in the East and Bradley in the West adopt this wise attitude of agnosticism. (Hindu View of Life, pp. 66–68).[৪০]

---

৪০. শঙ্করের মত এ নয় যে ব্রহ্ম ও জগৎ অভেদ, তিনি শুধু জগতের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করেন। .... অসীম থেকে সসীমের উৎপত্তি কেমন করে হয় এ প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলেন– এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য, মায়া। আমরা জানি, শুদ্ধ সত্তা আছেন আর ব্যবহারিক জগৎ আছে, আর এই শুদ্ধ সত্তার উপরে ব্যবহারিক জগৎ নির্ভরশীল; কিন্তু কেমন করে' সেটি আমাদের জ্ঞানের বাইরে। .... শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলেরা ব্রহ্ম ও জগতের এই রহস্যময় সম্বন্ধের কথা স্বীকার করেন। তাঁরা জানেন যে মানবমন সর্বজ্ঞ নয়। প্রাচ্যের শঙ্কর ও পশ্চিমের ব্র্যাডলি জ্ঞানিজনসুলভ এই অজ্ঞেয়াতাবাদের সমর্থক।

www.nagorikpathagar.org

অন্যত্র

No theory has ever asserted that life is a dream and all experience events are illusions. One or two late followers of Sankara lend countenance to this hypothesis, but it cannot be regarded as representing the main tendency of Hindu thought (p. 69).[৪১]

রামমোহনের হিন্দু-শাস্ত্রের বিচার তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের চির-বিস্ময়ের সামগ্রী। হিন্দুর অতলস্পর্শ অতীতের অন্তহীন শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করে' তিনি যে-ভাবে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ও লোকশ্রেয়ঃ- তত্ত্ব তাঁদের উপহার দিয়েছেন, সেটি যে কত বড় দান সে-সম্বন্ধে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের সর্বসাধারণ এ পর্যন্ত তেমন অবহিতচিত্ত হন নি এইজন্য যে তাঁর সিদ্ধান্তকে তাঁরা হিন্দু সাধনা সম্বন্ধে বাস্তবিকই একটি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বলে ভাবতে পারেন নি। যে কারণেই হোক প্রতীক-উপাসনার সঙ্গে হিন্দু-সাধনা বহুকাল ধরে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে। এই প্রতীক-উপাসনাকে কোনো কোনো হিন্দু-সাধক অপকৃষ্ট সাধনা জ্ঞান করেছেন; কিন্তু এটি সে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য (অথবা— জীবনের জন্য) হানিকর এমন নির্মম কথা রামমোহনের মতো এতখানি জোর দিয়ে আর কোনো হিন্দু-সাধক বলেছেন মনে হয় না। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের "ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা" গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে শিবনারায়ণী সম্প্রদায় বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন; কিন্তু এ রকম প্রতীক উপাসনার বিরোধী একেশ্বরবাদী-দল হিন্দু-সমাজে এত কম যে এঁদের গণনার ভিতরে না আনলেও চলে। প্রতীক-উপাসনার প্রতি এরূপ বিরূপতার জন্যই যে রামমোহন তাঁর সমকালে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের দ্বারা তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন ও বর্তমান কালেও অনেকখানি অবহেলিত হচ্ছেন এ সত্য। এর সঙ্গে তাঁর অপ্রিয় হবার আর একটি বড় কারণ হচ্ছে— তাঁর বেশভূষা হিন্দুর চিরপরিচিত চিরশ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর বেশভূষা নয়। রামমোহন তাঁর বেশভূষা ও আহারাদি প্রবলভাবেই সমর্থন করেছেন, তিনি তাঁদের বোঝাতে চেয়েছেন— সুরুচিপূর্ণ বেশ মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয়, আর মাংস-আহারাদির দ্বারা তাঁদের নষ্ট বীর্যের পুনরুদ্ধার হতে পারবে।

রামমোহনের হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিতদেরও তেমন শ্রদ্ধার বস্তু হয় নি হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে পরমহংস রামকৃষ্ণের সিদ্ধান্তের ফলে। তাঁর সুবিখ্যাত বাণী "যত মত তত পথ" দেশের লোকদের অনেক বেশি স্বস্তি দিয়েছে রামমোহনের "লোকশ্রেয় ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র" এই মন্ত্র থেকে। আর "যত মত তত

---

৪১. এমন কোনো মত নেই যাতে বলা হয়েছে যে জীবন স্বপ্ন, আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা অলীক। শঙ্করের বহুপরের দুই একজন শিষ্যের ভিতরে এই মতের কিছু সমর্থন পাওয়া যায়, কিন্তু সেই দিকেই যে হিন্দু-চিন্তার বিশেষ প্রবণতা তা বলা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

পথ" বাণীতে দেশের লোক শুধু স্বস্তিলাভই করে নি, একালের কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল, যেমন ফরাসী ভাবুক রোমাঁ রোলাঁ ও ভারতের স্বনামধন্য মহাত্মা গান্ধী, এই বাণীকে বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে' মত প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁর যুক্তি এই :

> I have never seen anything fresher or more potent in the religious spirit of all ages than this enfolding of all the Gods existing in humanity, of all the faces of truth, of the entire body of human Dreams, in the heart and the brain, in the Paramahangsa's great love and Vivekananda's strong arms. .... But you must not suppose that this immense diversity spells anarchy and confusion....... Each note has its own part == polyphony reduced to unison with the excuse that your own part is most beautiful! Play your own part perfectly and in time, but follow with your ear the concert of the other instruments united to your own........ And this teaching condemns all spirit of propaganda, whether clerical or lay, that wishes to mould other brains on its own model (the model of its own God or of its own Non-god who is merely God in disguise).[৪২]

এই সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অভিমত উদ্ধৃত করেছেন :

---

৪২. পরমহংসের মহান প্রেমে ও বিবেকানন্দের বীর্যে যেমন মিলন ঘটেছে বিশ্বমানবের সমস্ত উপাস্য দেবতার, সত্যের সর্ববিধ প্রকাশের, মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমস্ত কল্প-রূপের, যুগযুগান্তের ধর্মভাবের ইতিহাসে এর চাইতে সজীবতর ও সতেজতর কোনো কিছু আমার চোখে পড়ে নি।.... কিন্তু একথা মনে করবার হেতু নেই যে এই বিরাট বৈচিত্র্য একটি বিরাট অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা মাত্র। .... এই সুর-সামঞ্জস্যের প্রত্যেক সুরেরই বিশিষ্ট স্থান আছে। কোনো সুর-সমষ্টিকেই এই বলে নীরব করে দেওয়া চলবে না (তাতে বহুসুর পরিণত হবে একসুরে) যে, কোনো একজনের বাজানো সুর সব চাইতে ভাল। যার যা বাজাবার তা চমৎকার করে' বাজাক, কিন্তু তার সেই সুরের সঙ্গে অন্যান্য যে-সব সুরের সঙ্গত হচ্ছে তা সে কান পেতে শুনুক। .... এই মতে সর্বপ্রকার প্রচারব্রত॥ তা ধর্ম-বিষয়ক হোক বা কোনো জাগতিক বিষয়ক হোক॥ নিন্দনীয়; কেননা এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের বুদ্ধি-বিচার নিজেদের ছাঁচে গড়া। এক্ষেত্রে সেশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী দুইই তুল্যমূল্য॥ নিরীশ্বরবাদ ছদ্মবেশী সেশ্বরবাদ মাত্র।

www.nagorikpathagar.org

"My veneration for other faiths is the same as for my own faith. Consequently the thought of conversion is impossible..... Our prayer for others ought never to be: "God, give them the light thou hast given to me!" –but "God, give the all them light and truth they need for their highest development."[৪৩]

মানুষে মানুষে মৈত্রীকামী রোলাঁ ও গান্ধী যে গভীর বেদনা থেকে এসব কথা বলেছেন তা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য নয়। রোলাঁ স্পষ্টই বলেছেন—

> At this stage of human evolution where in both blind and conscious forces are driving all natures to draw together for "Co-operation or death", it is absolutely essential that the human consciousness should be impregnated with it until this indispensable principle becomes an axiom: that every faith has an equal right to live, and that there is and equal duty incumbent upon every man to respect that which his neighbour respects. (Life and Gospel of Vivekananda, p. 353°55).[৪৪]

কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু হলেই সব সময়ে যে কার্যসিদ্ধ হয় তা নয়। মানুষে মানুষে যে-মৈত্রীর কামনা করে' এই সব মনীষী এই ব্যবস্থা সমীচীন মনে করেছেন এর প্রবর্তনের ফলে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি না, অথবা মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা সত্যতার প্রয়োজন আছে কি না, সে-সবও বিচার্য।

ধর্ম যদি ললিত কলার মতো মুখ্যত মানস ব্যাপার হতো তাহলে জগতের সমস্ত ধর্মকে এমন পরম আদরে সঞ্জীবিত রাখবার চেষ্টা হতো মানুষের সভ্যতার এক প্রকৃষ্ট

---

৪৩. স্ব-ধর্মের প্রতি আমার যে-শ্রদ্ধা পর-ধর্মেরও প্রতি আমার সেই শ্রদ্ধা। সেই জন্য ধর্মান্তরগ্রহণ আমার চিন্তায় অসম্ভব। আমরা যেন অন্যের জন্য এই প্রার্থনা না করি॥ ভগবান আমাকে যে আলোক তুমি দান করেছ সে-আলোক তুমি তাদের দাও; এর পরিবর্তে আমাদের প্রার্থনা যেন এই হয়॥ ভগবান শ্রেষ্ঠ পরিণতির জন্য যার যে-আলোক ও যে-সত্যের প্রয়োজন তুমি সেই সব তাকে দাও।

৪৪. মানব-সমাজে ক্রম-অভিব্যক্তির এই অবস্থায় অন্ধ ও সচেতন শক্তি দুইই সমস্ত প্রকৃতির মানুষকে একত্র করেছে "সহযোগিতার জন্য অথবা ধ্বংসের জন্য" এ সময়ে শ্রেষ্ঠতম প্রয়োজন হচ্ছে মানবের অন্তর্লোকে এই আবির্ভাব ঘটা॥ প্রত্যেক ধর্মেরই বেচে থাকবার তুল্য অধিকার আছে, আর প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তার প্রতিবেশীর ধর্ম-বিশ্বাস শ্রদ্ধা করে চলা। এটিকে একটি স্বতঃসিদ্ধান্তরূপে পরিণতি করা চাই।

www.nagorikpathagar.org

নিদর্শন। কিন্তু সাধারণত জীবনে ও ললিতকলায় যে প্রভেদ, ধর্মে ও ললিতকলায়ও সেই প্রভেদ। ধর্ম ও জীবনের অভেদত্বের কারণ, ধর্ম একই সঙ্গে জীবনের নিয়ামক ও জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু ললিতকলাকে তেমনিভাবে জীবনের নিয়ামক বলা যায় না। জীবন অস্থির অপূর্ণাঙ্গ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল; ললিতকলা অচঞ্চল, পূর্ণাঙ্গ, সৌন্দর্য-লোকে অবিশ্বর; জীবন সত্য ললিতকলা স্বপ্ন। ধর্ম কখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অথবা ব্যক্তি বিশেষের এমন মানস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সেটি স্বাভাবিক বা সাধারণ ব্যাপার নয়। স্বভাবত ধর্ম মানুষের মানস ব্যাপার ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যেমন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অসম্ভব ও অসত্য, ধর্মের ব্যাপারেও তেমনি নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য অবাঞ্ছিত, তাতে ধর্মের যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য— মানুষের বৃহত্তর সমাজ-জীবনে কল্যাণের আয়োজন— তাইই ব্যাহত হয়। মানুষের বয়স কম হয়নি, অভিজ্ঞতাও কম হয় নি। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আজ এ কথা সে বুঝেছে যে জ্ঞান ও সত্যের অভিমানের মতো বিড়ম্বনা আর নেই। কিন্তু এই নূতন জ্ঞান লাভ করে' সে যদি ধর্মে ধর্মে Laissez-faire[৪৫] নীতি অবলম্বন করে তা'হলেও কম ভুল সে করবে না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের চিত্ত বিকশিত হয়। তার কর্মজীবনও বিকশিত হয়। এই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই বিরাট জগতের সাহচর্য যে তার লাভ হয়, সেটি তার জন্য অমূল্য। রোঁলা ও গান্ধীর এই নূতন ব্যবস্থার যে শান্তি ও স্বস্তি, লোক-সমাজে সতেজ ও সন্ধান-তৎপর মানসিকতা সৃষ্টির সহায়ক না হবার সম্ভাবনাই তার বেশি।

হয়ত বলা হবে, অন্তত বিভিন্ন জাতীয় বা সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা তো চাইই, নইলে মানুষ পরস্পরকে চিনবে ও বুঝবে কেমন করে? এই চিন্তা-ধারার মূলেও রয়েছে একটি বড় ভুল— অতীত ও কতকাংশে বর্তমানকে এ ক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে চিরকালের পরিচায়ক বলে'। অতীতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন দুর্লঙ্ঘ্য ভৌগোলিক ক্ষেত্রে লালিত হয়েছিল। কতকটা সেই ব্যবধানের প্রভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য হতে পেরেছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু আজ সে-ব্যবধান চূর্ণ হবার পথে দাঁড়িয়েছে, মানুষের কৌতূহলও বর্ধিত হয়ে চলেছে, জাতিতে জাতিতে আন্তর ও বাহ্য স্বাতন্ত্র তাই পরস্পরের অজ্ঞাতসারেও নিশ্চিহ্ন হবার পথে চলেছে। মানব সভ্যতার এই এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও যদি বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা type এর কথাই ভাবা হয়, তাহলে ভাবনার পরিচয় যা দেওয়া হয় তার চাইতে বেশি পরিচয় দেওয়া হয় অতীত প্রীতির। কোনো কোনো চিন্তাশীল ভবিষ্যৎ মানবসমাজের একাকারত্বের কথা ভেবে আনন্দ পান না এই ধারণা থেকে যে তেমন একাকারত্বে হবে বর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন, সুতরাং অসুন্দর। কিন্তু কত অনাবশ্যক ও অর্থহীন বৈশিষ্ট্যের শৃঙ্খলে এখনো মানুষ বন্দী, এখনো কত অবিকশিত তার সৃষ্টিশক্তি, এ

৪৫. ীটধ্রণড়-তটধরণ (ীর্ন টফমভণ) –যে যার পথে চলুক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই নীতির সমর্থিত ব্যক্তিত্ববাদ অচিরেই সমষ্টি-বাদের দ্বারা পরাভূত হয়।

www.nagorikpathagar.org

চিন্তা মনে স্থান দিতে পারলে সেই বর্ণ ও বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য্যের কথা ভেবেই তাঁরা আহ্লাদিত হবেন।

ধর্ম জ্ঞানেরই প্রকার-ভেদ, এই কথাটি তেমন স্পষ্টভাবে মনে না রাখার ফলেই ধর্ম সমস্যা মানুষের জন্য এমন অশোভন ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যুগ যুগ ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের, অন্য কথায়, প্রত্যয়ীভূত জ্ঞানেরও, উৎকর্ষ লাভ হয়েছে। একালে ধর্মের উপরে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির প্রভাবও সেই একই সত্যের পানে অঙ্গলি নির্দেশ করছে। জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে যেমন অপ্রতিহত সন্ধানপরতা ও কল্যাণের আয়োজন ভিন্ন আর কোনো দিকে লক্ষ্য রাখলে শেষ পর্যন্ত বিড়ম্বিতই হতে হয়, ধর্মের ব্যাপারেও তেমনি সত্য ও কল্যাণ জিজ্ঞাসাকে কিছুমাত্র শিথিল করবার প্রয়োজন আছে তা মনে হয় না। রামকৃষ্ণ ও গান্ধীর কর্মজীবনের দিকে চাইলে দেখা যায় তাঁরাও যথাসম্ভব অভিমান বিবর্জিত হয়ে তাঁদের আবিস্কৃত সত্যপথ অনুসরণ করে চলেছেন, তাতে অন্যের অন্তরে কতখানি বেদনা বাজলো সেটি তাঁদের চিন্তার মুখ্য বিষয় নয়।

তাই মনে হয় মানব-সভ্যতার নব সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পেরে রামমোহন যে তাঁর দেশবাসীকে অতীত বা বর্তমান-প্রীতির পরিবর্তে লোকশ্রেয়ঃ ও বিচারবুদ্ধির মন্ত্র দান করেছিলেন, সে-মন্ত্রের যথাযোগ্য সমাদার হয় নি সেই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত কোনো ত্রুটির জন্য নয়— তাঁর দেশবাসীর সত্যপ্রীতির ও বৃহত্তর দেশের কল্যাণকামনার অভাবের জন্যই।

রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্র-বিচারে এত চমৎকারিত্ব রয়েছে, পাণ্ডিত্য ও বিচার-বুদ্ধির এমন স্ফুরণ সেখানে হয়েছে যে সে-সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর তেমন কৌতূহল না থাকা তার মনন-শক্তির উৎকর্ষের পরিচায়ক হয়ত নয়। এই সব বিচারে তাঁর কোনো কোনো শাস্ত্র-ব্যাখ্যা খুবই নূতন, যেমন গীতার এই সুবিখ্যাত শ্লোকের ব্যাখ্যা—

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম।
> যোজয়েৎ কর্মকর্মানি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরন।

গীতার গান্ধীভাষ্যে এর অর্থ লেখা হয়েছে এই : "কর্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিকে জ্ঞানী যেন ওলট পালট না করে, বরঞ্চ সমত্ব রক্ষাপূর্বক ভাল রকমে কর্ম করিয়া তাহাকে যে সর্ব কর্মে প্রেরণা দেয়"। —এইটি এর প্রচলিত ব্যাখ্যা, আর ব্যাখ্যার দ্বারা প্রচলিত আচারপদ্ধতি (প্রতিমাপূজা ইত্যাদি) মান্য করতে বলা হয়। রামমোহন এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই :

> "জ্ঞানবান ব্যক্তি আপনি কর্ম করিয়া অজ্ঞানী কর্মসঙ্গিকে কর্মে প্রবর্তক হইবেন, যেহেতু জ্ঞানির নিষ্কাম কর্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও সেই প্রকার কর্ম করিবেক। সুতরাং জ্ঞানির কদাপি কাম্য কর্মে অধিকার নাই তাঁর নিষ্কাম কর্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম করিবেক। কর্ম-সঙ্গিদের কি প্রকার কর্ম কর্তব্য তাহা ভুরি স্থানে ঐ গীতাতে লিখিয়াছেন। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচান। .... যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ ফল কামনা করিয়া কর্ম

www.nagorikpathagar.org

করিলে সে কর্ম দ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। এবং স্মার্তধৃত ষষ্ঠকন্ধ বচন। .... "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্মহি। ন রাতি রোগিণে পথ্যম বাঞ্ছতেপি ভিষকতমঃ। আপনি জ্ঞানবান ব্যক্তি অজ্ঞানকে সকাম কর্ম করিতে উপদেশ করেন না, যেমন রোগী মনুষ্য কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না।" (গ্রন্থাবলী—পৃষ্ঠা ২১৫)

রামমোহন ও খ্রিস্টধর্ম

রামমোহন তাঁর Precepts of Jesus- a guide to peace and happiness-এর ভূমিকায় বলেছেন, খ্রিস্টের এই যে উপদেশ, অন্যের প্রতি তেমন আচরণ কর যেমন আচরণ তুমি প্রত্যাশা কর, মানুষের নৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক এমন পূর্ণাঙ্গ উপদেশ তিনি আর কোনো ধর্মগ্রন্থে পান নি। ধর্মশাস্ত্র হিসাবে বাইবেলের স্থান তাই অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের চেয়ে উচ্চে তিনি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর সেই বাইবেল ত্রিত্ববাদ, খ্রিস্টের রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব বিবর্জিত বাইবেল। বলা বাহুল্য বাইবেলের এই ধরনের ভক্তের প্রতি বাইবেলের ভক্ত সাধারণের সন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব। খ্রিস্টান সমাজের এই অসন্তোষের ফলেই বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষা নির্ণয়ে তিনি দীর্ঘ তিন বৎসর কাল সুকঠোর পরিশ্রম করেন। তিনখানি সুবিস্তৃত গ্রীক ও-হিব্রুবচন কন্টকিত Appeal to Christian Public তাঁর এই কঠোর পরিশ্রমের ফল। তাঁর এই পাণ্ডিত্য দর্শনে তৎকালীন খ্রিস্টান-জগত চমকিত হয়েছিলেন।

আধুনিক খ্রিস্টান-জগত তাঁর এই খ্রিস্টানশাস্ত্র বিচারের কি মূল্য দেন দুর্ভাগ্যক্রমে সে-বিষয়ে কিছু জানি না। কিন্তু তাঁর দেশবাসীর কাছে এর মূল্য কম হওয়া উচিত নয়। তাঁর এই খ্রিস্টানশাস্ত্র-বিচারের ভিতর দিয়ে এই কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ জীবনকেই তিনি কাম্যজীবন জ্ঞান করতেন।

রামমোহন সাধনা

রামমোহনের খ্রিস্টান-শাস্ত্রের বিচারে দেখা যায়, তিনি নিজেকে খ্রিস্ট-অনুবর্তী বলে প্রচার করেছেন। তাঁর তুহফাতুল, মুওহহিদীন গ্রন্থে কিন্তু দেখা যায়, তিনি "ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ" "প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ" এসবের কিছুই মানেন নি। এজন্য তাঁর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা প্রায় একমত যে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত যুক্তিবাদী, কিন্তু পরে তাঁর সেই শাস্ত্রনিরপেক্ষ স্বাধীন যুক্তিবাদ ধর্মাশ্রিত যুক্তিবাদে পরিণত হয়েছিল; আর মানুষের জন্য এই ধর্মাশ্রিত যুক্তিবাদই তিনি কাম্য জ্ঞান করতেন।

কিন্তু রামমোহন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার অবসর আছে। তাঁর হিন্দুশাস্ত্রের বিচারেও দেখা যায়, তিনি নিজেকে শাস্ত্রানুগামী হিন্দু বলে প্রচার করেছেন ও সেইভাবে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদান্ত আশ্রয় করে হিন্দুর জন্য প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান অপাহরণের চেষ্টা করেছেন। অথচ তাঁর লর্ড আমহার্স্টকে তিনি যে পত্র লেখেন তাতে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভের দুরূহতার কথা বলেছেন, আর বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়

www.nagorikpathagar.org

প্রভৃতির শিক্ষাকে বেশ উপহাস করেছেন। বলা যেতে পারে, বেদান্ত মীমাংসা ন্যায় প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাখ্যাতে তিনি উপহাস করেছেন, প্রকৃত বেদান্ত মীমাংসা ও ন্যায়কে নয়; তাহলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত মধ্যযুগীয় জ্ঞানচর্চার চাইতে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান-দর্শন চর্চাকে তিনি বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। বাইবেলের প্রতি তাঁর কিছু বেশি শ্রদ্ধা থাকলেও এর আলোচনাকালেও তাঁর যুক্তিবাদ বাস্তবিকই যে শিথিল হয়নি তার প্রমাণস্বরূপ এই কয়েকটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে : প্রথমত Precepts of Jesus- a guide to peace and happiness গ্রন্থখানি তিনি বাইবেল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব বিবর্জিত সহজ সরল উপদেশ মালায় বিধাতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা উন্নততর হবে ও তাদের একের অন্যের প্রতি ও সমাজের প্রতি ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত হবে; তাঁর তুহফাতুল মুওহহিদীন গ্রন্থে বিচার বুদ্ধির কার্য-কারিতা সম্বন্ধেও তিনি এই ধরনের কথা বলেছেন যথা,-সব ধর্ম আত্মা ও পরকালের বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত; যদিও এই দুয়ের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় তবু এতে বিশ্বাস তেমন দোষাহ নয় কেননা মানুষ দুষ্কর্ম থেকে নিরস্ত থাকে পরলোকের ভয়ে ও রাজভয়ে। কিন্তু এই দুই প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পান আহার পবিত্রতা শুভ অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে শত শত অকল্যাণকর ও বুদ্ধিমানকর বিশ্বাস সম্মিলিত হয়েছে, ও তাতে মানুষের দুঃখ বেড়ে গেছে। তবু মানুষের অন্তরে এই শক্তি নিহিত আছে যে এই সব বিশ্বাস সত্ত্বেও সে যদি নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন জাতির ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয় তাহলে কি সত্য আর কিইবা অসত্য, তা সে নিরূপণ করতে পারবে আশা করা যায়; ও এইভাবে অর্থহীন ধর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এক অদ্বিতীয় মঙ্গলবিধাতার প্রতি ও সমাজকল্যাণের প্রতি মনোযোগী হতে পারবে। দ্বিতীয়ত— রামমোহনের প্রতিপক্ষ এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, খ্রিস্টধর্মের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী না হয়ে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী হওয়া যায় না; রামমোহন দেখিয়েছিলেন, খ্রিস্টের ভিতরে যা কিছু অলৌকিক বা অসাধারণ সব ঈশ্বর প্রসাদে, তাঁর একান্ত নির্ভর ঈশ্বরের উপরে, আর বাইবেল থেকেই প্রমাণ করা যায় যে ঈশ্বরের সমস্ত আদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পরস্পরের প্রতি কি কর্তব্য তাই শিক্ষা দেওয়া।

তাই আমাদের বলতে ইচ্ছা হয়, তুহফাতুল মুওহ্হিদীন গ্রন্থে রামমোহন যে অলৌকিকতা নিরপেক্ষ একেশ্বরতত্ত্বে ও লোকশ্রেয়বাদে উপনীত হয়েছিলেন পরে এই মতের কোনো বিশেষ পরিবর্তন তাঁর ভিতরে ঘটে নি। যাঁরা এই পরিবর্তন দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত তাঁরা বোধ হয় এই অদ্ভুত ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন নি, তুহফাতুল মুওহ্হিদীন গ্রন্থেও রামমোহন একদিকে যেমন প্রখরযুক্তিবাদী অন্যদিকে তেমনি সহজভাবে ঈশ্বরানুরাগী ও মানব-কল্যাণকামী।

বিলাতগমনের পূর্বে রামমোহন Unitarian (ঈশ্বরের একত্ব-বাদী) খ্রিস্টানদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ড গমনের পরে উভয় শ্রেণীর খ্রিস্টানদের সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করেন ও উভয় দলেই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু লাভ হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো কোনো ধর্মযাজক মত প্রকাশ করেছিলেন

www.nagorikpathagar.org

যে, তিনি ত্রিত্ববাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন এবং আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে ত্রিত্ববাদ পূর্ণভাবেই গ্রহণ করতেন। মিস্ কলেট— লিখিত জীবনীর সম্পাদক এসব কথা গণ্য করেন নি। তবে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে রামমোহনের ভিতরে ধর্ম ব্যাকুলতা চিরদিনই অত্যন্ত প্রবল ছিল; সেই ব্যাকুলতার বশে প্রথম জীবনে তিনি স্বাধীন যুক্তিবাদ গ্রহণ করেন ও পরবর্তী জীবনে যুক্তিবাদের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে' "ধর্মবিশ্বাসে"র দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই মতের স্বপক্ষে তিনি এই প্রমাণটি দিয়েছেন : রামমোহন তাঁর সর্বশেষ রচনায় উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতিস্থাপন সমর্থন করেন। এই বসতি স্থাপনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু তর্ক উত্থাপন করেন, সে-সবের একটি এই উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতি স্থাপনের ফলে ও তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ভারতবাসীর যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা; এই উন্নত ভারতবাসীরা ও ইয়োরোপীয়েরা সম্মিলিত হয়ে ব্রিটিশের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করতেও পারেন; তাহলেও তাঁদের ভিতরে বাণিজ্য-সম্পর্ক থাকবে ও এই নব-আলোকপ্রাপ্ত ভারতবর্ষ এশিয়ার শিক্ষাগুরু হবে। রামমোহনের মূল বক্তব্য এই :

> Americans were driven to rebellion by misgovernment ..... The mixed community of India, so long as they are treated liberally and governed in an enlightened manner, will feel no inclination to cut off its connection with England..... yet if events should occur to effect a separation, still a friendly and highly advantageous commercial connection may be kept up between two free and Christian countries, united as they will be by resemblance of language, religion and manners.[৪৬]

এখানে সম্পাদক মহাশয় এই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রামমোহন তাঁর দেশবাসীদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার কথা ভেবেছেন, এটি সুসিদ্ধান্ত বলে' গ্রহণ করা যায় না কয়েকটি কারণে। প্রথমতঃ যে সমস্ত গণ্যমান্য ইয়োরোপীয় ভারতবর্ষে বসতিস্থাপন করবেন তাঁরা খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ও ভারতের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী হবেন, তাঁদের অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে রামমোহন খ্রিস্টান ভারতবর্ষ বলতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রিয়

---

৪৬. আমেরিকা-বাসীরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল কুশাসনের ফলে। .... ভারতের এই মিশ্রিত জাতি যতদিন সদয় ব্যবহার ও উদার শাসন লাভ করবে ততদিন তারা ইংল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করবে না। ..... ঘটনাক্রমে সম্পর্ক যদি ছিন্নই হয় তবু এই দুই স্বাধীন ও খ্রিস্টান দেশের মধ্যে বন্ধুভাব ও পরস্পরের কল্যাণ সাপেক্ষ বাণিজ্যসম্পর্ক থাকবে। ভাষা ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের সাদৃশ্য তখন এই দুই দেশের ভিতরে যোগ রক্ষা করবে।

www.nagorikpathagar.org

খ্রিস্টান নীতির Do unto others as you like to be done by দ্বারা প্রভাবিত ভারতবর্ষকে তিনি খ্রিস্টান-ভারত বলতে পারেন। তৃতীয়তঃ তাঁর দেশবাসীরা সোজাসুজি যিশুর উন্নতর ধর্মে দীক্ষিত হবে এ চিন্তা রামমোহনের জন্য একান্ত অপ্রীতিকর হয়ত ছিল না কেননা কোনো রকমে তাঁর দেশবাসীর ভালোর দিকে একটু পরিবর্তন হোক এ কামনা তিনি করতেন, তবু এই চিন্তা যে তাঁর খুব প্রীতিকরও ছিল না তা বুঝতে পারা যায় আমেরিকার Bishop Ware কে লিখিত তাঁর এই পত্রাংশ থেকে—

> I am led to believe from reason, what is set forth in the scripture, that "in every nation he that feareth God and worketh righteousness is accepted with him," in whatever form of worship he may have been taught to glorify God.[৪৭]

Bishop Ware কে লিখিত এই পত্রে আরো একটি লক্ষ্য করবার কথা আছে। রামমোহনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ভারতে খ্রিস্টধর্মের প্রসারের সম্ভাবনা কিরূপ; তাতে তিনি শেষ পর্যন্ত এই উত্তর দেন বিজ্ঞান ইংরেজি সাহিত্য ও ধর্ম-নিরপেক্ষ সুনীতি শিক্ষার আয়োজন যদি এদেশবাসীর জন্য তাঁরা করতে পারেন তবে সেই ভাবেই তাঁরা এদেশবাসীর মনকে খ্রিস্ট-ধর্ম গ্রহণের উপযুক্ত করতে পারেন।

এই থেকে রামমোহনের সংস্কার চেষ্টার অথবা সমগ্র সাধনার স্বরূপ জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন হয়। এই সম্পর্কে তাঁর সাধনার দুইজন শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ, যে মত প্রকাশ করেছেন তার মর্যাদা নিরূপণ প্রথমেই কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্বমানবের একত্ববোধ তাঁর সমকালে জগতে আর কারো ভিতরে এমন পূর্ণভাবে দেখা যায় না। বর্তমান জগৎ সহযোগিতার জগৎ, স্বদেশের প্রাচীন অবিনশ্বর যা-কিছু, তা আয়ত্ত করে' অন্যান্য সাধনার দিকে তিনি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সকল কথার প্রমাণ রামমোহনের বিরাট সাধনার ভিতরে নিশ্চয়ই আছে— যদিও রামমোহনের সমকালে শুধু তাঁকেই বিশ্বমানবের একত্ববোধের পূর্ণ অধিকারী বলে ভাবতে আমাদের কিছু আপত্তি, কেননা রামমোহনের সমকালে, অথবা কিছু পূর্বে, মহামনীষী গ্যেটের আবির্ভাব; নবযৌবনেই তিনি নিজেকে বলেছিলেন Welt-kind (বিশ্বসন্তান); আর পরিণত বয়সে তাঁর বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ বোধ সুবিদিত। তবু যিনি দূর স্পেনের জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার লাভে উল্লসিত হয়ে নিজ-ব্যয়ে এক

---

৪৭. (খ্রিস্টান) শাস্ত্রে এ-কথা আছে, আর বুদ্ধির সাহায্যেও আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি, যে, প্রত্যেক জাতির ভিতরে যারা ঈশ্বরের ভয় রাখে ও ধর্ম আচরণ করে তারা তাঁর (যীশুর) করুণা লাভ করে, তা যে-ভাবেই তারা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে শিখুক।

www.nagorikpathagar.org

বড় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, ও Neples-এর পরাধীনতা-দুঃখের অবসান হয়নি জানতে পেরে জগতের অত্যাচারীদের উদ্দেশ্যে এই অভিসম্পাত উচ্চারণ করেছিলেন—

> I consider the cause of the Neapolitans as my own and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotims have never been, and never will be, ultimately successful.[৪৮]

মানুষের সঙ্গে তাঁর এই সহজ যোগ জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার যোগের চাইতে নিবিড়তর বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

রামমোহনের সাধনার স্বরূপ-নির্দেশ সম্পর্কে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের মন্তব্য পরম হৃদয়গ্রাহী, কল্পনার সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। তিনি রামমোহনকে দাঁড় করিয়েছেন জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মর্মোদ্‌ঘাটক রূপে। তাঁর মতে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা হচ্ছে বিশ্বজনীনতার এক একটি রূপ, এর কোনটি মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটির লক্ষ্য হওয়া উচিত তার সর্বোচ্চ পরিণতির দিকে। বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রের আলোচনা করে রামমোহন তাদের সেই সর্বোচ্চ পরিণতির পথ সুগম করতে চেষ্টা করেছেন। —কিছু ভিন্ন বেশে এই চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে। এই চিন্তাধারা দার্শনিকপ্রবর রাধাকৃষ্ণনের লেখনীতে রূপ পেয়েছে এইভাবে—

> .... If we believe that every type means something final, incarnating a unique possibility, to destroy a type will be to create a void in the scheme of the world. (Hindu View of Lief).[৪৯]

এই চিন্তাধারা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যও নিবেদন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মের যে-রূপ সহজভাবে প্রতিদিন আমাদের সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে সেই পরিচিত রূপের পানে এঁরা তাকান নি, এঁদের আলোচিত ধর্ম ভাবলোকের ব্যাপার— সেখানে কোনো type-কে পূর্ণাঙ্গ ও অবিনশ্বর ভাবলে আপত্তির কারণ তেমন ঘটে না।

এই সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা ভাববার আছে। আচার্য রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ "স্বাতন্ত্র"-বাদী চিন্তাশীলেরা ভারতের জাতিভেদে দেখেছেন প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা জাতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার একটি প্রয়াস। হয়ত তাঁদের এই অভিমতের মূলে

---

৪৮. নেপলস-বাসীদের দুঃখ আমারও দুঃখ বলে আমি জ্ঞান করি–তাদের শত্রু আমাদেরও শত্রু। যারা স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের সমর্থক তারা কখনো সফলকাম হয়নি আর শেষ পর্যন্ত কখনো সফলকাম হবে না। –এইটি একটি পত্রাংশ। পত্রখানি বাকিংহাম সাহেবকে লেখা, তারিখ– ১১ই আগস্ট, ১৮২১।

৪৯. যদি আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক সভ্যতা হচ্ছে এক একটি চরম পরিণতি, এক অতুলনীয় সম্ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করেছে তার ভিতরে, তবে এর একটি ধ্বংস হলে জগদবিধানে অভাব দেখা দেবে।

www.nagorikpathagar.org

সত্য আছে; কিন্তু এর ফল কি হয়েছে সেটিও বিচার্য। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিচ্ছিন্নতা ভারতের পতনের এক বড় কারণ অনেক মনীষী এই মত ব্যক্ত করেছেন; তারপর এই বিচ্ছিন্ন বা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত অংশসমূহ যে কালে অসুন্দর বৈ সুন্দর হয় নি তার পরিচয় পাওয়া যায় রামমোহনের সমসাময়িক ব্রাহ্মণ-সমাজের জীবনে —তাঁরা পূর্বপুরুষের সাধনা বিস্মৃত হয়ে রামমোহনের উদ্ধৃত উপনিষৎ-বচনাবলী ভেবেছিলেন রামমোহনের নিজের রচিত শ্লোক বলে। আর হিন্দু সমাজের এই বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহে শক্তি-তরঙ্গ খেলছে তখন যখন দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দের মতো স্বতন্ত্র-ধ্বংসকারীর আবির্ভাব সেখানে ঘটেছে।

স্বাতন্ত্র্য-বাদের বড় অপরাধ হয়ত এই যে এর প্রভাবে মানুষে মানুষে অপরিচয়ের, সুতরাং অপ্রেমের, সৃষ্টি হয় —সৃষ্টিধর্মী কৌতূহলবৃত্তিরও খর্বতা সাধন হয়। সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যলোভীর কোনো সার্থকতা হয়ত নেই; পারশ্য সর্বপ্রকারে আরবের বশ্যতা স্বীকার করেছিল কিন্তু জগতে পারশ্যের বিলোপ-সাধন হয় নি; ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায়, আমাদের মধুসূদন সর্বপ্রকারে স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বাঙালীত্ব ও মানবত্ব কিছুই পরিম্লান হয় নি— হয়ত বা উজ্জ্বলতর হয়েছে। রামমোহনকে বলা হয় প্রাচীন সত্যদৃষ্টা ঋষির যোগ্য বংশধর, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার প্রয়াস তিনি যা করেছেন তার চাইতে অনেক বেশি করেছেন স্বাতন্ত্র্য ধ্বংসের ও সর্ব অভিমানশূন্য সত্যোপলব্ধির প্রয়াস।

বাস্তবিক, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ইত্যাদি প্রাচীন নামে রামমোহনকে পরিচিত করতে যাওয়া অসার্থক বলেই মনে হয়। তিনি ছিলেন সহজভাবে সত্যজিজ্ঞাসু- আর জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা হয়ত এই সহজ পরিচয়েই পরিচিত। কিন্তু এই সহজ সত্য-জিজ্ঞাসার প্রেরণাও মানুষ ধর্ম-সংস্কারক সমাজ-সংস্কারক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি বহুকিছু হতে পারেন, রামমোহন এর কোন শ্রেণীর অর্ন্তগত? বলা বাহুল্য জীবন এক অখণ্ড ব্যাপার, তাই কোনো শক্তিমান একই সঙ্গে ধর্ম-সংস্কারক সমাজ-সংস্কারক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হতে পারেন। তবু বিশেষ বিশেষ দিকে শক্তিমানদের প্রবণতা দেখা যায়— রামমোহনের প্রবণতা কোন্ দিকে?

ইতিহাসে রামমোহনের পরিচয় এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা রূপে, যদিও তিনি নিজে বার বার বলেছেন কোনো নূতন ধর্মমতের প্রবর্তক তিনি নন। কিন্তু চিন্তাশীল মাত্রেই নূতন কিছুর প্রবর্তক, কেননা জগৎ চিরনূতন, কাজেই তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে এক নূতন মতের প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। একালের অনেক শিক্ষিত বাঙালীর অভিমত, রামমোহনকে ধার্মিক পুরুষরূপে না দেখে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাশালী সমাজ-সংস্কারক রূপে দেখাই সঙ্গত; কেননা, তাঁদের মতে, ধর্মভাবের যে মূল কথা বিশ্বাতীত কোনো শক্তিতে একান্ত আত্মসমর্পণ, সেই অহমিকাপরিশূন্য আত্মসমর্পণ তাঁর বিচিত্রবাদ-প্রতিবাদের ভিতরে ভিতরে দুর্লভ। কিন্তু এই অভিমত তেমন মূল্যবান নয় বলেই মনে হয় কেননা রামমোহনের সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের উৎস-স্বরূপ যে অবিচলিত মানবকল্যাণ-বোধ তার প্রতি এর দৃষ্টি নেই। রামমোহনের নিজের এই মন্তব্যটিও এই সম্পর্কে স্মরণীয়— "ধর্ম যদি ঈশ্বরের', রাজনীতি তবে কি শয়তানের?"

www.nagorikpathagar.org

যে-সম্প্রদায়ের তিনি নেতা তাকে বর্তমানে একটি ভক্ত-সম্প্রদায় বলা চলে; কিন্তু ধর্মজীবন সম্বন্ধে রামমোহনের নিজের ধারণা অনেক ব্যাপক, অভিনবত্বও তাতে কম নয়। প্রথমতঃ একটি বিশেষ ধর্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব উদ্ভাবনের দিকে তাঁর দৃষ্টি বেশ কম। সত্য বটে, তিনি এক নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনার কথা বলেছিলেন ও নাস্তিকতার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এ সব বিষয়ে অনাবশ্যকভাবে ব্যস্ত তিনি ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই দুইটি ব্যাপার থেকে ঃ হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতার তিনি বিরোধী হয়েছিলেন কেননা তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল—

> Hindu Idolatry, more than any other pagan worship, destroys the texture of Society (Introduction to the Vedanta);[৫০]

কিন্তু যখন তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বলেছিলেন তাঁরা প্রকৃতই মূর্তিপূজা করেন না, মূর্তির ব্যাপদেশে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের পূজা করেন, রামমোহন তাঁদের এই উক্তি যথার্থ বলে স্বীকার করেন নি, তবু বলেছিলেন, হিন্দু-সমাজের লোকেরা মূর্তিপূজার যে এমন রূপক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেছেন এ শুভ লক্ষণ। আর বিলাতে গমন করে ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশেছিলেন তার কারণ মনে হয় এরূপ ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁদের সমগ্র জীবনের উৎকর্ষ। দ্বিতীয়তঃ সুফীমত, যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মসাধন-প্রণালী তিনি ব্যবহার করেছিলেন দেহ ও মনের উৎকর্ষ বিধানের উপাদান রূপে। কিন্তু সেই উৎকর্ষ-সমন্বিত দেহমনের ব্যবহার করেছিলেন জ্ঞানান্বেষণে ও মানব সেবায়, অর্থাৎ তাঁর চারপাশের লোকদের দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি বিধানে। এদেশের প্রাচীন অকল্যাণকর প্রথা-সমূহের বিলোপ- সাধন উন্নতর শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অত্যাচারিত কৃষকদের আর্থিক স্বাচ্ছল্যবিধান, দেশের সর্বসাধারণের জন্য উন্নততর বিচার ব্যবস্থার প্রচলন, ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহনের অশেষ প্রয়াসের কথা সুবিদিত। শুধু দুঃখ এই, এই প্রাণপ্রদ চিরন্তন ধর্ম-ভাগ্যবান জাতির লোকেরা যার মর্যাদা উপলব্ধি করতে প্রায়ই ভুল করেন না— আমাদের দেশের ভাবুক ও কর্মীদের যথাযোগ্য অনুধাবনের বিষয় হয়েছে এ কদাচিৎ।

গ্যেটে সম্বন্ধে ক্রোচে বলেছেন, অল্প বয়সেই তাঁর চিত্তের আশ্চর্য বিকাশ সাধন হয়েছিল, আর আমৃত্যু তা অক্ষুণ্ন ছিল। রামমোহন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তাঁর যৌবনের তুহফাতুল মুওহ্হিদীন গ্রন্থেই তাঁর মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর বিভিন্ন ধর্মের আলোচনাকে গণ্য করা যেতে পারে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে সমস্ত বক্রতা থেকে উদ্ধার করে ঋজু করাবার প্রয়াস রূপে। "তুহফাতুল মুওহ্হিদীন" এর মস্তিষ্ক ও বিভিন্ন জনহিত-প্রচেষ্টার মানব-প্রেম ও কর্মশক্তি-রামমোহনের প্রতিভার মর্যাদা এ-সব ক্ষেত্রে অন্বেষণ না করলে তাঁর প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনাই বেশি।

রামমোহন শতবার্ষিকী—ঢাকা।

---

৫০. অন্যান্য পদ্ধতির প্রতীক-উপাসনার চাইতে হিন্দু-পৌত্তলিকতা সমাজ-বিধানের সমধিক ক্ষতিকর।

www.nagorikpathagar.org

গ্যেটে

সুবিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচে গ্যেটে সম্বন্ধে যে বইটি লিখেছেন তাতে গ্যেটের মনীষা ও কাব্য সম্বন্ধে নানা বিচার বিশ্লেষণের পর বলেছেন— সাহিত্যের ক্রমবর্ধনের ধারায় গ্যেটের স্থান কি তা নির্দেশ করতে তিনি অক্ষম। বলা বাহুল্য, এ অক্ষমতার অন্য নাম আপত্তি, কারণ তাঁর মতে— প্রত্যেক কবি হচ্ছেন এক একজন স্বতন্ত্র স্রষ্টা, আর তাঁর সৃষ্টির বিষয় হচ্ছে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবনের সঙ্গে যার অবসান; পরে পরে যারা আসেন তাঁরা যদি সত্যকার কবি হন তবে নূতন-কিছু সৃষ্টি করেন, আর তা না হলে অনুকরণ করেন, কিন্তু অনুকারীর স্থান কাব্যের ইতিহাসে সত্যই নেই। —তবু তিনি স্বীকার করেছেন—

> ..... in Goethe's poetry, in his rich, varied, impressionable and highly intelligent mind were mirrored for the first time in conspicuous fashion many sides of the modern spirit.[৫১]

অনেক সাহিত্যিকই গ্যেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব চাইতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বোধ হয় কার্লাইলের। তিনি তাঁর Hero and Hero worship গ্রন্থে Hero as man of letters অধ্যায় গ্যেটের কথা দিয়ে শুরু করেছেন, এবং গ্যেটের প্রতিভা যে জগতে এক নূতন বিস্ময়ের সামগ্রী, যে-হজরত মোহাম্মদের তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন তাঁর প্রতিভার চাইতেও যে গ্যেটের প্রতিভা উচ্চতর গ্রামের, ইত্যাদি কথা বলবার পর বলেছেন— গ্যেটের কথা থাকুক, কেউ আপাতত তাঁকে বুঝবে না। এই বলে তিনি রুসো বার্ণস প্রমুখ সাহিত্যিকদের মাহাত্ম্য কীর্তনে মনোনিবেশ করেছেন। —কিন্তু ক্রোচে যে গ্যেটের প্রতিভাকে modern spirit- এর (আধুনিকতার) এক বড় প্রতীক বলেছেন সেইটি ভাল করে বুঝতে পারলে গ্যেটের সঙ্গে আমাদের সত্যকার পরিচয় হয়ত খানিকটা হবে।

গ্যেটের ভিতরে এই যে সুবৃহৎ নূতন মন, বলা যেতে পারে, Renaissance (নবজাগরণ)—সূচিত মানসিকতার তা এক বড় পরিণতি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানেন, ইয়োরোপের Renaissance কয়েক শতাব্দীব্যাপী ব্যাপার, বহু লক্ষণের দ্বারা জটিল, আর তা শুধু সৌন্দর্য ও আনন্দের কাহিনীই নয়, সেই সৌন্দর্য ও আনন্দের সঙ্গে মিশে রয়েছে অনেকখানি কদর্যতাও— টলষ্টয় তাঁর শেষ বয়সের কতগুলো রচনায় যার দিকে তাঁর বলিষ্ঠ তর্জনী নির্দেশ করেছেন। তবু এ সত্য যে Renaissance কাহিনী মোটের উপর মানুষের ঊষর চিত্তক্ষেত্রে পল্লবিত করবার কাহিনী, মানুষের জাগতিক জীবনের সুখ-

---

৫১. গ্যেটের কাব্যে, তাঁর সারবান বৈচিত্র্য-বিলাসী রূপগ্রাহী ও প্রখরবুদ্ধি মনে প্রথম স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় আধুনিকতার বহু দিক।

www.nagorikpathagar.org

সম্ভোগের এক করুণ মধুর কাহিনী। —কিন্তু এই Renaissance পুষ্পের সৌরভে ফ্রান্স ইতালি ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ আমোদিত হলেও তুহিনাবৃত জার্মানী বহু দিন পর্যন্ত তা থেকে বঞ্চিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সেখানে দেখা দিল ধর্মান্দোলন Reformation, আপাতদৃষ্টিতে যা বহুদিক দিয়ে Renaissance —এর আত্মীয়তা বেশী। কিন্তু জার্মেনীর Classicism—তার পূর্ববর্তী Reformation-এর বিপরীতধর্মী। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানীর যে Classicism— প্রাচীন গ্রীক শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টা— তার সঙ্গেই বরং Renaissance এর আত্মীয়তা বেশী। কিন্তু জার্মেনীর Classicism তার পূর্ববর্তী Reformation—এর বিপরীতধর্মী বোধ হলেও বাস্তবিকপক্ষে এটি Renaissance ও Reformation —এর বেশ এক সমন্বয়। এই Classicism —এর প্রবর্তকদের সৌন্দর্যানুরাগ Renaissance —এর, কিন্তু তাঁদের সত্য ও স্বদেশানুরাগ, অন্য কথায়, কল্যাণানুরাগ, Reformation —এর। এই Classicism —এর এক শ্রেষ্ঠ নায়ক Lessing এর একটি উক্তি খুব প্রণিধানযোগ্য। সৌন্দর্যতত্ত্ব বোঝাবার জন্য তিনি লিখেছেন Laokoon, এক জগদবিখ্যাত বই, যদিও আকারে ক্ষুদ্র; তিনিই বলেছেন—ঈশ্বর যদি এক হাতে পূর্ণজ্ঞান অপর হাতে প্রয়াসের অনন্ত দুঃখ এই দুটি নিয়ে বলেন, কোনটি নেবে বলো, তাহলে বলব, পিতঃ, প্রমাদহীন পূর্ণজ্ঞান তোমাকেই সাজে, আমাকে দান কর অনন্ত প্রয়াস।[৫২]

জার্মেনীর এই অষ্টাবিংশ শতাব্দীর Classicism —এর শ্রেষ্ঠ প্রতীক গ্যেটে। সত্য বটে তিনি নিজেকে খ্রীস্টান বলে পরিচিত করবার জন্য ব্যগ্রতা দেখেন নি, বরং বলেছেন, "আমি পেগ্যান" (Pegan), প্রকৃতির পূজারি, (মুসলমানী ভাষায় "কাফের"), সেই পরমসৌন্দর্য প্রেমিক গ্যেটের ভিতরেও সত্যান্বেষণের বীরব্রত কতখানি ছিল তা তাঁর এই উক্তি থেকেই বোঝা যাবে।

"In religious scientific and political matters, I generally brought troubles upon myself because I was no Hypocrite and had the courage to experss what I felt."[৫৩]

একটা জাতির জাগরণে প্রতিবিম্বিত যেন বসন্ত ও বর্ষার নৈসর্গিক প্রাচুর্য। বসন্তের

---

৫২. If God were to hold in his right hand all truth, and in his left hand the single everactive impulse to seek after Truth, even though with the condition that I must eternally remain in error, and say to me, "Choose", I would with humility fall before his left hand and say, "Father, Give! For pure thoughts belong thee alone."

৫৩. ধর্ম বিজ্ঞান ও রাজনীতি-সম্পর্কিত ব্যাপারে বহু সময়ে আমি নিজের উপর বিপদ ডেকে এনেছি, তার কারণ ভন্ডামি আমার পোষাত না, আর যা মনে প্রাণে বুঝতাম তা প্রকাশ করে, বলবার সাহস আমার ছিল।

www.nagorikpathagar.org

আগমনে দেখা দেয় গাছে নূতন পাতা, ডালে ডালে লাখো পাখির আনন্দ-গান; বর্ষায় দেখতে দেখতে নদী নালা ভরে ওঠে উপরের নিরন্তর বর্ষণে, —একটা জাতির জাগরণ সময়ে তিন একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কর্মীর আবির্ভাব ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান জাগরণে দেখতে পাই —চিত্রের ক্ষেত্রে Oeser, Winckelmann; সাহিত্যে Klopstock, Herder, Wieland, Goethe, Schiller, দর্শনে Kant, Schelling, Hegel, Schopenhauer; সমালোচনায় Schlegel; সঙ্গীতে Mozart, Beethoven .....ইত্যাদি এ যেন দেখতে দেখতে গগন বিদীর্ণ করে দাঁড়ালো বিচিত্রশীর্ষ এক বিরাট পর্বত! বিশেষজ্ঞরা বলেন— এই শৃঙ্গমালার উচ্চতম মহত্তমটির নাম গ্যেটে।

গ্যেটের চরিতখ্যায়ক Lewes বলেছেন—

> .....of all the failings usually attributed to literary men Goethe had the least of what could be called jealuosy; of all the qualities which sit gracefully on greatness he had the most of magnanimity. [৫৪]

এ আদৌ অতিরঞ্জন নয়। এই অসাধারণ প্রতিভা তাঁর প্রতিভার ভারে আদৌ টলটলায়মান হন নি। কত সহজভাবে তিনি বলেছেন—

> .....Even the greatest genius won't go far if he tried to owe everything to his own internal self. But many very good men do not comprehend that and they grope in darkness for half a life with their dream of originality.....I by no means owe my work to my wisdom alone, but a thousand things and persons around me who provided me with material. There were fools and sages, minds enlightened and narrow, childhood, youth and mature age-all told me what they felt, what they thought, how they lived and worked and what experience they had gained; and I had nothing further than to put out my hand and reap what others had sown for me.[৫৫].

---

৫৪. সাহিত্যিকজনসুলভ দুর্বলতার মধ্যে ঈর্ষাতাঁতে ছিল না বলেই চলে; মহত্ত্বের শোভাবর্ধক গুণাবলীর মধ্যে মহানুভবতা তাঁতে ছিল অপর্যাপ্ত।

৫৫. শুধু অন্তর-সত্তার উপরে নির্ভর করে' শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবেন না। কিন্তু অনেক সাধু সঙ্কল্প ব্যক্তি একথা বুঝে উঠতে পারেন না, আর

www.nagorikpathagar.org

অন্যত্র তাঁর পূর্ববর্তী Winckelmann, Lessing, Herder প্রভৃতির নিকট তাঁর ঋণ তিনি বার বার স্বীকার করেছেন। কিন্তু তবু এ সত্য যে গ্যেটে যদি অপরিসীম কীর্তি মণ্ডিত গ্যেটে না হতেন তাহলে তাঁর পূর্ববর্তীদের মাহাত্ম্য অমন পরিকীর্তিত হবার সম্ভাবনা কম ঘটত —যেমন, কোনো পরিবারকে লোকচক্ষুতে গৌরবমণ্ডিত করেন তার বহু স্বল্পকীর্তি সন্তান নন, তার একজন অতুলকীর্তি সন্তান। তাই গ্যেটে নিজে তাঁর মাহাত্ম্য বিশ্লেষণে উদাসীন হলেও তাঁকে যাঁরা বুঝতে চান তাঁদের পক্ষে সে-ঔদাসীন্য অসার্থক।

১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে Frankfort নগরে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে গ্যেটের জন্ম হয়। তাঁর আত্মচরিতে তিনি তাঁর বাল্যজীবনের ছবি নিপুণ হস্তে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সেই বাল্য-কাহিনীতে বেশী করে চোখে পড়ে দুইটি ব্যাপার— তাঁর স্বভাবদত্ত প্রতিভা আর তাঁর পিতার শিক্ষা-ব্যবস্থা। —তিনি যখন সাত আট বৎসরের বালক তখন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, এই ঘটনা তাঁর বালক-মনের উপরে গভীর রেখাপাত করে। সবারই মুখে যিনি দয়াল প্রেমময় ইত্যাদি নামে পরিকীর্তিত তাঁরই সামনে এমন ধ্বংস কি করে সম্ভবপর, সেই চিন্তায় তাঁর চিত্ত কিছুদিন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর স্বভাবত সৌন্দর্যানুরাগী মনে এ দুশ্চিন্তার ভার স্থায়ী হয় নি। —তার উপর ধর্ম সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ তিনি অনেক সময়েই শুনতেন। এইসব থেকে ইহুদি-পুরাণের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্রোধপরায়ণ ঈশ্বরে অপ্রত্যয় ও প্রকৃতির অধীশ্বর শান্ত সুন্দর ঈশ্বরে প্রত্যয় তাঁর বালক-মনে প্রবল হতে থাকে। কিন্তু এই ঈশ্বরকে তিনি কেমন করে তাঁর অন্তরের পূজা নিবেদন করবেন? তাঁর পিতা বহু খনিজ দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি ঠিক করলেন সেইসব খনিজ দ্রব্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রতীকরূপে একখানি সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডের উপরে সাজাবেন। কিন্তু কেমন করে মানুষের মনের স্তব পরিব্যক্ত হবে? শেষে ঠিক হলো তাঁর ছবি আঁকার Pastel পেন্সিল সেই সব ধাতুদ্রব্যের উপরে দাঁড় করিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেবেন, তা থেকে যে ধূম কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠবে সেই হবে মানুষের মনের স্তবের প্রতিচ্ছবি। —এক প্রভাতে তিনি এইভাবে ঈশ্বরের প্রতি স্তুতি নিবেদন করলেন Pastel পেন্সিলে আগুন ধরালেন উদীয়মান সূর্যের দিকে আতস-কাচ ধরে। কিন্তু এই স্তব নিবেদনের এক মন্দ ফল ফলেছিল —Pastel পেন্সিল পুড়ে গিয়ে সেই সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডে আগুন ধরেছিল, আর তাতে তার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর উপরে গ্যেটে একটি সুগভীর মন্তব্য করেছেন—

তার ফলে তাঁদের মৌলিকতার স্বপ্ন নিয়ে অর্ধেক জীবন তাঁরা অন্ধকারে হাৎড়ে কাটান। .....আমি যা করতে পেরেছি তা শুধু আমার নিজের জ্ঞানের ফলে কখনো নয়, আমার চারপাশের শত সহস্র বস্তু ও ব্যক্তি আমাকে যে-সব উপকরণ যুগিয়েছে তারও ফলে। মূর্খ ও পণ্ডিত, উদারমনা ও সংকীর্ণমনা, বালক যুবক ও প্রবীণ॥ সবাই আমার কাছে ব্যক্ত করেছে কি তারা অনুভব করেছে চিন্তা করেছে, কেমন করে তারা জীবন নির্বাহ করেছে কাজ করেছে, ও কি অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছে; আমার কাজ হয়েছিল এরা যা আবাদ করেছে হাত বাড়িয়ে তাই সংগ্রহ করা।

www.nagorikpathagar.org

The accident might almost be considered a hint and warning of the danger there always is in wishing to approach the Deity in such a way.[৫৬]

তাঁর বাল্য-জীবনের অপর একটি লক্ষ্যযোগ্য ঘটনা এই : একদিন স্কুলে তাঁর সহপাঠীরা এই বলে তাঁকে জব্দ করতে চেষ্টা করে যে তাঁর পিতা তাঁর পিতামহের ছেলে নন, অন্য কোনো বড় লোকের ছেলে (তাঁর পিতামহ দর্জি ব্যবসায়ী ছিলেন)। সঙ্গীদের এই নির্মম কথার উত্তরে বালক গ্যেটে শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন— এ যদি সত্য হয় তাতেই বা এমন কি ক্ষতি, জীবন এমন এক মহা দান যে এর জন্য কার কাছে কে ঋণী সে কথা না ভেবেও পারা যায়, কেননা এতটুকু তো সত্য যে ঈশ্বরের কাছ থেকেই তা' এসেছে, আর তাঁর সামনে সবাই সমান।

তাঁর পিতা উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু নিজে জীবনে বেশী কিছু করতে পারেন নি। তাঁর ব্যর্থ জীবন তাঁর পুত্রের ভিতর দিয়ে সার্থকতা লাভ করুক এই ছিল তাঁর সাধনা। পুত্রকে প্রায় সর্ববিদ্যাবিশারদ করবার আয়োজন তিনি করেছিলেন। কলেজে প্রবেশের পূর্বে চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে গ্যেটে মাতৃভাষা ভিন্ন ল্যাটিন্, ইতালীয়, হিব্রু, গ্রীক, ফরাসী, ও ইংরেজি শিখেছিলেন এর উপর চিত্রাঙ্কন, নৃত্যগীত, অসিচালনা, উদ্যানরচনা ইত্যাদিতেও অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু প্রথমে Leipsig এ গিয়ে তিনি তা করেন নি। পরে Strasburg এর তিনি আইন অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রাণের সামগ্রী বারবারই ছিল কাব্যচর্চা ও চিত্রাঙ্কন।

গ্যেটের সাহিত্যিক গুরুদেব কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের সাহায্যে তাঁর জ্ঞান দিন দিন গভীরতর হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর কাব্যের সত্যকার উৎস তাঁর এই গুরুদেব প্রেরণা তত নয় যত তাঁর নিজের প্রণয় ব্যাপার। সেই প্রেমের দহন তিনি সারাজীবন ভোগ করেছেন। বাস্তবিক, গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে দুই অদ্ভুত ধারা যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য একটি জ্ঞানান্বেষণ, অপরটি প্রেমবিধুরতা।

গ্যেটের প্রণয়-কাহিনী তাঁর জীবন ও কাব্যের ইতিহাসে খুব বড় জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু এখানে তাঁকে ভুল বুঝা এতই স্বাভাবিক যে তাঁর স্বদেশবাসীরাও বহুকাল পর্যন্ত তাঁকে এ ব্যাপারে নিকৃষ্ট রঙ্গে রঞ্জিত করে এসেছেন। আমাদের জন্য ব্যাপারটি আরো কঠিন এইজন্য যে আমাদের সংস্কার বিভিন্ন, তা যতই কেন আমরা ইয়োরোপের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন না হই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে Frau Von Stein —এর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সম্বন্ধ। তাঁর চরিতাখ্যায়কদের কেউ কেউ বলেছেন, গ্যেটে ও Von Stein পত্নীর সম্বন্ধ মোটের উপর একটি প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্বন্ধ, তাঁর বেশ কিছু নয়; অপরে এ মত আদৌ গ্রাহ্য করেন নি। তেমনিভাবে জটিল বৃদ্ধবয়সে যুবতী বন্ধুপত্নী Marianne Von

---

৫৬. এইভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি-চেষ্টায় যে বিপদ এই দুর্ঘটনাকে গণ্য করা যেতে পারে সেই সম্বন্ধে সঙ্কেত ও সাবধান-বাণীর তুল্য।

www.nagorikpathagar.org

Willemer সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ— যা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল হাফিজের অনুসরণে তাঁর সুবিখ্যাত West-Eastern Divan কিন্তু এর জন্য যাঁরা তাঁকে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বলতে চান তাঁদের মত গ্রহণ করতে আমাদের বাধে এইজন্য যে কবির অন্তরাত্মা প্রতিবিম্বিত হয় যাতে সেই কাব্যে গ্যেটে যে প্রেমের ছবি অঙ্কিত করেছেন তাতে ফুটে রয়েছে এক আশ্চর্য পবিত্রতা। তাঁর Sorrows of Werther এ ভোর্টের Albert এর বিবাহিতা Charlotte-র প্রেমে আত্মহারা; সে এক জার্মান "মজনু" কিন্তু সেই Werther ই এক জায়গায় বলেছেন— "Is not me love for her the purest, most holy has my soul ever been sullied by a single sensual desire?"[৫৭]

তাঁর "Elective affinities" গ্রন্থে নায়ক Eduard তাঁর স্ত্রীকে বিস্মৃত হয়ে Ottile-র প্রেমে পাগল হয়েছেন; কিন্তু Ottile তাঁর কাছে দেববিগ্রহের মতো পবিত্র, Ottile —এর একটু ইঙ্গিতে কঠোরতম সংযমে তিনি নিজেকে বাঁধছেন। —ক্রোচে বলেছেন, Faust প্রথম খণ্ডে Margaret —এর সঙ্গে Faust এর সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা বেশী প্রকাশ পেয়েছে, Faust তাঁর সমস্ত জ্ঞানান্বেষণ বিস্মৃত হয়ে বৃদ্ধা দূতীর সাহায্যে Margaret কে আয়ত্ব করেছেন। দূতীর মধ্যবর্তীতাই যদি ক্রোচের কাছে প্রধান আপত্তিকর ব্যাপার হয় তবে সেই কালের দোহাই দিয়ে সহজেই তাঁকে অনেকখানি নিরুত্তর করা যেতে পারে। তাছাড়া, প্রথম কয়েক দৃশ্যের সেই বিশ্বজ্ঞানের পিপাসু সুন্দর ও সবল-চিত্ত Faust যে পরে বদলে কামুক হয়ে গেছেন তা সত্য নয়। Margaret-র প্রেমে বাস্তবিকই তিনি আত্মহারা: Margaret এর কক্ষে গোপন প্রবেশ করে তিনি তাঁর নিজের ভিতরে এক রহস্যের পরিবর্তন অনুভব করেছেন :

...And I? What drew me here with power?
How deeply am I moted, this hour!
What seek? Why so full my heart and sore?
Miscrable Faust! I Know thee now no more.
Is there a magic vapour here?
I came with lust of instant pleasure,
And lie dissolved in dream of love's sweet liesure..."[৫৮]

---

৫৭. তাঁর প্রতি আমার প্রেম পরম শুদ্ধ পরম পবিত্র নয় কি?.... আমার অন্তরাত্মা কি কখনো একটি ভোগাকাঙ্ক্ষার দ্বারাও কলুষিত হয়েছে

৫৮. আর আমি? কিসের সবল আকর্ষণ আমাকে এখানে এনেছে?
কি প্রবল ভাবেই না আন্দোলিত হচ্ছে আমার অন্তর!
কি আমি চাই? কেন এখন হৃদয় আমার এমন উদ্বেলিত ও ব্যথিত?
হায় ফাউস্ট! তোমাকে আর চেনা যায় না।
এখানে কি কোনো যাদু বাষ্প আছে?
আপাত তৃপ্তির কামনা নিয়ে আমি এসেছিলাম;
কিন্তু প্রেমের স্বপ্নরসে আমি এখন নিমজ্জিত।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর Tasso, Iphigenie, প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও এই ধরনের প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এমনি করে তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেও আমাদের দেশের সর্ব-সাধারণের কথা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষিত-সাধারণকে নিয়েও নরনারীর এমন সম্বন্ধ কল্পনা করা খুব সহজ কি? এই সুন্দর স্বেচ্ছাচার আমাদের দেশে হিন্দু দেবদেবীর লীলায় বেশ আছে, মুসলমানের বেহেশতের প্রচলিত ধারণায় খানিকটা আছে, কিন্তু এরই ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে শ্রেয়ে পৌছানো— এ আজো আমাদের সহজ ধারণার বহির্ভূত।[৫৯] —কেউ কেউ বলেছেন, গ্যেটের ভিতরে 'পাপ বোধ' 'অন্যায় বোধ' এসব ছিল না, মানুষের জন্য বিশেষ কোনো দরদ তিনি অনুভব করতেন না, যেমন Amiel বলেছেন—

> ""He is a Greek of the great time, to whom the inward crises of the religious consciousness are unknown... he takes no more interest than Nature herself in the disinherited, the feeble, and the oppressed.."[৬০]

কিন্তু এ মত যে সত্য নয় তা Amiel নিজেই সেই দিনের ডায়রীর শেষের দিকে ব্যক্ত করেছেন—

> "One must never be too hasty in judging these complex natures"[৬১]

প্রকৃতির সমস্ত ভাঙ-চুর ছাপিয়ে জাগে প্রাণের সবুজ উৎসব, —আমাদের মনে হয় গ্যেটের প্রতিভা ছিল প্রকৃতির মতো অপরিসীম বীর্যবন্ত, তাই তাঁর ভিতরকার সমস্ত দুঃখ-বিপত্তি বেদনা বিক্ষোভ আত্মগোপন করেছিল এক পরম রমণীয় প্রফুল্লতার অন্তরালে। এই সম্পর্কে গ্যেটে নিজেও বলেছেন—

---

৫৯. তবে ব্যাপারটি অন্য দিকে দিয়েও ভাবা যেতে পারে। নারীর ব্যক্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না; সেই ব্যক্তিত্ব স্বীকার করলে গ্যেটের জীবন ও প্রয়াস হয়ত মানুষের স্বাভাবিক জীবনের ব্যাপার বলেই আমরা ধারণা করতে পারবে।

৬০. তিনি হচ্ছেন গৌরব-যুগের একজন গ্রীক 'ধর্মবোধের'র অন্তর-বেদনা যাঁর কাছে অজ্ঞাত। জগতের বঞ্চিত দুর্বল ও অত্যাচারিতদের প্রতি প্রকৃতির মতোই তিনি উদাসীন।

৬১. এই জটিল প্রকৃতির লোকদের সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কোনো মত প্রকাশ করা অসঙ্গত। Amiel's Journal-P. 187

www.nagorikpathagar.org

Only he who has been the most sensitive can become the hardest and coldest of men, for he has to encase himself in triple steel...and often his coat of mail oppresses him.[৬২]

গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে প্রেমবিধুরতা ও জ্ঞানান্বেষণ বিদ্যমান এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলবার আছে— গ্যেটে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের এটি বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। প্রেমে তিনি যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েন আর তাঁর আর একটি চেতনা যেন বসে বসে তাঁর মত্ততার কাহিনী সংগ্রহ করতে থাকে। এই আশ্চর্য বাস্তবপ্রীতি, এই যেন গ্যেটে প্রতিভার সবখানি কথা। তাঁর গুরু ও বন্ধু Merk তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন— বাস্তব (সত্য) যা তুমি তাকে দাও কাব্য-রূপ you give poetic from to the real. তাঁর কাব্যের এর চাইতে সুন্দরতম পরিচয় হয়ত আর দেওয়া যায় না। অথচ তাঁর এই বাস্তব-প্রীতি কেন তথাকথিত realism এ (বস্তুতন্ত্রতায়) পরিণত হলো না সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন :

> প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ দ্বিবিধ; তিনি একই সঙ্গে তার প্রভুত্ব ও দাস। দাস এই কারণে যে পার্থিব সামগ্রীর সাহায্যে তাঁকে কাজ করতে হয় নিজেকে বোঝাবার জন্য; আর প্রভু এই কারণে যে এইসব পার্থিব সামগ্রী তিনি উপায়স্বরূপ ব্যবহার করেন তাঁর উচ্চতর উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে। —সমগ্রতার সাহায্যে শিল্পী তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই সমগ্রতা কিন্তু প্রকৃতিতেই নেই; এটি তার নিজের চিত্তের ফল, অথবা বলা যায়, ফল সঞ্চারী ঐশ্বরিক প্রেরণা।[৬৩]

গ্যেটের এই ধরনের মতামত অনুসরণ করে Dr. Rudolf Steiner একটি বই লিখেছেন, তার নাম তিনি দিয়েছেন Goethe as the founder of a new Science of Esthetics. তার মূল কথা কতকটা এই— প্রকৃতির ভিতরে বুঝতে পারা

---

৬২. যিনি সব চাইতে অনুভূতিপ্রবণ কেবল তিনিই হতে পারেন সব চাইতে কঠিন ও নির্বিকার; কেননা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হয় নিজেকে বহুস্তর বর্মে আবৃত করা....আর অনেক সময় এই বর্ম হয় তাঁর জন্য পীড়াদায়ক।

৬৩. The artist has a twofold relation to nature; he is at once her master and her slave.He is her slave in as much as he must work with earthly things in order to he understood, but lee is her master, in as much as he subjects these earthly means to his higher intentions and rnders them subservient.
The artist would speak to the world through an entirety; however, he does not find this entirety in nature; but it is the fruit of his own mind, or if you like it, of the aspiration of a fructifying divine breath.

www.nagorikpathagar.org

যায় এক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত, মানুষের জীবনে রয়েছে তারও চাইতে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত, শিল্পীর রচনায় তারই প্রকাশ; যেমন গ্যেটে বলেছেন :

> In that Man is placed on Nature's pinnacle, he regards himself as another whole Nature, whose task is to bring forth inwardly yet another Pinnacle. For this purpose he heightens his powers imbuing himself with all perfections and virtues, calling on choice, order, harmony, and meaning, and finally rising to the production of the work of art, which takes a prominent place by the side of his other actions and works. Once it is brought forth, once it stands before the world in its ideal reality, it produces a permanent effect-it produces the highest effect-for as it develops itself spiritually out of a unison of forces, it gathers into itself all that is glorious and worthy of devotion and love, and thus breathing life into the human form uplifts man above himself, completes the cycle of his life and activity, deifies him for the present in which the past and future are included...[৬৪]

---

৬৪. প্রকৃতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত মানুষ নিজেকে জ্ঞান করে আর-এক পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি বলে, তার কাজ হচ্ছে অন্তর্লোকে আর-এক চূড়ার সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে সে তার ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করে।সমস্ত সৌষ্ঠব ও গুণপণায় সে নিজেকে করে ভূষিত, নির্বাচন শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য অর্থবোধ, এ-সবের হয় তার বিশেষ প্রয়োজন, অবশেষে লাভ হয় তার শিল্প-সৃষ্টির যোগ্যতা যা তার অন্যান্য কর্ম ও কীর্তির পাশে লাভ করে বিশেষ মর্যাদার স্থান। একবার যদি এর সৃষ্টি হয়, একবার যদি এই শিল্পসৃষ্টি জগতের সামনে দাঁড়ায় মানস-সত্য রূপে, তা হলে এর লাভ হয় এক স্থায়ী প্রভাব-শ্রেষ্ঠতম প্রভাব; কেননা বহু শক্তির সম্মিলন-ক্ষেত্রে আত্মিক শক্তিরূপে এ যে নিজেকে বিকশিত করে তোলে এই জন্য জীবনে যা-কিছু শ্রেয় প্রেয় ও গৌরবের সে-সবই নিজের ভিতরে সঞ্চিত করে, আর এইভাবে মনুষ্যমূর্তিতে (নূতন ভাবে) প্রাণ সঞ্চার করে মানুষকে করে মহত্তর, তার জীবন ও কর্মের পরিধিকে করে পূর্ণাঙ্গ, আর অতীত-ও-ভবিষ্যৎ-সমন্বিত বর্তমানে তাকে দান করে দেবত্ব। উর. ী. ওণধভণর তাঁর বইখানিতে শেষ মন্তব্য করেছেন এই :- Beauty is not the divine in a cloak to physical reality; no, it is physical reality in a cloak that is divine.

www.nagorikpathagar.org

এ সম্বন্ধে গ্যেটের আরো কয়েকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

........Occasional poems (are) the first and most genuine of all kinds of poetry..

.......The first and last demanded of genius is love of truth...

......I seek in everything a point from which much may be develop...[৬৫]

Theodore Watts-Dunton Encyclopaedia Britannica য় Poetry শীর্ষক লেখায় কবি দৃষ্টিকে দুইভাগে ভাগ করেছেন— Absolute Vision শুদ্ধদৃষ্টি ও Relative Vision আপেক্ষিক দৃষ্টি। সেই Absolute Vision —এর দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছেন Shakespeare এ ও Homer এ। Absolute Vision বলতে তিনি বুঝেছেন বস্তুর নিজস্বতার বিবৃতি; কবি নিজের রাগ-দ্বেষ একেবারে ভুলে গিয়ে কোনো বস্তুর বা কোনো ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করে তাকে বিশ্লেষণ করছেন; রূপময় করছেন। এইভাবে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে Absolute Vision লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর কি না, অর্থাৎ শেকস্‌পীয়র ও হোমর তাদের Absolute Vision এর মুহূর্তেও শেকস্‌পীয়র ও হোমর বিবর্জিত হয়েছিলেন কি না, সে বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে। তবে এই আত্মবিলোপ কবির পক্ষে মানুষ হিসাবে যতখানি সম্ভবপর সেদিক দিয়ে দেখলে হয়ত বোঝা যাবে, সত্যকার Absolute Vision অর্থাৎ মানুষের মনের বহু স্তরের বহু গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে Vision গ্যেটের চাইতে শেকস্‌পীয়রে ও হোমরে বেশী নয়। কিন্তু সাহিত্যের প্রচলিত শাস্ত্র অনুসারে এ হয়ত blasphemy " কাফেরী কালাম" —তাই বেশী কিছু না বলাই শোভন।

অল্প বয়সেই গ্যেটে বলেছিলেন—আমি প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম হব, ভাল হব, মন্দ হব, তোমাদের কোনো আদর্শ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। (All your ideals shall not prevent me from being genuine, and good and bad-like Nature).

এই যাঁরা সাধনা প্রচলিত কথায় যাকে বলা হয় কবিত্ব, কাব্য-সৌন্দর্য, তাতেই যে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন তা সম্ভবপর নয়। ঘটেছেও তাই; গ্যেটে শুধু কবি নন, তিনি বিজ্ঞানবিৎ (বিজ্ঞানে তাঁর দান স্বীকৃত হয়েছে), চিত্র-সমঝদার, শেষ বয়সে সঙ্গীত-সমঝদার, ধর্ম-তত্ত্বজ্ঞ, এমন-কি মরমী-সাধনার সঙ্গেও সুপরিচিত। তাঁর চিত্তের এই

সৌন্দর্য পার্থিব আবরণে এক দিবা বস্তু নয় বরং দিব্য আবরণে পার্থিব সত্য। (তিনি এখানে দার্শনিক schelling -এর সৌন্দর্য-তত্ত্বের প্রতিবাদ করেছেন।)

৬৫. সাময়িক কবিতাই আদি ও অকৃতিম কবিতা।
প্রতিভার সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কর্তব্য-সত্যপ্রীতি।
প্রত্যেক বিষয়ে আমি এমন একটি স্থান খুঁজি যা থেকে প্রভূত বিকাশ সম্ভবপর।

www.nagorikpathagar.org

বিরাটত্বের জন্যই জনৈক লেখক তাঁকে আধুনিক জগতের সমস্ত চিন্তাশীলের গুরু বলেছেন:

> .....we are all disciples of Goethe whether we know it or not, and any liberal mind has but to be brought into contact with the master to realise that inevitable discipleship...." John Macy-The Story of the World's Literature.[৬৬]

গ্যেটে নিজেও বলেছেন— যিনি প্রকৃতই আমার রচনা ও চরিত্রের মর্মগ্রাহী হয়েছে তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে তার ফলে তিনি এক প্রকার চিত্তের অবন্ধন লাভ করেছেন।[৬৭]

প্রচলিত ধর্মে আস্থাবান না হয়েও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি বলেছেন বাস্তবিকই বিস্ময়কর— ভাবুকের জন্য আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ। তাঁর Faust এর সেই who dare express Him"[৬৮] ইত্যাদি সুবিখ্যাত, এভিন্ন অন্যান্য সুন্দর উক্তিও আছে,

---

৬৬. আমরা সবাই গ্যেটের শিষ্য তা আমরা জানি আর নাই জানি; যে-কোন উদারচিত্ত ব্যক্তি এই গুরুর সংস্পর্শে এলেই সেই অবশ্যম্ভাবী শিষ্যত্বের কথা বুঝবেন।

৬৭. ".....And any one who has really learnt to understand my works and my character is bound to acknowledge that the has thereby attained to a certain freedom of the spirit,"

৬৮. "মার্গারেটের মনে সন্দেহ জেগেছে হয়ত ফাউস্ট ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন; তার প্রশ্নের উত্তরে ফাউস্ট বলেছেন ঃ-

Who dare express Him?
And who profess Him?
Saying: I believe in Him!
Who, feeling, seeing.
Deny His being,
Saying: I believe Him not!
The All-upholding,
The All-sustaining,
Folds and upholds He not
Thee, me Himself?
Arches there not the sky above us?
Lies not beneath us firm the earth?
And rise not, on us shining,
Friendly, the everlasting stars?
Look I not, eye to eye, on thee,
And feel' st not, thronging
To head and heart, the force,
Still weaving its eternal secert?

www.nagorikpathagar.org

যেমন–

"....what know we of the idea of the Divinity? and what can our narrow ideas tell of the Highest Being? Should, I, like a Turk, name it with a hundred names, I should

---

Invisible, visible, round the life?
Vast as it is, fill with what force thy heart,
And when thou in the feeling wholly blessed art,
Call it then, what thou wilt,-
Call it Bliss! Heart! Love! God!
I have no name to give it!
Feeling is all in all:
The Name is sound and smoke,
Obscuring heaven's clear glow.
স্পর্ধা কার তাঁকে ব্যক্ত করবে?
বলবে কো৷তাঁকে জানি, তাঁতে বিশ্বাস রাখি!
অনুভূতি ও দৃষ্টি অব্যাহত রেখে
অস্বীকার করবে কে তাঁকে!
বলবে কো৷বিশ্বাসী তাঁকে নই!
সর্বধর
সর্বাশ্রয়
ধারণ কি করছেন না তিনি তোমাকে, আমাকে, নিজেকে?
মাথার উপরে নেই কি আকাশের খিলান?
পায়ের নিচে শান্ত ধরনী?
সামনে জ্বলজ্বল-করা বন্ধুর-মতো-চেয়ে-থাকা চিরদিনের তারা?
চোখ কি আমার দেখছে না তোমাকে?
অনুভব কি করছ না তুমি, মনে প্রাণে,
তোমার জীবন ঘিরে চলেছে কি রহস্যময় শক্তির লীলা?
৷কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য!
বিরাটের দ্বারা তোমার হৃদয় পূর্ণ কর নিঃশেষে!
আর যখন তুমি ভাগ্যবতী এই অনুভূতি-ধনে
তখন নাম দিয়ো এর
পরমা শান্তি, হৃদয়, প্রেম, ঈশ্বর৷যা খুশী!
আমি অক্ষম এর নাম দিতে।
অনুভূতিই আমার সব।
নাম শুধু কোলাহল ও কুহেলী
আকাশের প্রোজ্জ্বলতা তাতে হয় আচ্ছন্ন।

www.nagorikpathagar.org

still fall short and it comparison with the infinite attributes, have said nothing."[৬৯]

অথবা—

"Let men continue to worship Him Who gives the ox his pasture and to man food and drink, according to his need. But I worship Him Who has filled the world with such a productive energy, that if only the millionth part became embodied in living existences the globe world so swarm with them that War, Pestilence, Flood, and Fire would be powerless to diminish them. That is my Good."[৭০]

তাঁর আর একটি উক্তিও প্রণিধানযোগ্য— যাঁরা ধর্মপ্রাণ সৃষ্টি শুধু তাঁদের দ্বারাই সম্ভবপর— Only religious men can be creative.

গ্যেটের ভিতরে স্বজাতিপ্রেমের তীব্রতা ছিল না। এজন্য তাঁকে কম নিন্দা ভোগ করতে হয় নি। কিন্তু দার্শনিক ক্রোচে এতে মহা আনন্দিত হয়েছেন—

"...I consider it singularly fortunate that among all the sublime poets, perennial sources of deep consolation, there should yet be one who, possessing a knowledge of human nature in all its aspects, such as no other poets ever possessed, nevertheless keeps his mind above and beyond political sympathies and the inevitable quarrels of nations.[৭১]

---

৬৯. ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে আমাদের কিইবা জ্ঞান আছে। আমাদের সংকীর্ণ পরিসর ভাবনা সেই পরমপুরুষের সম্বন্ধে কতটুকুই বা ব্যক্ত করতে পারে। যদি মুসলমানের মতো শতনামে আমি তাঁকে ডাকি তবু অকথিত থাকবে বহু, আর তাঁর মহিমার কথা ভাবলে বুঝব।কিছুই বলা হয়নি।

৭০. অন্যেরা পূজা করুন তাঁকে যিনি ষাঁড়কে দিয়েছেন চরবার মাঠ আর মানুষকে দিয়েছেন তার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয়। কিন্তু আমি পূজারী তাঁর যিনি জগৎকে পূর্ণ করেছেন এমন প্রাণশক্তিতে সে যদি তাঁর অযুততম অংশও সক্রিয় হয় তবে জগত তাঁর দ্বারা এমনভাবে পূর্ণ হবে যে যুদ্ধ মড়ক বন্যা প্রভৃতির সাধ্য হবে না তার শক্তি হ্রাস করতে। এই আমার ঈশ্বর।

৭১. মহাকবিরা হচ্ছেন আশা ও আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ, সেই মহাকবিদের মধ্যে এমন একজনও যে আছেন যিনি মানব-প্রকৃতির সর্ব ক্ষেত্রের জ্ঞানে সর্বাগ্রগণ্য হয়েও রাজনৈতিক পক্ষপাত ও জাতিতে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের বহু উর্দ্ধে নিজের চিত্ত স্থাপন করতে পেরেছেন, এ এক মহা সৌভাগ্য বলে আমি জ্ঞান করি।

www.nagorikpathagar.org

এ সম্বন্ধে গ্যেটে নিজে বহু কথা বলেছেন,

"National literature is now rather an unmeaning term; the epoch of world literature is at hand, and each one must try to hasten its approach."[৭২]

অন্যত্র

Altogether national hatred is something peculiar. You will always find it strongest and most violent where there is the lowest degree of cultuer. But there a degree where it vanishes altogether and where one stands to a certain extent above nations and feels the weal or woe of a neighbouring people as if it had happened to one's own. This degree of culture was conformable to my nature, and I had become strengthened in it long before I had reached my sixtieth year.[৭৩]

গ্যেটে সম্বন্ধে যে ক'জন আলোচকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁদের কেউই কয়েক শত পৃষ্ঠার কমে তাঁদের বক্তব্য শেষ করতে পারেন নি। তবু তাঁদের লেখা ফেলানো লেখা নয়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী, তাঁর কাব্যের কিছু কিছু পরিচয়, আপাতত অকথিতই রইল।[৭৪]

গ্যেটে-সমুদ্রের হাওয়া মানস স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য, এই একটি কথাই বলতে চেষ্টা করেছি হয়ত।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। চৈত্র, ১৩৩৬

---

৭২. জাতীয় সাহিত্য এখন বরং এক অর্থহীন কথা। বিশ্বসাহিত্যের যুগ আসন্ন হয়েছে আর প্রত্যেকেরই উচিত একে এগিয়ে আনা।

৭৩. মোটের উপর বিজাতিবিদ্বেষ অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে চিত্তোৎকর্ষের যত অল্পতা সেখানে এর তীব্রতা তত বেশি। কিন্তু চিত্তোৎকর্ষের এমন স্তর আছে যেখানে এর সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে, ফলে এর অনুভাবকের স্থান লাভ হয় জাতীয়তার উর্দ্ধে। পরজাতির দুঃখবিপত্তি তখন তার মনে হয় নিজের জাতির দুঃখ-বিপত্তির মতো। চিত্তোৎকর্ষের এই স্তরের সঙ্গে আমার প্রকৃতির সহজ যোগ ছিল, আর ষাট বৎসর বয়সের বহু পূর্বেই এতে আমার স্থিতিলাভ হয়েছিল।

৭৪. কবিগুরু গ্যেটে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দ্রঃ।

www.nagorikpathagar.org

বাংলার জাগরণ

আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা এই যে বাংলার জাগরণ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু পুরোপুরি সত্যও যে নয় সে-দিকটা ভেবে দেখবার আছে। যাঁরা এই জাগরণের নেতা তাঁরা কি উদ্দেশ্য-আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ও এই জাগরণের ফলে দেশের যা লাভ হয়েছে তার স্বরূপ কি, এই সমস্ত চিন্তা করলে হয়ত আমাদের কথা ভিত্তিশূন্য মনে হবে না। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার থেকে আরম্ভ ক'রে বাজনা ও গোহত্যা নিয়ে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা পর্যন্ত আমাদের দেশে চিন্তা কর্মধারা, আর ডিইষ্ট এনসাইক্লোপিডিষ্ট থেকে আরম্ভ ক'রে বোল্‌শেভিজ্‌ম পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তা ও কর্মধারা, এই দুইয়ের উপর চোখ বুলিয়া গেলেও বুঝতে পারা যায়— আমাদের দেশ তাঁর নিজের কর্মফলের বোঝাই বহন করে চলেছে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে তার পার্থক্য যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য। —এই পার্থক্য একই সঙ্গে আমাদের জন্য আনন্দের ও বিষাদের। আনন্দের এই জন্য যে এতে করে' আমাদের একটা বিশিষ্ট সত্তার পরিচয় আমরা লাভ করি— অসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির মত আমরা শুধু ইয়োরোপের প্রতিধ্বনি মাত্র নই; আর বিষাদের এই জন্য যে আমাদের জাতীয় চিন্তা ও কর্ম-পরম্পরার ভিতর দিয়ে আমাদের যে ব্যক্তি সুপ্রকট হয়ে ওঠে সেটি অতীতের অশেষ অভিজ্ঞতাপুষ্ট অকুতোভয় আধুনিক মানুষের ব্যক্তিত্ব নয়, সেটি অনেকখানি অল্প পরিসর শাস্ত্রশাসিত মধ্যযুগীয় মানুষের ব্যক্তিত্ব।

এই সঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে রামমোহন থেকে আমাদের দেশে যে নবচিন্তা ও ভাবধারার সূচনা হয়েছে পরে পরের চিন্তা ও কর্মধারা কেবল যে তা'র পরিপেতষক হয়েছে তা নয়, এমন কি প্রবল ভাবে তার বিরুদ্ধাচারীই হয়েছে বেশী। আর উদ্দেশ্য-আদর্শের এই সমস্ত একটা বীর্যবন্ত সামঞ্জস্য লাভ করে আমাদের জাতীয় জীবন ও কর্মের যে একটা বিশিষ্ট ধারা সূচিত করবে তা থেকেও আমরা এখনো দূরে।

(২)

বাংলার নবজাগরণের প্রভাত-নক্ষত্র যে রাজা রামমোহন রায় সে সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু তাঁকে জাতীয় জাগরণের প্রভাত-নক্ষত্র না বলে প্রভাত-সূর্য বলাই উচিত; কেননা, জাতীয় জীবনে কেবলমাত্র একটি নব চৈতন্যের সাড়াই তাঁর ভিতরে অনুভূত হয় না, সেই দিনে এমন একটি বিরাট নব আদর্শ তিনি জাতির সামনে উপস্থাপিত করে গেছেন যে এই শত বৎসরেও আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেননি যার আদর্শ রামমোহনের আদর্শের সঙ্গে তুলিত হতে পারে। এমন কি, এই শত বৎসরে আমাদের

www.nagorikpathagar.org

দেশে অন্যান্য যে সমস্ত ভাবুক ও কর্মী জন্মেছেন তাঁদের প্রয়াসকে পাদপীঠ-রূপে ব্যবহার করে তার উপর রামমোহনের আদর্শের নব প্রতিষ্ঠা করলে দেশের জন্য একটা সত্যকার কল্যাণের কাজ হবে—এই আমাদের বিশ্বাস।

এই রামমোহন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য জীবনার্দশ ইত্যাদির দিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবু একথা সত্য যে এই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্রবের তিনি এসেছিলেন পূর্ণ যৌবনে। তার আগে আরবী ফারসী ও সংস্কৃত-অভিজ্ঞ রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাদানুবাদ করেছেন, গৃহ ত্যাগ করে তিব্বত উত্তর ভারত ভ্রমণ করেছেন, আর সেই অবস্থায় নানক কবীর প্রভৃতি ভক্তদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন— যাঁরা হিন্দু-চিন্তার উত্তরাধিকার স্বীকার করেও পৌত্তলিকতা অবতারবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এই সব ভেবে দেখলে ও তাঁর চিত্তের উপর মোতাজেলা সুফি প্রভৃতির প্রভাবের কথা স্মরণ করলে বলতে ইচ্ছে হয়, ভারতে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের সভ্যতা ও ধর্মের সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন যে নানক কবীর দাদু আকবর আবুল ফজল দারাশেকো প্রভৃতি ভক্ত ভাবুক ও কর্মীর দল, অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের রামমোহন তাঁদেরই অন্যতম। অবশ্য মধ্যযুগের সমস্ত খোলস চুকিয়ে দেওয়া একেবারে আধুনিক কালের এক পরম শক্তিমান মানুষের চিত্ত ক্রমেই আমরা তাঁর ভিতরে বেশী করে অনুভব করতে পারছি। কিন্তু সেটি হয়ত তাঁর উপর আধুনিক কালের ইয়োরোপের প্রভাবের জন্যই নয়, আধুনিক ইয়োরোপ যেমন করে মধ্যযুগেরই কুক্ষি থেকে উদ্গত হয়েছে রামমোহনের বিকাশও হয়ত সেই ধরনেরই ব্যাপার।

এই একটি লোক রামমোহন হিন্দুর সঙ্গে তর্ক করেছেন বেদ উপনিষৎ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ তন্ত্র সংহিতা ও সেই সমস্তের টীকা নিয়ে, মুসলমানের সঙ্গে তর্ক করেছেন কোরআন হাদিস ফেকা মন্তেক ইত্যাদি নিয়ে, আর খ্রিষ্টানের সঙ্গে তর্কে ব্যবহার করেছেন ইংরেজি গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল ও বড় বড় খ্রিষ্টান পণ্ডিতের মতামত। এই লোকটিই আবার সতীদাহ নিবারণের জন্য লড়েছেন— মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা চীনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য, নারীর অধিকার, বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজের শাসনের সমালোচনা ও সেই ক্ষেত্রে পথনির্দেশ, এই একটি লোকেরই কর্মের প্রেরণা যুগিয়েছে। এই বিরাট পুরুষের জীবন-কথা ও বিভিন্ন রচনার আলোকে-পথের পথিক দেশের তরুণ-সম্প্রদায়ের নিত্য-সঙ্গি হবার যোগ্য। কিন্তু এই আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের দ্রষ্টব্য—দেশের সামনে কি নির্দেশ তিনি রেখে গেলেন। সেই সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে বলতে পারা যায়, ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ এক নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনা, লোকশ্রেয়ঃ ও বিচার বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র, সেইজন্য পরে পরের উপশাস্ত্রসমূহ প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যাবর্তন মূল শাস্ত্রসমূহে; শিক্ষার ক্ষেত্রে-ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ অনুশীলন; সমাজের ক্ষেত্রে— লোকহিতকর অনুষ্ঠানসমূহের প্রবর্তনা, যা অনিষ্টকর তা প্রাচীন হলেও বর্জনীয়; আর রাজনীতির ক্ষেত্রে Dominion Status এর মতো একটা কিছুর আশা রাখা। এমনিভাবে নানা

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনে সমগ্র দেশ আন্দোলিত করে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন —সেই যাত্রা তাঁর মহাযাত্রা।[৭৫]

(৩)

রামমোহন জাতীয় জীবনে যে সমস্ত কর্মের প্রবর্তনার সঙ্কল্প করেছিলেন তার মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজ অনতিবিলম্বে ফল প্রসব করতে আরম্ভ করে। হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর নাম চিরদিনের জন্য এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। এই ডিরোজিও যে গুরুর শিষ্য ফরাসী-বিপ্লবের চিন্তার-স্বাধীনতা-বহ্নি তাঁর ভিতরে প্রজ্জ্বলিত ছিল। ডিরোজিওর সেই বহ্নি-দীক্ষা হয়েছিল। অল্প বয়সে যথেষ্ট বিদ্যা অর্জন করে কবি ও চিন্তাশীল রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হন, আর তিন বৎসর শিক্ষকতা করার পর সেখান থেকে বিতাড়িত হন। এরই ভিতরে তাঁর শিষ্যদের চিত্তে যে আগুন তিনি জ্বালিয়ে দেন তাঁর কলেজ পরিত্যাগের বহুদিন পর্যন্ত তার তেজ মন্দীভূত হয় নি। শুধু তাই নয়, নব্যবঙ্গের গুরুদের ভিতরে এই ডিরোজিওর এক বিশিষ্ট স্থান আছে। এর শিষ্যেরা অনেকেই চরিত্র বিদ্যা সত্যানুরাগ ইত্যাদির জন্য জাতীয় জীবনে গৌরবের আসন লাভ করেছিলেন এরই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের আচার-বিচার বিধি-নিষেধ ইত্যাদির লঙ্ঘন দ্বারা সুনাম বা কুনাম অর্জন করে সমস্ত সমাজের ভিতরে একটা নব মনোভাবের প্রবর্তনা করেন।

ডিরোজিওর দলকে আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন রামমোহনের বিরুদ্ধ দল বলে; কেননা এই দল ধর্ম বিষয়ে উদাসীন তো ছিলেনই অনেক সময় নাস্তিকভাবাপন্ন ছিলেন, আর "If we hate anything from the bottom of our heart it is Hinduism" একথা তাঁদের কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করতেন। তবু এই ডিরোজিওর দল প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ত রামমোহনের ব্রহ্মসমাজের নেতা ও ডিরোজিওর দলের অনেকে উত্তরকালে রামমোহনের ব্রহ্মসমাজের নেতা ও কর্মী হয়েছিলেন, আর বিদ্যা চরিত্রবল জনহিতৈষণা ইত্যাদি গুণে এঁরা যেভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছেন তাতে রামমোহনের বিদেহআত্মার স্নেহাশিষই হয়ত তাঁরা লাভ করেছিলেন।

রামমোহন ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞানের স্বাদ বাঙালি প্রকৃত প্রস্তাবে পায় ডিরোজিওর কাছ থেকে। এই স্বাদের চমৎকারিত্ব কত তা এই থেকে বোঝা যাবে যে বাংলার চির-আদরের মধুসূদন এই ডিরোজিও-প্রভাবের গৌণ ফল। তা ছাড়া সাধারণত বিদ্যানুরাগী বাঙালি হিন্দু এই ডিরোজিওর প্রদর্শিত পথে উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আজো বাঙ্গালি হিন্দুর বিদ্যানুরাগ কমে নি,

---

৭৫. দ্রঃ 'রামমোহন রায়'

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিষ্যদের সেই আন্তরিকতার লালিমা একটু কেমনতর হয়ে গেছে বৈ কি।

কিন্তু এত গুণ ও কার্যকারিতা সত্ত্বেও, স্বীকার করতে হবে, ডিরোজিওর দল দুই এক পুরুষের বেশী প্রাণ ধারণ করে থাকতে সমর্থ হন নি, আর আজ তাঁরা বাস্তবিকই নির্মূল হয়ে গেছেন। কেন এমন হয়েছে তা ভাবতে গিয়ে হয়ত বলতে পারা যায়, তাঁরা দেশের ইতিহাসকে একটুও খাতির করতে চান নি— পবননন্দনের মতো আস্তো ইয়োরোপ-গন্ধমাদন এদেশে বসিয়ে দিতে তাঁরা প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে অন্য একটি কথাও ভাববার আছে। তাঁরা যাই কেন করুন না দীনচিত্ত তাঁরা ছিলেন না— তাঁদের কামনা ভাবনা বাস্তবিকই রূপ নিয়েছিল তাঁদের জীবনে। আর সেই ডিরোজিওর শিষ্য প্রশিষ্যদের চাইতে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু যে সারাংশে উন্নততর জীব তাও হয়ত সত্য নয়। —তবু সেই ব্যক্তিত্ব ও সুরুচি-সমন্বিত প্রাণবান সারবান অপেক্ষাকৃত সরল-চিত্ত ডিরোজিও-দল আমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। অবশ্য চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন কিনা কে জানে। —কে জানে এত জাতি-সম্প্রদায় বিখণ্ডিত এত শাস্ত্র-উপশাস্ত্র-ভার-ক্লিষ্ট এত পূর্ণাবতার-খণ্ডাবতার নিপীড়িত বাঙালি-জীবন আবার কোনোদিন বলবে কি না— Derozio, Bengal hath need ot thee!

(৪)

রামমোহনের শ্রেষ্ঠ দান কি তা নিয়ে আগেও বাংলাদেশে তর্কবিতর্ক হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্যও যে সে-তর্কবিতর্কের প্রয়োজনীয়তা চুকে গেছে তা নয়। তবে যে সমস্ত বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে তার মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের বাদানুবাদই সুবিখ্যাত। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-প্রেমিক পুরুষ ছিলেন। হাফিজের যে সব লাইন তাঁ অতিপ্রিয় ছিল তার একটি এই— হরগিজম মোহরে তু আজ লওহে দিল ও জাঁন রওদ;[৭৬] তাঁর জীবনের সমস্ত সম্পদ-বিপদের ভিতর দিয়ে তাঁর এই প্রেমের পরিচয় তাঁর দেশবাসীরা পেয়েছেন। প্রথম জীবনেই যে পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল তা কঠোর —সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সর্বস্ব দানে তিনি পিতৃঋণ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। সত্যের যাত্রাপথ "মহান মৃত্যুর"র এমনিভাবে সম্মুখীন হওয়া সমস্ত বাঙালি-জীবনে এক মহা-ঘটনা যাকে বেষ্টন করে বাংলার ভাবস্রোতের নৃত্য চলতে পারে —হয়ত চলেছে। কিন্তু গুহাপথের যাত্রী হয়েও দেবেন্দ্রনাথ গভীরভাবে জ্ঞানানুরাগী ও সৌন্দর্যানুরাগী ছিলেন। তবু সংসারনিষ্ঠা জ্ঞানানুশীলন সৌন্দর্যস্পৃহা সমস্তের ভিতরে ঈশ্বর-প্রেমই ছিল তাঁর অন্তরতম বস্তু। তাই তিনি যে রামমোহনকে মুখ্যত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারকরূপে দেখবেন এ স্বাভাবিক। কিন্তু অক্ষয়কুমার ছিলেন জ্ঞানপিপাসু; সে-পিপাসা এমন প্রবল যে এত দিনেও বাংলাদেশে সে রকম লোক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অক্ষয়কুমার মত প্রকাশ

---

৭৬. তোমার ছাপ আমার চিত্ত-ফলক থেকে কিছুতেই মুছবে না।

www.nagorikpathagar.org

করেছেন যে রাজার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার। জ্ঞানানুশীলন অক্ষয়কুমারের কাছে এত বড় জিনিস ছিল যে এ ভিন্ন অন্য রকমের প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করতেন না। তাঁর সেই সুবিখ্যাত সমীকরণ বাংলার চিন্তার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। শুধু প্রার্থনার যে কিছুমাত্র কার্যকারিতা নেই তা প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি লিখেছেন কৃষক পরিশ্রম করে শস্য উৎপাদন করে প্রার্থনা করে নয়। একেই তিনি একটি সমীকরণের রূপ দিয়েছেন এইভাবে :

$$\text{প্রার্থনা} + \text{পরিশ্রম} = \text{শস্য}$$
$$\text{পরিশ্রম} = \text{শস্য}$$
$$\therefore \quad \text{প্রার্থনা} = 0$$

অক্ষয়কুমারের এই মনোভাব কিছুদিন ব্রাহ্ম সমাজে ও সেইদিনের ছাত্র-মহলে কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব ব্রাহ্ম সমাজে অক্ষুণ্ন হয় নি—হয়তো বা দেশের বৃহত্তর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমন ফলপ্রসূ হয় নি।

শেষ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানই রামমোহনের পরে ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেছিল; আর নানা বিপর্যের পর আজো তাঁর নির্দেশই হয়তো অধিকাংশ ব্রাহ্মের মনোজীবনে কার্যকর রয়েছে।

কারো কারো বিশ্বাস দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের যে রূপ দিয়েছিলেন তা রামমোহনের উদ্দেশ্য আদর্শ থেকে পৃথক বস্তু। কিন্তু তা সত্য নয় এই জন্য যে যে-দ্বৈতবাদের উপর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি পত্তন করেছিলেন রামমোহনের জীবনে তারই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সত্য বটে তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য-অবলম্বন করেছিলেন; কিন্তু শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তাঁর মতভেদ বিস্তর; এমন কি, অধিকাংশ হিন্দু সাধক ও দার্শনিকের অবলম্বিত Pantheistic God -এর চাইতে হিব্রু প্রফেটদের ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত, পাপ পুণ্য ভাল-মন্দের নিয়ামক, ঈশ্বরের দিকেই তাঁর চিত্তের প্রবণতা হয়তো বেশী ছিল। তবে রামমোহনের চিত্তের প্রসার ছিল অনেক বেশী তাই ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের যে রূপ দিয়েছিলেন, কর্মী জ্ঞানী ও অন্তঃ প্রবাহী ভক্তিরস সমন্বিত রামমোহনের বিরাট ইচ্ছাধারা তাতে অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হতে পারবে তা আশা করা সঙ্গত নয়। কোনো বড় স্রষ্টাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পুরোপুরি ধরা পড়েন নি; রামমোহনের সূচিত ব্রাহ্ম-সমাজ যদি তাঁর বিরাট বিত্তের প্রতিচ্ছবি হয়ে না থাকে তবে তাতে দুঃখ করবার বিশেষ কিছু নেই।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের যে রূপ দিয়েছিলেন তাতে যে শুধু তাঁর ভক্তি উচ্ছলিত চিত্তের তরঙ্গাভিঘাতই বুঝতে পারা গেছে তা সত্য নয়। ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তিভূমি নির্ণয়ে তিনি যে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তাতে দেশের চিত্ত-বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর একটি বড় আসন লাভ হয়েছে। প্রথমে বেদকে ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল বেদের সব কিছু আশানুরূপ সুন্দর নয়। তারপর তিনি নির্ভর করতে গেলেন উপনিষদের উপরে। সেখানেও মুশকিল যে উপনিষৎ বহু বহু রকমের, তাঁর উপর

www.nagorikpathagar.org

শুধু দ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনই নয় অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনের সংখ্যাও তাতে কম নয়। এই সঙ্কটে জ্ঞানবীর অক্ষয়কুমারের পরামর্শ মতো "আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়" এর উপর ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করা হ'লো। এই ভাবে মানুষের চিত্তকে যে নূতন করে এক গরীয়ান আসন দেওয়া হলো, তার অর্থ কত, ইঙ্গিত কি বিপুল, দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার জাতীয় জীবনের সামনে থেকে আজ সেসব চিন্তা দূরে স্থিত। তাই জাতীয় জীবনে অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথের এই দানের জন্য তাঁদের প্রতি তাঁদের স্বদেশবাসীদের অন্তরের শ্রদ্ধা-নিবেদন আজো তেমন পর্যাপ্ত নয়।

(৫)

আমরা বলেছি বাংলায় এ পর্যন্ত যে চিন্তা ও কর্মধারার বিকাশ হয়েছে তাতে মধ্যযুগীয় প্রভাব বেশী। দেবেন্দ্রনাথের কার্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি মানুষের চিত্তকে ব্রহ্ম পাদপীঠ বলে সম্মান দিয়েছেন, শুধু প্রাচীন ঋষিদের যে কেবল সে অধিকার ছিল তা তিনি মানেন নি। -কিন্তু এই আবিষ্কৃত সত্যের পুরো ব্যবহারে তিনি যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ করেছেন। এই "আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদয়" কথাটি তিনি পেয়েছিলেন উপনিষৎ থেকে —নিজের জীবনের ভিতরে এ কথার সায় তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। কিন্তু অনন্ত প্রয়োজনতাড়িত মানুষকে এই অমৃতের সাধনা জীবনের সমস্ত কর্ম সমস্ত অবসর সমস্ত প্রার্থনা সমস্ত অপ্রার্থনার ভিতর দিয়ে করতে হবে, শুধু বিধিবদ্ধ প্রার্থনার ভিতর দিয়েই নয়— এতটা অগ্রসর হতে তিনি যেন পশ্চাৎপদ হয়েছেন। হয়তো বৃহত্তর মনীষা নিয়ে তিনি যদি অক্ষয়কুমারকে আত্মসাৎ করতে পারতেন তা হলে ব্রাহ্মসমাজ তাঁর হাতে যে রূপ লাভ করত তা দেশের পক্ষে আরো কল্যাণদায়ক হতো।

দেবেন্দ্রনাথের এই যে অন্তরে অন্তরে সেই ব্রহ্মোল্লাস অনুভব করা, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যে তার দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞান ও কর্মের ভিতর দিয়ে শ্রেয়ের অন্বেষণ করে যাবে, যে-অন্বেষণ মুখের প্রার্থনার প্রয়োজন সে অনুভব করতে পারে, নাও পারে, —অনন্ত কর্ম-ও প্রেম পুলকিত মানুষের জীবনে তার আরাধ্য হয়তো তারই জীবনের সুরভি, হয়তো তার জ্ঞানক্ষেত্রে বিশ্বজগতের নিয়মক, হয়তো বিশ্বজগতের জন্য তার প্রেমের বন্ধন, হয়তো কর্মক্ষেত্রে তার চিরজাগ্রত নেতা, অক্ষয়কুমারের ভিতর দিয়ে উৎসারিত এই আধুনিক মনোভাবকে তিনি তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেন নি, এইখানেই তাঁর মধ্যযুগীয়ত্ব; —এবং আধুনিক জীবনোযোগী জ্ঞানানুরাগ সুমার্জিত জীবন-যাপন ইত্যাদি সত্ত্বেও তিনি যে বৃদ্ধবয়সে ভাবের আতিশয্যে নৃত্য করতে পেরেছিলেন হয়তো তাঁর এই প্রগলভা মধ্য-যুগীয় ভক্তিই তার কারণ। অবশ্য মধ্যযুগীয় বলে সে জিনিসটি যে তাচ্ছিল্য বা অসম্ভ্রমের চক্ষে আমরা দেখতে প্রয়াস পাচ্ছি সে কথা মনে করলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হবে। এখানে শুধু এই কথাটি আমার বলতে চাচ্ছি যে এত চেষ্টা সত্ত্বেও আধুনিক অগ্রসর জাতিদের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলবার সামর্থ্য যে আমাদের হচ্ছে না তার এক বড় কারণ আমাদের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁরাও খুব কমই আধুনিক জীবনের দিকে তাকিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হন। তাঁর উপর খ্রিস্টের জীবন ও বাইবেলের প্রভাব বিশেষরূপে কার্যকর হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির যে বিশেষ পার্থক্য ছিল অনেকেই সে কথা বলেছেন। কিন্তু এক জায়গায় বড় গভীর মিলও ছিল, সেখানে হয়তো কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথেরই মানস-পুত্র—সেটি, প্রগলভা ভক্তি। দেবেন্দ্রনাথ রাশভারী লোক ছিলেন, তাই তাঁর অন্তরের এই প্রগলভা ভক্তি তাঁর বাইরের চেহারা ক্বচিৎ আলুথালু করতে পেরেছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র আজন্ম "অগ্নিমন্ত্রের"র উপাসক। এই প্রগলভা ভক্তি তাঁকে প্রায় সব ধর্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদির দিকে নিয়ে গেছে, নিত্য নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে, আর শেষে জগতের সমস্ত ধর্মের সার সংগ্রহ করে এক "নব বিধান" বা নব ধর্মের পত্তনে অনুপ্রাণিত করেছে। কেশবচন্দ্র যে শেষ বয়সে পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলেন সেটি কিছুমাত্র আশ্চর্য বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। বাংলার চির-পরিচিত প্রগলভা ভক্তি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার এই এক অদ্ভুত পুরুষ রামকৃষ্ণের জীবনে আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছিল। যার প্রেরণায় কেশবচন্দ্র আজীবন নানা পথে ছুটাছুটি করেছেন তা এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে কারো ভিতরে সঞ্চিত দেখতে পেলে সেখানে তিনি যে নিজেকে বিকিয়ে দেবেন এ যেমন স্বাভাবিক তেমনি সঙ্গত।

(৬)

সব ধর্মই কি সত্য? এ প্রশ্নের মীমাংসায় রামমোহন বলেছিলেন— বিভিন্ন ধর্মের ভিতরে পরস্পরবিরোধী অনেক নিত্যবিধি বর্তমান, তাই সব ধর্মই সত্য একথা মানা যায় না, তবে সব ধর্মের ভিতরেই সত্য আছে। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের এই মীমাংসা মেনে চলেছিলেন বলতে পারা যায় যদিও উপনিষদের দিকে তিনি বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ভক্তি প্রধান প্রকৃতির কাছে রাজার এ মীমাংসা ব্যর্থ হলো। তিনি বললেন— Our position is not that there are truths in all religions, but that all established religions of the world are true. এই কথাই রামকৃষ্ণ আরো সোজা করে বললেন— যত মত তত পথ। —যত মত তত পথ তো নিশ্চয়ই; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে— সে সব কথা একই গন্তব্য স্থানে নিয়ে যায় কিনা। রামকৃষ্ণ বললেন হাঁ তাই যায়, তিনি সাধনা করে দেখেছেন শক্তি বৈষ্ণব বেদান্ত সুফী খ্রিস্টান ইত্যাদি সব পত্রই এক "অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতিতে নিয়ে যায়। এ সব কথার সামনে তর্ক বৃথা। তবে এই একটি কথা বলা যেতে পারে যে মানুষ অনেক সময়ে বেশী করে যা ভাবে চোখেও সে তাই দেখে।[৭৭] রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কেউ বলেছেন অবতার, কেউ

---

৭৭. যত মত তত পথ॥ এ কথাটির ভিতরে চিন্তার কিছু শিথিলতা আছে। পথ বহু নিশ্চয়ই, কিন্তু যে চলতে চায় তার জন্য একটি বিশেষ পথই পথ, আর জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক সেই পথটি সে নির্বাচন করে বহু পথের ভিতর থেকে।

www.nagorikpathagar.org

বলেছেন উন্মাদ। কিন্তু যিনি যাই বলুন বাংলার হিন্দু চিত্তের উপর তাঁর কথার প্রভাব যে অত্যন্ত বেশী তাতে সন্দেহ নেই। পৌরাণিক ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থানে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন উপনিষদের ব্রাহ্মজ্ঞান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দু জনসাধারণের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে— পৌরাণিক ধর্মের কিছুই বাজে নয়, তাই পরতে পরতে রয়েছে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, হয়তো বা তার চাইতেও ভাল কিছু।

(৭)

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মচর্চার উপরে যে একটা মধ্যযুগীয় ছাপ মারা রয়েছে তা আমরা দেখেছি। কিন্তু বাংলার নববিকশিত সাহিত্যে যেন এই ত্রুটির ক্ষালণের চেষ্টা প্রথম থেকেই হয়ে আসছে। বাংলার নবসাহিত্যের নেতা মধুসূদন আশ্চর্য উদার চিত্ত নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; জাতি ধর্ম ইত্যাদি সঙ্কীর্ণতা যেন জীবনে ক্ষণকালের জন্যও তাকে স্পর্শ করতে পারে নি; আর এই উদারচিত্ত কবি ইয়োরোপের ও ভারতের প্রাচীন কাব্য কলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যেভাবে অবলীলাক্রমে আহরণ করে' তাঁর স্বদেশবাসীদের উপহার দিয়েছেন সে কথা বাঙালি চিরদিনই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। —তাঁর পরে সাহিত্যের যে নেতা বাঙালি জীবনের উপর একটা অক্ষয় ছাপ রেখে গেছেন তিনিও প্রথমজীবনে শিল্পী, সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা অস্পৃষ্ট। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে কবিজনসুলভ স্বপ্ন কম। তিনি বরং নিপুণ চিত্রকর ও বাস্তববাদী স্বদেশপ্রেমিক। তাই তাঁর যে অমরকীর্তি "আনন্দমঠ" তাতে হয়ত নায়ক নায়িকার গূঢ় আনন্দ-বেদনার রেখাপাত

সব সাধনা এক বিশেষ অনুভূতিতে নিয়ে যায়॥ এ কথাটির চারপাশেও কিছু স্থূলতা আছে। কাব্য সম্বন্ধে যেমন একটি নির্বিশেষ রসই একমাত্র কথা নয়, তেমনিভাবে সব ধর্মই সত্য বা সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক এসব কথার উপরে বেশি জোর দিলে মানুষের অনেকখানি চেষ্টার সঙ্গে আমাদের অপরিচয় ঘটে। তাই এসব কথা থেকে জীবনে পর্যাপ্ত প্রেরণালাভ সম্ভবপর না হবারই কথা।

রামকৃষ্ণের এই সব উক্তি ভিত্তি করে তাঁকে একালের এক বড় সমন্বয়াচার্যরূপে দাঁড় করাবার চেষ্টা আমাদের কোনো কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি করেছেন। তাঁদের সেই চেষ্টার সাফল্যের পথে বিঘ্ন আছে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া সমন্বয় কথাটাও একটু বুঝে দেখা দরকার। সমন্বয় সাধারণত দুই ভাবে দেখা যেতে পারে॥মতবাদের সমন্বয় ও জীবনের সমন্বয়। বলা বাহুল্য জীবনের সমন্বয়ই বড় কথা, মানুষের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের মাহাত্ম্যের পরিমাপ এই থেকে। এই জীবনের বিরাটত্বের দিকে রামকৃষ্ণ যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে চেয়েছিলেন এ কথা বললে তাঁর প্রতি বোধ হয় অসত্যের আরোপ করা হবে। বরং তাঁর সম্বন্ধে বোধ হয় এইই সত্য যে তাঁর অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল মানুষের জন্য এক সুনিবিড় স্নেহ, তাই মানুষকে তিনি শুনিয়েছিলেন কিছু আশ্বাসের বাণী। তাই তিনিও আমাদের একজন বড় শিক্ষক॥বন্ধু। কিন্তু আমাদের কোনো গুরু সম্বন্ধেই অতিরঞ্জিত বা অসঙ্গত ধারণা থাকা আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অকল্যাণকর। ('রামমোহন রায়' দ্রঃ)

www.nagorikpathagar.org

তেমন নেই,[৭৮] হয়ত এমন কোনো সৌন্দর্য-মূর্তি আঁকা হয় নি যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের নয়নে প্রতিভাত হবে a thing of beauty আর সেই জন্য a joy for ever. কিন্তু তবু এটি অমর এইজন্য যে এতে যেন লেখক কি এক আশ্চর্য ক্ষমতায় পাঠকের সামনে প্রসারিত করে ধরেছেন দেশের-দুর্দশা-মথিত তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়— যে হৃদয় তার সুগভীর বাস্তবতার জন্যই সৌন্দর্যের রহস্যময় খনি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত শিল্পের ক্ষেত্রে থাকতে পারেন নি; শেষ বয়সে ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি অবতরণ করেছিলেন। তাঁর চরিতাখ্যায়করা বলেন, আত্মীয়বিয়োগে অধীর হয়ে তিনি ধর্মে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ধর্ম তত্ত্বে ও কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রমস্বীকার করেছেন, যে সুবৃহৎ আদর্শ স্বজাতির সামনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন তাকে আর্তের কর্ম না বলাই সঙ্গত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্মালোচনায়ও দেখতে পাওয়া যায় তাঁর দেশহিতৈষণা। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত দেশের অগ্রগতিকে খানিকটা সাহায্য করলেও বেশী সাহায্য করতে পারে নি, কেননা দেশ বলতে কেমন করে তিনি বুঝেছিলেন দেশেও হিন্দু তাও আবার সকল হিন্দু নয় সমসাময়িক শাসক ও সংস্কারকদের হাতে যে হিন্দু কিছু দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সেই হিন্দু। এখানেও তাঁর সেই স্বদেশ-প্রেম; কিন্তু এ প্রেম খুব গভীর হলেও কিছু একরোখা, তাই শেষ পর্যন্ত জাতির ত্রাণকর্তার বড় আসন তাঁর স্বদেশবাসীরা হয়ত তাঁকে দিতে পারবেন না।

জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনায় রামমোহনের সুর শেষ পর্যন্ত তাঁর পশ্চাদবর্তীরা রাখতে পারেন নি" সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি মধুসূদন যে গ্রামে সুর ধরেছিলেন তা নেমে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রই যখন নিজেকে দেশের কল্যাণের রাজপথে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারলেন না "অন্যে পরে কা কথা"। তাই তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনার পরিমাণ যতই বেশী হোক, দশের করতালিতে যতই তাঁদের সাহিত্যিক জীবন মুখরিত হয়ে থাকুক, বাংলার চিত্তের সাধনে সাহায্য তাঁরা কিছুই করতে পারেন নি বললে চলে; বরং ধর্মের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ভাবোন্মত্ততা সুপ্রকট হয়ে উঠল, নানা ভাবে তাকেই তাঁরা প্রদক্ষিণ করেছেন।

(৮)

কিন্তু বাংলাদেশ এমনিতর একটা প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়েই চলেছে, বৃহত্তর জীবনের দিকে তার গতি রুদ্ধ, এতটা বলতে গেলে সত্যের অপলাপ করা হবে। রামমোহন যে কর্ম ও চিন্তার সূচনা করে গেলেন ও তাঁর পরে কেশবচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভিতর দিয়ে তার যে একটি প্রতিক্রিয়া হলো, এসব বিরোধ কোনো এক বীর্যবন্ত সামঞ্জস্যে উপনীত হয় নি, ও তার জন্য বাঙালির জাতীয় চরিত্র ও কর্মধারা একটা সুদর্শন বৈশিষ্ট্য

---

৭৮. স্বল্প পরিসরে ভাবানন্দের অন্তর্দ্বন্দ্ব অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

অর্জন করে নি, এ সত্য; কিন্তু এ বিরোধ চূর্ণ [illegible] একটা উদার বীর্যবন্ত জাতীয়তার দিকে চোখ দেবার চেষ্টা যে কারোই নেই তা সত্য নয়। জাতির এ নব প্রয়োজন দুইজন চিন্তা ও কর্মবীরের জীবনের ভিতর দিয়ে ফুটেছে—একজন বিবেকানন্দ অপরজন রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি ব্যাপারটি আমরা বুঝি আর নাই বুঝি কিন্তু এ সত্য যে তিনি বার বার জোর দিয়েছেন জগৎ-হিতের উপরে। এ উপেক্ষা করে বিবেকানন্দ মুক্তির প্রার্থী হয়েছিলেন, তার জন্য তিনি তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের ভিতরে দোষ কম নয়, প্রথমত রবীন্দ্রনাথের "গোরা"র মতো সব সময়ে তিনি যেন বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে লড়বার জন্য তৈয়ার, দ্বিতীয়ত সন্ন্যাস বেদান্তের তিনি গোঁড়া, তৃতীয়ত ব্রাহ্মদের যে তিনি নিন্দা করেছেন তাদের, ঐতিহাসিক বোধ নেই বলে সে অভিযোগটি তাঁর সম্বন্ধেও খাটে—ব্রাহ্মদের সংস্কারের প্রয়াসের কোনো অর্থ তিনি যেন খুঁজে পান নি, অথচ তিনি নিজে একজন ছোটখাট সংস্কারক ছিলেন না; চতুর্থত ভারত আধ্যাত্মিক ইয়োরোপ জড়বাদী ভারতকে ইয়োরোপের আচার্য হতে হবে এই ধরনের কতকগুলো কথা প্রচার করে স্বজাতির অন্তঃসারশূন্য দম্ভের সহায়তাই তিনি বেশী করেছেন; তবু মোটের উপর এই বীরহৃদয় সন্ন্যাসী সত্যকার স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন— মানব প্রেমিকও ছিলেন। তাই সেবাশ্রম প্রভৃতির সূচনা করে জাতীয় জীবনে তিনি যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র রচনা করেছেন জাতির চিত্তপ্রসারের জন্য বাস্তবিকই তা অমূল্য, এবং জাতীয় জীবনের দৈন্যের জন্য নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই সব প্রতিষ্ঠান বাংলার হিন্দু যুবককে দেশের সত্যকার সন্তান হতে অনেকখানি সাহায্য করছে তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার যে রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্কীর্ণতা ভেঙে তাকে বৃহত্তর করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদর্শের অনুপ্রেরণা এ পর্যন্ত বাংলার জাতীয় জীবনে কমই অনুভূত হয়েছে; এখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়ত্বের আদর্শই দেশের জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কবি, তাও আবার সূক্ষ্ম-শিল্পি গীতিকবি, তাই যে মহা-মানবতার গান তিনি গেয়েছেন আমাদের স্থুল-প্রকৃতি জন-সাধারণের কত দিনে তার স্পন্দন জাগবে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

(৯)

হিন্দুর নিজের ভিতরেই মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সংগ্রামের যখন এই চেহারা,— তখন আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে— হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যেভাবে উঠেছে তা একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের দুর্দশার প্রমাণ। মুসলমানের দুর্দশা এই জন্য যে এ সংগ্রামে সে যেভাবে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখে তা থেকে বুঝতে পারা যায় তার স্বপ্ন দেখারই অবস্থা। বাস্তবিকই মুসলমানের অবস্থা খুবই বিস্ময়কর— এতদিন ধরে পরিবর্তিত অবস্থায় বাস করেও তন্দ্রার ঘোরে দুই একটি প্যানইসলামী বোলচাল দেওয়া ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ জাগ্রত চিত্ততার পরিচয় সে আজ পর্যন্ত দেয় নি। আর

www.nagorikpathagar.org

হিন্দুর জন্য আফসোসের এই জ[illegible]রে এত সংস্কার চেষ্টা এত সাধনা সত্ত্বেও এই সমস্যার একটা মীমাংসা করবার সামর্থ্য তার হলো না। এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে বিধাতার জ্বালা এক তীব্র আলো, —এরই ঔজ্জ্বল্যে আমরা দেখে নিতে পারছি বর্তমান জগতের জ্ঞান ও কর্মের উৎসবে আমাদের স্থান কোথায়।

বাংলার যে প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তা অনেক সময় এমন সামান্য কারণে হয়েছে যা থেকে বুঝতে পারা যায় প্রাচীন সংস্কার বাঙালির জীবনে কত বদ্ধমূল— চোখ খুলে জগতকে দেখতে সে কত নারাজ। এরই সঙ্গে কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে বাঙালি এ পর্যন্ত তার চোখ খোলার সাধনার বড় সাধক রামমোহনকে মোটের উপর প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। —এই প্রত্যাখ্যানের কারণ সম্বন্ধে দুটি কথা বলে যেতে পারে, —প্রথমত বাঙালি সাধারণত ভাবপ্রবণ, আর রামমোহন লোকটি যেমন আগা-গোড়া নিরেট কাণ্ডজ্ঞান, দ্বিতীয়ত বাঙালি হিন্দুর পরম আদরের প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে তিনি বেশ উচু গলায় কথা বলেছেন। —এই প্রতিবাদকারী অথচ মহাপ্রাণ রামমোহনকে বাঙালি হিন্দু শেষ পর্যন্ত কি ভাবে গ্রহণ করবে বলা সহজ নয়। কিন্তু বিশ্ব জগতের দিকে বাস্তবিকই যদি তার চোখ পড়ে তাহলে সে হয়ত দেখবে এই প্রতিবাদকারীর কথার ভিতরেই সত্যের পরিমাণ বেশী, তাই তাঁর পথ নির্দেশই অনেক পরিমাণে কল্যাণ পথের নির্দেশ। তাছাড়া রামমোহনকে গ্রহণ করা বাঙালি হিন্দুর জন্য যে শুধু আয়াস-সাধ্যই হবে এটি সঙ্গত নয় এই জন্য যে রামমোহনও বাঙালি-সন্তান, শুধু তাই নয়, তাঁর বিশাল দেহের ভিতরে যে চিত্তটি ছিল সমস্ত অভিনবত্ব সত্ত্বেও তা বাঙালিরই কোমল চিত্ত।

মনে হয়, বাঙালির রামমোহনকে গ্রহণ করার সব চাইতে বড় অন্তরায় এইখানে যে সে সাধারণত ঘর-মুখো আর রামমোহন আবাল্য ঘর-মুখো ছিলেন না। এই বাহির-মুখো হওয়ার সাধনাই হয়ত বর্তমান বাঙালি জীবনে বড় সাধনা —হয়ত এরই সাহায্যে সবলতর কাণ্ডজ্ঞান শ্রেষ্ঠতর পৌরুষ ইত্যাদি কল্যাণ পথের সম্বল আহরণ তার পক্ষে সহজ হবে। আর এই বাহির-মুখো হওয়ার উপায়ও তার অতি নিকটে। দৈব ঘটনায় বহু জাত বহু সম্প্রদায় দেশের বুকে এক জায়গায় মিলেছে, সেই মিলনকে অন্তরের দিক দিয়ে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে বাহির-মুখো হওয়ার বড় উপায় —বাঙালির সৌভাগ্য-রূপী তার এ যুগের কবি বার বার একথা বলেছেন।

এরই সঙ্গে মুসলমানের জাগরণ যদি সত্য হয়, তাহলে কিছু বেশী সুফল লাভের সম্ভাবনা। যে গুরু তাকে উপদেশ দিয়েছেন —ক্ষুধা লাগলে খেয়ে নামাজ পড়ো, তাঁর অনুবর্তিতায় বস্তুতন্ত্র তার পক্ষে স্বাভাবিক। আবার সেই জন্যই বস্তুর শিকলে বন্দী হওয়াও তার পক্ষে কম স্বাভাবিক নয়। ফলে মুসলমানের হয়েছেও তাই। —এই মনের বন্ধন সহজভাবে চুকিয়ে দিয়ে মুসলমান নব মানবতার ধ্বজা বহন করবার যোগ্য হবে কিনা, অথবা কতদিনে হবে, জানি না। যদি হয়, তবে বাংলার ধর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে তার দান কম হবে না; তাহলে স্বাপ্নিক হিন্দু ও বস্তুতন্ত্র মুসলমান এ দুয়ের মিলনে বাংলার যে অভিনব

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় জীবন গঠিত হবে— তার কীর্তি কথা বর্ণনা করবার ভার ভবিষ্যত সাহিত্যিকদের উপর থাকুক।

"মুসলিম সাহিত্য-সমাজের" দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। ফাল্গুন, ১৩৩৪

সম্মোহিত মুসলমান

হজরত মোহাম্মদ যে একজন মহাপুরুষ, অর্থাৎ সত্য তিনি শুধু কথায় প্রচার করেননি তা তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতরে এক আশ্চর্য-দৃঢ়রূপ লাভ করেছিল, সে সম্বন্ধে তর্ক বিচার করবার কাল বোধ হয় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনো যাঁরা তাঁর মাহাত্ম্যের পানে সন্দিগ্ধ চিত্তে তাকান, কেননা, তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, অথবা শেষ বয়সে বহু বিবাহ করেছিলেন, বলা যেতে পারে, কিছু সরল প্রকৃতি নিয়ে তাঁরা জীবনের জটিলতাবর্তে ঘুরপাক খেয়ে মরছেন। হয়তো তাঁদের সংস্কার আছে, মহাপুরুষের যে জীবন, শিশুর মতো সারল্যই তাতে প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক ও শোভন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে, তাঁদের এ সংস্কার শুধু এক মধুর খেয়াল—সত্যে, এর প্রতিষ্ঠা নয়। মহাপুরুষের জীবনে কেমন এক ঋজুতা আমরা প্রত্যক্ষ করি সত্য, আসলে কিন্তু সেটি ঋজুতার ভঙ্গিমা মাত্র। বহুভঙ্গিমতা বা মানব-মনের জটিলতা মহাপুরুষের জীবনে নিরাকৃত হয়ে যায় না; সে সমস্ত শুধু এক পরমাশ্চর্য অধিকারে একমুখিত্ব লাভ করে।

কিন্তু মহাপুরুষ মোহাম্মদের অভক্ত যে তাঁর জীবনের এই জটিলতায় বিড়ম্বিত হয়েছেন সে আর কতটুকু দুঃখের বিষয়। তার চাইতে অনেক বেশী শোচনীয় ব্যাপার তাঁর অনুবর্তী ভক্তদের ভিতরেই ঘটেছে, তাঁরাও তাঁর এই বিচিত্র অথচ ভগবন্মুখী জীবনে বিড়ম্বিত হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মহাসাধনাকে বিড়ম্বিত করেছেন। তাঁরা তার পানে যে দৃষ্টিতে চেয়েছেন ও যে দৃষ্টিতে চাইবার জন্য অপরকে আহ্বান করেছেন, তাতে এই সহজ অথচ অতি বড় সত্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে, জগতের অনন্তকোটি মানুষের মতো হজরত মোহাম্মদও একজন মানুষ; —মানুষের ইতিহাসের এক বিশেষ স্তরে শক্তিমাহাত্ম্যে তিনি সুপ্রকট, কিন্তু তাঁর শক্তিমাহাত্ম্য-লাভই সে-ইতিহাসের চরম কথা নয়, তার চাইতে গভীরতর কথা এই, —জগৎসংসারের যিনি চির জাগ্রত নিয়ামক অনন্ত কাল ধরে তিনি এমনিভাবে শক্তিমান আর সাধারণ এই দুই শ্রেণীর চক্রের সমবায়ে সংসার রথকে চিরচলন্ত রেখেছেন। বাস্তবিক, মহাপুরুষ যে সর্বজ্ঞ নন, মানুষের সর্বময় প্রভু নন, মানুষের জীবন সংগ্রামে তিনি একজন বড় বন্ধু মাত্র—অবশ্য যেমন বন্ধু সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোকস্তম্ভ; তাঁর কথাও চিন্তার ধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে একথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে যে চরম অপমানে অপমানিত করা

www.nagorikpathagar.org

হয়, কেননা, সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য সেই আল্লাহর উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায় যে আল্লাহ চিরজাগ্রত, চিরবিচিত্র, বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন শুভ চেষ্টায় যাঁর মহিমা প্রকটিত; হজরত মোহাম্মদের অনুবর্তীরা সেই প্রাণপ্রদ সদাস্মর্তব্য কথা অদ্ভুতভাবেই মন থেকে দূর করে দিয়েছেন; হয়ত তারই ফলে অন্যান্য ছোটখাট প্রতিমার সামনে নতজানু হওয়ার দায় থেকে কিছু নিস্কৃতি পেলেও "প্রেরিতত্ব" রূপ এক প্রকাণ্ড প্রতিমার সামনে নতদৃষ্টি হয়ে তাঁরা যে জীবন পাত করছেন আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা সাংসারিকতা সবদিক থেকেই তা শোচনীয়রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত।

অথচ হজরত মোহাম্মদ সাধনার এই বিড়ম্বনা ভোগ কত বিস্ময়কর ব্যাপার! মানুষের সাষ্টাঙ্গ প্রণামকে পর্যন্ত এই মহাপুরুষ গ্রহণ করেননি। আর তাঁর আবিষ্কৃত যে বজ্রসার তৌহীদ (একশ্বরতত্ত্ব), তাঁর অবলম্বিত যে আশ্চর্য অনাড়ম্বর সাংসারিক জীবন, আগ্নেয় সাম্যবাদ, আল্লাহর পানে সে-সমস্তের যে প্রচণ্ড আকর্ষণ, কিসের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্য যত বড়ই হোক, একথা অস্বীকার করবার কিছুমাত্র উপায় নেই যে, সেই আল্লাহর উপলব্ধি, অন্য কথায়, সমস্ত জগতের সঙ্গে প্রেম ও কল্যাণের যোগের উপলব্ধি, আজ তাঁর অনুবর্তীদের দৃষ্টির সামনে নেই। জীবনের অর্থই যেন আধুনিক মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার, আত্মা, আনন্দ, এ সমস্তের গভীরতার যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জগতের পানে সে তাকায় শুধু সন্দিগ্ধ আর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে— এর কোলে যেন সে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, একে যেন সে চেনে না। কেমন এক অস্বস্তিকর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সারা জীবন সে ভীত ত্রস্ত হয়ে চলেছে।

মুসলমানের, বিশেষ করে আধুনিক মুসলমানের, এই অবস্থা লক্ষ্য করেই বলতে চাই— সে সম্মোহিত। সে শুধু পৌত্তলিক নয়' সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতার চরম দশা বলা যেতে পারে; —তার মানবসুলভ সমস্ত বিচার বুদ্ধি, সমস্ত মানস উৎকর্ষ, আশ্চর্যভাবে স্তম্ভিত! বর্তমান তার জন্য কুয়াসাচ্ছন্ন দিগদেশবিহীন, অতীত ভবিষ্যৎ তার নেই। সময় সময় দেখা যায় বটে সে তার অতীতকালের বীরদের, রাজাদের, ত্যাগীদের মনীষীদের কথা বলছে। কিন্তু এ শেখানো বুলি আওড়ানোর চাইতে এক তিলও বেশী-কিছু নয়। জীবনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করবার দুর্নিবার প্রয়াসের মুখেই যে উচ্ছিত হয় যুগে যুগে মানুষের বীরত্ব, ত্যাগ, শাস্ত্রজ্ঞান, মনীষা, তার প্রাচীন ইতিহাসে এর যোগ্য প্রমাণের অভাব নেই। হজরত ওমর ও ইবনে জুবেরের মতো বীর-কর্মীদের, সাদী-ওমরখাইয়ামের মতো মনীষীদের, গাজ্জালী-রুমির মতো সাধকদের, জীবনের অন্তস্থল দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনরহস্যের সেই গহনে উঁকি দেবে, এই সম্মোহিতের কাছ থেকে তা আশা করা দুরাশা! এ সমস্তই যে তার কাছে শুধু নাম-পঠন-অযোগ্য অক্ষরের মতো কালের পটে কতকগুলো আঁচড়। তার জন্য একমাত্র সত্য শাস্ত্রবচন। অথবা তাও ঠিক না; শাস্ত্রবচনের পিছনে যে সত্য— ও শ্রেয়ঃ অন্বেষী মানবচিত্তের স্পন্দনের অপূর্বতা রয়েছে শাস্ত্রবচনের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির সেই দ্বার তার জন্য যে রুদ্ধ। প্রকৃত সম্মোহিতের মতো তার জন্য একমাত্র সত্য প্রভুর হুকুম

www.nagorikpathagar.org

—স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী প্রভুর হুকুম। সেই প্রভুর হুকুমে কখনো কখনো ভবিষ্যতের অসংলগ্ন স্বপ্ন সে দেখে কখনো 'প্যান ইসলাম এর স্বপ্ন, কখনো এই তের শত বৎসরের সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত বর্তমান পরিবেষ্টন, যেন যাদুমন্ত্রে উড়িয়ে দিয়ে সেই তেরশত বৎসরের আগেকার 'শরীয়ত' এর হুবহু প্রবর্তনার স্বপ্ন। কত নিদারুণ তার জীবনের পক্ষে এই প্রভুর হুকুম তার প্রমাণ এইখানে যে, এর সামনে তার সমস্ত বুদ্ধি বিচার স্নেহ প্রেম শুভেচ্ছা, সমস্ত স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব, আশ্চর্যভাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়, সে যে চিরদাস, চিরঅসহায়, অত্যন্ত অপূর্ণাঙ্গ মানুষ, এই পরম বেদনাদায়ক সত্য ভিন্ন আর কিছুই তার ভিতরে দেখবার থাকে না।

কিন্তু এই সম্মোহন আজ যত প্রবল চেহারা নিয়েই দাঁড়াক, অনুসন্ধান করলে বুঝতে পারা যাবে, এ নূতনই নয়, —পুরাতনও বটে। মনে হয়, এ সম্মোহনের এক বড় কারণ হজরত মোহাম্মদের মহাজীবনই। সে জীবন তপস্যায়, প্রেমে, কর্মে বিচিত্র, ও বিরাট; নানা দুঃখ দহনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার ফলে প্রখর ঔজ্জ্বল্য; তার উপর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মানুষের হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো চিরকালই পৌত্তলিক; কিন্তু হজরত মোহাম্মদের ব্যক্তিত্বের এই প্রাখর্যের জন্যই হয়ত মুসলমান ইতিহাসের অনেক শক্তিধর পুরুষও তার সম্মোহনের নাগপাশ এড়িয়ে যেতে পারেন নি। —হজরত ওমর ও ইমাম গাজ্জালির কথা বলতে চাই। হজরত ওমরের ভিতরে দেখা যায়, তিনি তাঁর প্রকাণ্ড পৌরুষকে যেন আর সব দিকে লৌহ-আবেষ্টনে বন্ধ করে শুধু হজরত মোহাম্মদের অনুবর্তিতার পানে উন্মুখ রেখেছিলেন; সত্য আর হজরত মোহাম্মদের সাধনা এক ও অভিন্ন এই-ই যেন তাঁর মনোভাব। তাঁর নিজের জীবন সাধনার জন্য এই একান্ত অনুবর্তিতার প্রয়োজন সব চাইতে বেশী ছিল কিনা সে জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, কেননা, মুসলমান জগতের সামনে মাত্র একজন বিশিষ্ট সাধক তিনি নন, তাঁর চাইতে সাধারণত তাঁর সমাদর এইজন্য যে, সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্য তিনি এক অতি বা আদর্শ। ইমাম গাজ্জালিও তেমনিভাবে দেখা যায় দর্শনচর্চার বিরুদ্ধে এই অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করেছেন— সাপুড়ে তাঁর অল্প বয়স্ক পুত্রের সামনে সাপ খেলায় না, তাঁর ভয় এই, সে তাঁর বাপের অনুকরণ করতে গিয়ে বিপদ ঘটাবে; সর্বসাধারণের জন্য দর্শনচর্চাও এমনিভাবে বিপজ্জনক।[৭৯] —সর্বসাধারণের জন্য শাস্ত্রানুগত্যেও যে বিপদ কিছুমাত্র কম নয়, তাতে তাদের সত্যানুসন্ধিৎসায় গ্লানি পৌছিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী, নিজে দার্শনিক আর সাধক হয়েও সে দিকে যে তিনি দৃষ্টি রাখেন নি তার স্বপক্ষে এই সামান্য কথা বলা যেতে পারে যে, তাঁর যুগে এ প্রতিবাদের হয়ত প্রয়োজন হয়েছিল, —বৃথাতর্কের প্রবণতা ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যান্বেষীকে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন হজরত মোহাম্মদের মহাদৃষ্টান্তের। তবু গোটা দর্শন

---

৭৯. Confessions of Al Ghazzali নামক পুস্তক দ্রঃ

www.nagorikpathagar.org

চর্চার বিরুদ্ধে তাঁর যে প্রতিবাদ তাকে অত্যন্ত দোষাবহ বলা ভিন্ন উপায় নেই। যুক্তি বিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবনপথে বাস্তবিকই এ যে মানুষের এক অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটলে পূর্বানুবর্তিতা পাষাণভাবের মতনই মানুষের জীবনের উপরে চেপে বসে, দেখতে দেখতে তার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম প্রবাহ শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে আসে। —কর্মে আত্মপ্রকাশ মানুষের প্রকৃতি চায়, এই-ই তার জন্য কল্যাণকর আর এই কর্মচেষ্টার জীবনে পূর্বানুবর্তিতা যে মানুষের পরম কাঙ্ক্ষিত কে না তা জানে। তবু মানব-প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বহুধা সার্থকতার কথা মন থেকে দূর করে দিয়ে কর্মের আয়োজন যেখানে মানুষ করে সেখানে সে যে মরণের আয়োজনই করে চিন্তাশীলেরা একথা আজ বিশ্বাস করেন।

ইসলামের ইতিহাস বহুল পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস। হজরত মোহাম্মদের সংযমের সাধনা তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই আরবের আদিম উচ্ছৃঙ্খলের ও পারস্যের বিলাস-মত্ততার আবর্তে পড়ে বিপর্যয় ভোগ করেছিল। সে- বিপর্যয় সামলে নিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করবার অবসর খুব কমই তার ঘটেছে। হয়ত সেই জন্যও কিছু বাড়াবাড়ির ছবি মুসলমান-ইতিহাসের প্রায় সব পর্যায়েই আমাদের চোখে পড়ে —কখনো চরম উচ্ছৃঙ্খলতার বাড়াবাড়ি, কখনো অন্ধ অনুবর্তিতার বাড়াবাড়ি। তবু হজরত মোহাম্মদের সাধনার পথে উদার বিচার-বুদ্ধি নিয়ে সহজ ছন্দে বেড়ে উঠলে মানুষের জীবনে যে কি অলৌকিক মহিমা প্রকাশ পায়, সৌভাগ্যবশত তার দৃষ্টান্তও মুসলমান-ইতিহাসে খুব বিরল নয়। মুসলমান সমাজ নূতন করে তাঁদের মাহাত্ম্যের কাহিনী পাঠ করবে যেন তারই অপেক্ষায় বিশ্বজগতে সৌরভ ছড়িয়ে অথচ নিজেদের ঘরে কতকটা অবহেলিত হয়ে নীরব মহিমায় তাঁরা বিরাজ করেছেন। বিশ্ববরেণ্য শেখ সাদী এই পুণ্যশ্লোক মুসলমানদের অন্যতম। তাঁর যে সমস্ত আনাড়ম্বর অথচ প্রাণ— ও বিশ্বাস-সঞ্চারী বাণী হজরত মোহাম্মদের তৌহীদ ও বিশ্ব-কল্যাণের সাধনাই ভব বিহ্বল হয়ে নয়, অন্ধ অনুবর্তিতার পথেও নয়, —সবল মনুষ্য প্রকৃতি ও উদার বিচার-বুদ্ধির পথে। মনীষী তিনি, সত্যদ্রষ্টা তিনি, মানুষকে তিনি দেখেছেন জাতি-ধর্মের, আচার-আড়ম্বের সমস্ত আবরণ ভেদ করে, সেই মুক্ত অবিচলিত দৃষ্টিতেই তিনি চেয়েছেন হজরত মোহাম্মদের পানে; দেখেছেন, মানুষের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার, বেদনা-সম্ভাবনার, কি আশ্চর্য স্ফুতি ও সামঞ্জস্য-সাধন সে-জীবনে ঘটেছে, সেই জন্য তা কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল কি বজ্ররোধী দৃঢ়তা তার অঙ্গে অঙ্গে-সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তা মানুষের কত অবলম্বনযোগ্য! আর যদি জ্ঞানে ও মনুষ্যত্বে বিকশিত হয়ে জগতের কাজে লাগবার আকাঙ্ক্ষা মুসলমানের অন্তরে জাগে তখন এই মহামনীষী সাদী হবেন তাঁদের একজন শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। বুদ্ধি বিচার প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল বিসর্জন দিয়ে নতজানু হয়ে মহাপুরুষের পায়ে গড় হওয়া যে তাঁরও প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, তাঁর প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন হচ্ছে, প্রকাণ্ড এই জগতের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর সাধনাকে সমস্ত প্রাণ ও মস্তিষ্ক দিয়ে গ্রহণ করায়, এই

www.nagorikpathagar.org

সেই, অধিকারে, প্রয়োজন হলে, তাকে অতিক্রম করায়, সেই তত্ত্বের সন্ধান যাঁদের কাছ থেকে নব মুসলিমের লাভ হবে এই শ্রেষ্ঠ মুসলমান সাদী হবেন তাঁদের অন্যতম।[৮০]

জগতের জন্য ইসলামের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় নি। বরং ইসলামের যে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণতা, সাম্য ও মৈত্রীর বীর্যবন্ত সাধনা, জগতের জন্য আজো সেই সমস্তেরই দারুণতম প্রয়োজন। কিন্তু এই কল্যাণময় ইসলামকে বহন করে জগতের আর্তক্লিষ্ট নরনারীর সেবায় পৌঁছে দেবে কে? নিশ্চয়ই সেটি সেই কৃপার পাত্রের দ্বারা সম্ভবপর নয় যে, "আলেম" বলে নিজের পরিচয় দেয়, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার যার সাংঘাতিকভাবে বন্ধ! শত শত বৎসরের পুরাতন বিধিনিষেধের তুচ্ছ তালিকা থেকে চোখ উঠিয়ে আল্লাহর এই জীবন্ত সৃষ্টির অন্তহীন সুখ দুঃখ ব্যথার উত্তরাধিকার বংশসূত্রে নির্ণীত হয় না, গতানুগতিক শিষ্যত্ব-সূত্রেও নির্ণীত হয় না, হয় সাধনা-সূত্রেই। সাধক যে, নিজের রসনা দিয়ে সত্যের অমৃতস্বাদ গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা যাঁর চিত্তে জাগে, তাঁরই চোখে কেবল পূর্ববর্তীর সাধনার দ্বার উদঘাটিত হয়, আর যে বেদনায় ও শ্রদ্ধায় সেই সাধনাকে বহন করে নব নব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করে তাকে সার্থকতা দান করতে হয়, সেই পরম সৌভাগ্য অধিকারও তাঁর জন্যে। সেই সাধনার দ্বারা শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের কথা বিস্মৃত হয়ে মুসলমান হজরত মোহাম্মদের বিরাট তপস্যাকে বহন করতে গিয়েছিল শুধু অন্ধ অনুবর্তিতার লাঠিতে ভর দিয়ে! সে যে পিষ্ট পর্যুদস্ত হবে, তার মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত হবে, এ তার অপরিহার্য পরিণাম। সেই তপস্যাহীন, সুতরাং অর্ধবিকশিত মানুষ, মুসলমানই জগতের দুঃখ ব্যাধিতে ইসলামের সেবা পৌঁছে দিতে হাত বাড়াতে পারবে, এ মোহ যে আজো আমাদের চিন্তা ও কর্মের নেতাদের অন্তরে প্রবল, একটা গৌরবময়-অতীতের-অধিকারী সম্প্রদায়ের পক্ষে এর বড়ো লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? আল্লাহর এ জগৎ বিরাট, অনাদ্যন্ত হর্ষে ক্ষোভে, ব্যথায় আনন্দে, এ বিচিত্র, এই বিরাট বাস্তবতার সঙ্গে যে যোগযুক্ত নয় জীবনে শ্রেয়োলাভের আসল দরজা তাঁর জন্য বন্ধ, নূতন করে এই সত্য আমাদের চিত্তে প্রেরণা সঞ্চার করুক; আমাদের দেহকোষাণু সমূহ অক্সিজেন-সংস্পর্শে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ ও পুণর্গঠিত হয়, এমনি করেই দেহ সবল ও কার্যক্ষম থাকে, আমাদের চিত্তকেও তেমনিভাবে নব নব জ্ঞান ও প্রেরণার দহনে নিরন্তর দগ্ধ ও সঞ্জীবিত করতে হয়, নইলে জড়তার আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে তা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ও জীবনের পক্ষে অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়ায়, —নতুন করে এ জ্ঞানের দহনে আমাদের সমস্ত জড়তা ভস্মীভূত হয়ে যাক; আর আমাদের চিত্ত বল সঞ্চার করুক এই নব বিশ্বাস যে, মানুষের

---

৮০. সাদীর একটি অতি প্রসিদ্ধ বাণী এই "তরিকত বজুজ খেদমতে খলক্ নিসত বতসবিহ্ ও সাজ্জাদও দলক্ নিসত্। "সৃষ্টির সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়। তসবিহ্ জায়নামাজ ও আলখাল্লায় ধর্ম নেই। —বোধ হয় এই বাণীটিই রাজা রামমোহন রায়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত রামমোহনের জীবনী ৫২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাঁধানো রাজপথ নেই, —জগৎ যেমন এক স্থানে বসে নেই মানুষও তেমনি তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে একস্থানে স্থির হয়ে নেই আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিতার নয়, সদাজাগ্রতচিত্ততার। হয়ত তাহলে আমাদের চোখের সম্মোহন ঘুচে যাবে। তখন জগতের সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের পর্যায়ের অবসান হবে। তখন হয়ত সহজ দৃষ্টিতেই আমরা দেখতে পাব, বিপুলা এ পৃথিবীর কত বিচিত্র প্রয়োজনে কত ধর্ম, কত নীতি, কত সভ্যতা কোন সভ্যতা কোন অনাদি কাল থেকে তার কোলে জন্মলাভ করে আসছে, আর এই অনন্ত জন্মপ্রবাহে ইসলামের অর্থ কি, তার নব নব সম্ভাবনা ও সার্থকতা কোন পথে। তখন প্রীতিতে আর শ্রদ্ধায়ই আমরা অবলোকন করতে পারব, আমাদের প্রিয় হজরত মোহাম্মদের সাধনার সঙ্গে যে সমস্ত মহাপুরুষের সাধনার হুবহু মিল নেই তাঁরাও কেমন করে সত্যের চির-অমল চির-আনন্দপ্রদ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার যে গৌরব ও অমোঘ কার্যকারিতা, তখন জগৎ ও ইসলামের জন্য সেই শ্রেষ্ঠ সার্থকতার সন্ধানে আমাদের চিত্ত উন্মুখ হবে।

মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। বরং ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ইসলামের যে প্রাণভূত তৌহীদের সাধনা, মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আল্লাহকে যে জানতে চায়, তার চিত্তে ভিন্ন বিচার, কাণ্ডজ্ঞান অপরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুক্তির লক্ষণ আর কোথায় যোগ্যভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া, ইসলামের তৌহীদের সাধনা জগতে কল্যাণ ও মুক্তির সহায়তা করে এসেছে, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। তৌহীদের বিশ্বাসী দার্শনিক ইবনে রোশদের (Averroes) লেখা দ্বাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় চিত্তে শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় সন্দেহ জন্মেছিল, প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন থেকে বুদ্ধির এই মুক্তির স্থান ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসে অনেকখানি; মধ্যযুগের ঘোর তামসিকতার ভিতরে নানক, কবীর প্রভৃতি ভক্ত সত্যকার আধ্যাত্মিকতার দীপ ভারতে পুনঃ প্রজ্জলিত করেছিলেন, তাঁদের সামনেও শিখারূপে জ্বলেছিল ইসলামের তৌহীদ ও সাম্যবাদ; আর বাঙালি মুসলমানের জন্য সব চাইতে বড় সুসংবাদ এই যে, ভারতের নবজাগরণের যিনি আদি নেতা সেই মহাত্মা রাজা রামমোহনের উপরে ইসলাম আশ্চর্যভাবে প্রভাবশালী হয়েছিল। বাংলার চন্ডীমন্ডপের অবরুদ্ধতা ও নিরুদ্বেগের ভিতরে তিনি যে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন সকল কাণ্ডজ্ঞান, চিন্তা ও কর্মের বিশ্বধারা, সে সমস্তের যোগ্য প্রেরণা চিত্তবিকাশের মহামুহূর্তে তাঁর লাভ হয়েছিল হজরত মোহাম্মদের সাধনা থেকে, —তাঁর প্রচলিত তৌহীদ, সাম্য, নরনারী নির্বিশেষে সবারই জীবনের মর্যাদাবোধ, আধুনিক যুগের এই মহাপুরুষের কল্যাণ ও মুক্তির পথে অমূল্য পাথেয়রই কার্য করেছিল।

কিন্তু, "চেরাগকে নিচে আন্ধেরা!" সেই ইসলামের অনুবর্তী বলে আজ যারা নিজেদের পরিচয় দেয়, সমস্ত রকমের মুক্তির সঙ্গে তারা অপরিচিত। —কেন এমন হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের নূতন কোনো কথা বলবার নেই। সত্য ও সত্যসাধকের

www.nagorikpathagar.org

মহৈশ্বর্যময় প্রকাশের সামনে মুসলমান চকিত সম্মোহিত হয়েছে, জগতের সমস্ত সাধনাকে জীবন গঠনের উপাদানরূপে ব্যবহার করা যে মানুষের চিরন্তন অধিকার, সে কথা সে শোচনীয়রূপে বিস্মৃত হয়েছে— বার বার এই কথাটাই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে; একটা বড় সম্প্রদায় হিসাবে এই-ই মুসলমানের চরম দুর্ভাগ্য যে, তার যে সমস্ত পরমাত্মীয় পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য-প্রকৃতি নিয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও গভীর আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদের দীপ্তিতে অন্ধ হয়ে সম্মোহিত হয়ে আস্ফালন করেছেন তাঁদের প্রচণ্ডতা, তাকে আকৃষ্ট করেছে, বেশী, আর আজ পর্যন্ত সেই আকর্ষণই তার পক্ষে প্রবলতম!

তবে, শুধু নৈরাশ্যে একান্ত ম্রিয়মান না হলেও আধুনিক মুসলিম সাধকদের চলে। একটা বড় সত্যসাধনার পূর্ণ পরিস্ফুটনের জন্য তের শত বৎসর খুব দীর্ঘকাল নয়। বিপুল ভবিষ্যৎ তাঁদের সামনে। সেই ভবিষ্যতে ভীত সম্মোহিত মুসলমানের পরিবর্তে মুক্তদৃষ্টি ভূমার প্রেমিক মুসলমানকে জগৎ পাবে, তা করে' বিশ্বমানবের আত্মপ্রকাশের চিরসংগ্রামে এক দৃঢ় মেরুদণ্ড-সমন্বিত অকুতোভয় সৈনিক জগতের লাভ হবে, ইসলামও এক অপূর্ব সার্থকতার শ্রীতে মণ্ডিত হবে— এই আশায় ও বিশ্বাসে তাঁরা তাঁদের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত ব্যর্থতা ও লজ্জা বহন করতে পারেন।

জৈষ্ঠ, ১৩৩৩

শতবর্ষ পরে রামমোহন

রামমোহনের তিরোধানের পরে ১১৬ বৎসর গত হলো। এই কালে তাঁর জন্মভূমি বাংলায় বহু শক্তিমানের জন্ম হয়েছে; ধর্ম সাহিত্য স্বদেশসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁদের কয়েকজন শুধু বাংলায় বা ভারতে নয়, জগতে বরেণ্য হয়েছেন। যে কোনো দেশ বা জাতির জন্য এমন একটা যুগ গৌরবের যুগ।

এই মহাগৌরবময় যুগের প্রবর্তয়িতা রামমোহন। সে-সম্মান তাঁকে সবাই অকুণ্ঠিতচিত্তে নিবেদন করে থাকেন। আজকার এই স্মরণ-বাসরে, যদি শুধু এই ব্যাপারটাই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি তবে তাতেও তাঁর মহিমা-কীর্তন কম হবে না। কাল তো চির পরিবর্তনশীল। বহুকাল পূর্বে গ্রীক দার্শনিক বলেছিলেন, আমরা একই নদীতে দুইবার স্নান করি না। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এ স্বীকৃত সত্য। তাই রামমোহন যদি বাংলার ও ভারতের এই গৌরবযুগের প্রবর্তয়িতা মাত্র হন, অন্য কথায়, তাঁর দেশ যদি কর্মে ও চিন্তায় কালে কালে এতখানি ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে থাকে যে তাঁর সেই শতবর্ষ পূর্বের নির্দেশ তার জন্য আর সার্থক নির্দেশ বলে' গণ্য করা সম্ভবপর না হয়, তবে তাও তাঁর জন্য শোচনীয় নয়, বরং শ্লাঘনীয় পুত্র ও শিষ্যের কাছে পরাজিত হওয়া তো মানুষের সৌভাগ্যের কথা।

www.nagorikpathagar.org

কিছুদিন থেকে আমাদের কোনো কোনো খ্যাতনামা লেখক রামমোহনের সাধনার এই ধরনের মূল নিরূপণে ব্যাপৃত আছেন। তাঁদের চেষ্টার ফলে যদি জাতির সাধনা ও সম্ভাবনার ছবি স্পষ্টতর হয়, নব নব সার্থকতার পথে তার প্রেরণা লাভ হয়, তবে তাঁরা জাতির ধন্যবাদার্হ হবেন নিঃসন্দেহ। তাঁদের প্রধান বক্তব্য দাঁড়িয়েছে এই রামমোহন শক্তিমান নিঃসন্দেহ; খ্যাতিমানও যথেষ্ট; কিন্তু জাতির হৃদয়-সিংহাসনে তাঁর আসন লাভ ঘটেনি। সেই আসন বাংলাদেশে বিশেষভাবে লাভ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের, আর বিশাল ভারতে মহাত্মা গান্ধীর। জাতির মন-প্রাণ-আত্মার সত্যকার নেতৃত্ব এঁদেরই লাভ হয়েছে, যদিও দেশের একালের জাগরণ সূচিত হয়েছিল রামমোহনের দ্বারা।

এঁদের বিচার উপেক্ষণীয় নয়। যে সমস্ত নেতার জনপ্রিয়তার কথা এঁরা বলেন তাঁরা যে দেশের আপামর সাধারণের সমাদর রামমোহনের চাইতে অনেক বেশী লাভ করেছেন তা অনস্বীকার্য। তাছাড়া এঁরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের, অসাধারণ শক্তিমানও বটে। এঁদের মধ্যে তিন জন তো বিশ্ববরেণ্য। কাজেই এঁদের মতো পূজনীয় ব্যক্তি যদি জাতির সত্যকার সমাদর লাভ করে' থাকেন তবে রামমোহনের বিদেহ আত্মার প্রসন্নতার কারণই তো সেটি হয়েছে, কেননা তা হলে জাতি উন্নতির পথে নিশ্চিতরূপেই অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু এইখানেই যে সমস্যা। বৃক্ষঃ ফলেন পরিচীয়তে— সেই ফলের পরিচয় এই নূতন মূল্য-নিরূপয়িতাদের অনুকূলে নয়। কিছুদিন পূর্বে দেশে মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল; সেদিনে দেশের অনেক-শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে-কালোবাজারী মুনাফায় দেহ মন উৎসর্গ করেছিল; এই সব মহাপুরুষের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা সেই দুর্গতি থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে নি। তারপর এসেছে দেশের স্বাধীনতা। সে-স্বাধীনতা আজো যে দেশের সর্বসাধারণের জন্য সার্থক হয়ে উঠলো না তার মূলে অবশ্য এমন কতকগুলো কারণও আছে যার উপরে দেশের লোকের হাত নেই। কিন্তু এমন অনেকগুলো কারণও আছে যার প্রতিকার দেশের লোকের করায়ত্ত। সেই কল্যাণ-চেষ্টা, জনগণের প্রতি দায়িত্ব, সর্বসাধারণের কথা থাকুক দেশের শিক্ষিতদের মনেও কি সক্রিয় হয়েছে! —যে শিক্ষিত-সমাজ ইংরেজের সঙ্গে লড়াই কম করেনি, আর বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি যাদের অনুরাগের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করবার কোনো হেতু নেই! কেন এমন হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বুঝতে দেরী হয় না, এই সব বরেণ্যের এমন জনপ্রিয়তা লাভের মূলে তাঁদের ধর্মবোধ মনীষা বা মহাপ্রাণতা নয়, এর মূলে বরং তাঁদের কোনো কোনো কথায় ও আচরণে দেশের শিক্ষিত-সমাজের এবং কখনো কখনো অশিক্ষিত-সমাজের আত্ম-অভিমান যে লালিত হবার সুযোগ পেয়েছে সেই ব্যাপারটি। এ ব্যাখ্যা ভিন্ন পরীক্ষার দিনে তাঁদের অনুরাগীদের এমন শোচনীয় পরিচয়ের আর কোনো হেতু খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। বায়ুমণ্ডলের কার্যক্ষমতার উপরে নির্ভর করে তার চারপাশের শিক্ষিত-সমাজের গুণগ্রাহিতার উপরে। আমাদের দেশের শিক্ষিত-সমাজ আমাদের একালের বরেণ্য নেতাদের তপস্যা কি ভাবে ব্যর্থ করেছে সে-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা কিঞ্চিত বিস্তৃত করে' বললে হয়ত অসঙ্গত হবে না।

www.nagorikpathagar.org

রামমোহনের কথা ধরা যাক। কি নির্দেশ তিনি রেখে গেলেন দেশের লোকদের সামনে? সৌভাগ্যক্রমে তাঁর রচনা দুষ্প্রাপ্য নয়; তাই কোনো ব্যাখ্যা তার উপরে নির্ভর না করে' যে কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর মতামতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাঁর নির্দেশ এই : (ক) পৌরাণিক দেবদেবীর আরাধনার পরিবর্তে উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ও যুক্তিযুক্ত কল্যাণ-ক্রমের অনুষ্ঠান; (খ) প্রাচীন শাস্ত্র অশ্রদ্ধেয় নয় কিন্তু তার ব্যাখ্যা করতে হবে বিচারবুদ্ধি ও লোকশ্রেয়ের আলোকে— অনিষ্টকর আচার প্রাচীন হলেও বর্জনীয়। কিন্তু তাঁর নির্দেশের প্রতিক্রিয়া দেশের শিক্ষিতদের উপরে কি হলো? তাদের মধ্যে যারা তাঁর বিরোধী হলো—তারাই সংখ্যায় অনেক বেশী— তারা সোজা বললে: চিরাচরিত আচার বিসর্জন সম্ভবপর নয়, বিসর্জন দিলে সমাজশৃঙ্খলায় ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা। আর যারা তাঁর অনুরাগী হলো তাদের উপরে প্রতিক্রিয়া এই হলো যে তারা প্রতীক-চর্চার প্রতি বিমুখ হলো সোৎসাহে, কিন্তু উন্মুখ হলো লোকশ্রেয়ের দিকে তত নয় যত ভগবদ্ ভক্তির আতিশয্যের দিকে। রামমোহনের ঈশ্বরানুরাগের অথবা ব্রহ্মানুরাগের সঙ্গে লোকশ্রেয় নিত্যযুক্ত, সেই চিরন্তন উদার পথ তাঁর অনুরাগীদের জগতে এই ভাবে বেঁকে গেল।

রামমোহনের পরে মহাসাধক রামকৃষ্ণ। রামমোহন পৌরাণিক ধর্ম পরিত্যাগ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন; রামকৃষ্ণ নিজের অপূর্ব সাধনায় নিঃসন্দেহ হলেন পৌরাণিক ধর্ম পরিত্যাগের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। কিন্তু রামকৃষ্ণের সাধনা কি সত্যই প্রচলিত পৌরাণিক ধর্মের সাধনা? যে দেবতার আরাধনা তিনি করলেন তাঁর কাছে কি বর তিনি চাইলেন? ভক্ত তার দেবতার কাছে সাধারণত যে সব বর চায় সেই ধন জন মান স্বর্গ এমন কি মুক্তিও তিনি চাইলেন না, তিনি চাইলেন অচলা ভক্তি। দেশের লোক চমৎকৃত হলো তাঁর এমন তপস্যা দেখে। কিন্তু চমৎকৃত হয়ে এই মহাতাপসের কাছ থেকে কোন দীক্ষা তারা গ্রহণ করলে? তাঁরই মতো আচলা ভক্তির দীক্ষা কি? না, তা নয়। তারা চলচ্চিত্ত হয়েছিল সংস্কারকদের সমালোচনায় এঁকে দেখে নতুন করে' তারা প্রতিষ্ঠিত হলো সনাতন ধারায়, নিঃসন্দেহ হলো সংস্কারকদের চেষ্টায় অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। আর বিবেকানন্দের অপূর্ব আবিষ্কার 'দরিদ্র-নারায়ণ' তাঁর অগণিত দেশবাসীর জন্য এটি হলো একটি সুন্দর কথা মাত্র; সে প্রমাণ তারা নিঃশেষে দিলে গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে। তাঁর যে সব কথা সত্যই তাদের মর্ম স্পর্শ করল তার একটি এই ভারতকে ইয়োরোপের আচার্য হতে হবে। এদের পরে বাংলার শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর অনুরাগীরা দেখলে হিন্দুত্বের নবসংস্থানরূপে তাঁর হিন্দুত্বের অন্তরে যে ছিল সুনিবিড় মানবিকতা, সুগভীর ধর্মবোধ, সে-সব তদের চোখে কমই পড়লো। আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখিতাকে তাঁর অনুরাগীরা বুঝলে ইয়োরোপমুখিতা বলে'— তার বিশ্বমুখিতার অর্থ সে সত্যমুখিতা, প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড় মৈত্রী-বন্ধন, মানুষের জন্য সুগভীর কল্যাণ-কামনা, সে-সব অর্থ পূর্ণ হলো না তাদের চিন্তায়। পরিশেষে মহাত্মা গান্ধীর জনশ্রদ্ধালাভের কথা ভাবা যাক। তাঁর সাধনার প্রধানত দুটি স্তর। প্রথম স্তরে তিনি সব ধর্মকেই জানতেন স্বয়ং-সম্পূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

বলে। দ্বিতীয় স্তরে তিনি ভগবান বলতে বুঝলেন সত্য : প্রত্যেক কর্মকেই জানলেন কিছু কিছু ত্রুটিপূর্ণ আর সেজন্য প্রত্যেক ধর্মের মহত্তর বিকাশ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করলেন, ধর্ম বলতে তিনি বুঝলেন নিরবচ্ছিন্ন ও নিষ্কলুষ সত্য-প্রীতি ও জগৎ-হিত সাধনা, —কোনো সাম্প্রদায়িক বা আচারপরায়ণ জীবন নয়। কিন্তু অগণিত জনচিত্তে তিনি লাভ করলেন কী রূপ? তাঁর অপূর্ব সত্য-প্রীতি, মানবপ্রীতি, জীবপ্রীতি তাঁর অনুরাগীদের অনুধাবনের বিষয় হলো না। তাদের জন্য সত্য হলো তাঁর মূর্তির ও স্মৃতির সাড়ম্বর পূজা-প্রদক্ষিণ, —তাঁর জগৎজোড়া খ্যাতির অংশীদার এইভাবেই তারা হলো।

কিন্তু কেন এমন হলো? বলা কঠিন। দেখা যাচ্ছে কয়েক শত বৎসর পূর্বে কবীর দুঃখ করে' বলছেন দেশের হিন্দু ও মুসলমানের সৎমতি হোক এজন্য বহু চেষ্টাই তিনি করলেন, কিন্তু

হিন্দু পূজে দেবতা
তুর্ক কাহু না হোঈ

হিন্দু কেবল দেবতারই পূজো করে, আর মুসলমানের কারো জন্য মায়া মমতা নেই। অথবা সমস্যাটা এর চেয়ে গুরুতর। বর্তমানকালে বৃহত্তর জগতে দেখা যাচ্ছে মানুষের এত কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সাধনার পরে মানুষের ভিতরকার আদিম বর্বরই প্রবল হয়ে উঠেছে—ভোগ ও প্রধান্য-স্পৃহা, চক্রান্ত, জিঘাংসা আজ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে মানুষের কাম্য হয়ে উঠেছে।

তা বৃহত্তর জগতের কথা থাকুক। যারা কাজ করতে চায় তাদের সংহত হতে হয় বিভিন্ন কেন্দ্রে। যারা বিশ্বাস করে দেহই মানুষের বড় ব্যাপার, তার প্রয়োজন মিটিয়ে যদি সময় পাওয়া যায় তবে 'আত্মা' 'সত্য' এ সব কথা ভেবে দেখা যেত পারে, তাদের পথ তারা অনুসরণ করে' চলেছে। কিন্তু আমরা যারা বিশ্বাস করি আত্মা, অর্থাৎ মনোজীবন, যদি সক্রিয় না হয়, সত্য যদি সম্পুজিত না হয়, তবে কোনো প্রাচুর্যেই মানুষের কল্যাণ নেই, তাদের কি কর্তব্য? তারা কোন কেন্দ্রে সংহত হবে?

অতন্দ্রিত জ্ঞান ও লোকশ্রেয়ের পথের মহাপথিক রামমোহনের স্মরণ-দিনে আমরা, তাঁর অনুরাগীরা, যদি এই প্রশ্নটি যথাযথভাবে নিজেদের অন্তরাত্মার সামনে উপস্থাপিত করতে পারি তবে তাতে করেই সেই অমরবীর্য সাধকের প্রতি আমাদের সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে; আমরা নিজেরাও সার্থকতার পথে সুনিশ্চিত পা বাড়াবো। কেননা বড় কথা দলে ভারী হওয়া নয়, বড় কথা অন্তরাত্মাকে সক্রিয় করে' তোলা সত্যদৃষ্টি ও দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর মতো মহাজন দেশে বিপুলভাবে আদৃত হয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন এই বড় কারণে যে তাঁদের তপস্যা সক্রিয় হতে পারে নি তাঁদের অনুরাগীদের অন্তরাত্মায়, তাঁরা বরং ব্যবহৃত হয়েছেন তাদের অভিমান, মুখ্যত স্বধর্মের অভিমান, চরিতার্থতার কাজে। কিন্তু অভিমান তাদের জীবনে অনর্থ না ঘটিয়ে কি আর করবে? অভিমান কেন, স্বদেশ-প্রীতির মতো মূল্যবান ভাবও মানুষকে সত্যকার কল্যাণ-পথে বেশী দূর এগিয়ে নিতে পারে না যদি সেই স্বদেশ-প্রীতি গূঢ়ভাবে যুক্ত না থাকে

www.nagorikpathagar.org

সত্য-প্রীতি ও সর্বমানব-প্রীতির সঙ্গে। রামমোহনের নিরাকার পরমব্রহ্ম ও লোকশ্রেয়ের সাধনা স্বরূপত অতন্দ্রিত সত্য- ও কল্যাণ-সাধনা, কোনো মোহকেই তা প্রশ্রয় দেয় না— না সাম্প্রদায়িক মোহকে, না অতীতের মোহকে, না অতি-প্রাকৃত মোহকে, জড়বাদ ও ভোগবাদের অন্ধতাকে ত নয়ই— তাই বহুপুরাতন ও বহুজটিল ভারতীয় জীবনের সার্থক নেতৃত্বের অধিকার তাঁরই তা যত বিলম্বে ও যত বিড়ম্বনার ভিতর দিয়েই দেশ সেকথা বুঝুক। কিন্তু আমাদের একালের অপূর্ব নব-জাগরণ আজ যখন ব্যর্থ হতে দাঁড়িয়েছে তখন আমাদের বিড়ম্বনা ভোগ যথেষ্ট হয়েছে ভাবা যেতে পারে; আশা করা যায় এবার দেশ তার পরমনির্ভরযোগ্য জ্ঞান-সাধক ও কল্যাণ-সাধকের মর্যাদা যথাযোগ্যভাবে বুঝবে; তার ফলে একালের অন্যান্য সব সাধকই যোগ্য সার্থকতা লাভ করবেন, যোগ্য মর্যাদায় ভূষিত হবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কথিত, ১৯৪৯

ভারতবর্ষের সাধনা

রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে 'ভারতবর্ষ' বইখানির প্রবন্ধগুলো নূতন করে পড়া গেল। মনে পড়ে এক সভায় রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, —গুরুর আসন তাঁর জন্যে নয়; তিনি বরং একটি বীণা—নানা তার তাতে, বিচিত্র সুর সেই সব তার থেকে উঠেছে।—কথাটা মিথ্যা নয় আর শুধু কবি রবীন্দ্রনাথ নন, হয়ত মানুষ মাত্রই তাই। স্পষ্টভাবে যা সে বলে বা চায় তার চাইতে অনেক ব্যাপক ও অস্পষ্ট তার কামনা। কিন্তু গুরুগিরির দায় থেকে নিষ্কৃতিও বোধ হয় মানুষের নেই। তার মস্তিষ্ক তার জন্য এই বিপদ ডেকে এনেছে। 'ভারতবর্ষ' বইখানিতে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাচ্ছে গুরুর বেশে।

কি তিনি বলছেন? যা বলেছেন মোটের উপর তা উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা হিন্দু-নেতার বাণী। প্রবলপ্রতাপ ইয়োরোপের সম্মুখীন হয়ে দেশকে তাঁরা এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ভারত তার অতীত আদর্শ বিসর্জন দিতে পারে না—বিসর্জন দিয়ে সে হবে স্রোতের তৃণ। সেই অতীত আদর্শ বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন প্রাচীন ঋষির আদর্শ—অলোভ ও অমত্ততার আদর্শ—যা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই পরিচিত শোকে ঃ

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হবেন,
সমস্ত কর্মফল তিনি ব্রহ্মসমর্পণ করবেন।

www.nagorikpathagar.org

এই শোক রবীন্দ্রনাথের রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। আর তাঁর কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টি, আবেগ ও ভাষা-সামর্থ্যের গুণে এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব মনোরম হয়ে উঠেছে।

যে ইয়োরোপের সম্মুখীন ভারতকে হতে হয়েছে তার শক্তি ও সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সামগ্রী। কিন্তু তুল্যরূপে তাঁর অশ্রদ্ধার সামগ্রী সেই ইয়োরোপের দম্ভ ও লোভ। সেই দম্ভ ও লোভের মধ্যে ইয়োরোপের ভাবী অসার্থকতার বীজ লুক্কায়িত রয়েছে এ আশঙ্কা তাঁর মনে জেগেছে। তাই তিনি তাঁর দেশকে তার প্রাচীন আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হতে যে আহ্বান করেছেন এক গভীর আকুলতা তাঁর সেই কণ্ঠস্বরে। সেই আকুলতা গভীরতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যে।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ, একালের পরিচিত কথায় যাকে বলা যায় plain living and high thinking-এর আদর্শ (ব্রহ্মনিষ্ঠতা= আদর্শ-নিষ্ঠতা), তা এতটুকু অশ্রদ্ধার বস্তু নয়। বলা যেতে পারে, সর্বকালের মানব-শ্রেষ্ঠদের এর উপরে আস্থা অপরিসীম। কিন্তু কথা হচ্ছে দেশের সামনে নূতন করে এই আদর্শে প্রচারের সমীচীনতা নিয়ে। আমাদের বক্তব্য এই ঃ

এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শকে দাঁড় করানো হয়েছে ইয়োরোপের রাষ্ট্রিক শক্তিলাভের আদর্শের বিরুদ্ধে। কবি বলেছেন— "আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্র-নীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি য়ুরোপীয় ছাঁচে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য তবে আমরা ভুল করিব।"—কিন্তু সামাজিক শক্তির ও রাষ্ট্রীয় শক্তির এমন বিরোধিতা কি কল্পনা করা যায়?

বহুকাল পূর্বে গ্রীক্‌রা বুঝেছিলেন, মানুষের চরম কৃতিত্ব রাষ্ট্র গঠনে। যীশুর মতবাদ যেভাবে বোঝা হয়েছিল সেই ইহ-বিমুখতার আদর্শ এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল দীর্ঘকাল। তারপর আবার রাষ্ট্র-গঠনের গৌরব সম্বন্ধে ইয়োরোপ সচেতন হয়েছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ ঠিক ইহ-বিমুখতার আদর্শ নয়, অন্তত যে বৈদিক ঋষিরা অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়েছিলেন, তাঁদের ইহ-বিমুখ বলা যায় না। তবে বৌদ্ধ-প্রভাবে ও ভারতের মধ্যযুগের রাজনৈতিক পরাধীনতার দিনে এই ব্রহ্মবাদ প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহ-বিমুখতারই সমর্থন করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর নব-ভারতীয় ব্রহ্মবাদের অন্তরেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে ভারতবাসীর পর-বশতার লজ্জা। অবশ্য এই লজ্জাই এর গৌরব-স্থল। কিন্তু জীবনের সহজ ধারা যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ ঠিক ইহ-বিমুখতার আদর্শ নয়, অন্তত যে বৈদিক ঋষিরা এই নব ব্রহ্মনিষ্ঠার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিপর্যস্ত হয়েছে তা না বুঝলে চলবে না।

বাস্তবিক সমাজ ও রাষ্ট্রের পরস্পর-বিরোধিতা কল্পনা করাই যায় না। রাষ্ট্র সমাজের প্রাণ। এর বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এশিয়ার নব-জাগরণ-চেষ্টায়। সে-চেষ্টা সার্থকতার পথে দাঁড়িয়েছে সেইসব দেশে যেখানে রাষ্ট্রিক শক্তি-লাভ ঘটেছে। অপর পক্ষে ভারতের শতবর্ষব্যাপী অকৃত্রিম নব জাগরণ-চেষ্টা নব নব ব্যর্থতা লাভ করে চলেছে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রবলতার অভাবে।

www.nagorikpathagar.org

প্রাচীন ব্রহ্মবাদ বা যে কোনো "বাদ" মূলত কবিত্ব। কবিত্ব জীবনের পরম সম্পদ, জীবন কবিত্ব দ্বারা মণ্ডিত, তবু কবিত্ব ও জীবন ঠিক এক কথা নয়। জীবনের মূল কথা অন্ন-সমস্যাও আত্মরক্ষণ-সমস্যা, বিশেষ করে সমষ্টিগত জীবনে, কেননা জীবন মূলত সমষ্টিগত ব্যাপার। কিন্তু আমাদের এই নব ব্রহ্মবাদে আমাদের সমষ্টিগত জীবনের অন্ন-সমস্যা আর আত্মরক্ষণ-সমস্যার কথা প্রায় ঠাঁই পায় নি। যদি কেউ বলেন, আমাদের সমষ্টিগত জীবনের অন্ন সমস্যা আর আত্মরক্ষণ-সমস্যার ভার আমাদের হাতে নেই, তবে তিনি অন্যায় কথা বলবেন। এমন কথা বলা আর মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়া এক কথা। কিন্তু মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়া জীবনের ধর্ম নয়, জীবনের ধর্ম ক্রমাগত আত্মবিকাশের চেষ্টা—সহস্র প্রতিকূলতা অতিক্রম বা আত্মস্থ করা।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ অথবা Plain living and high thinking-এর আদর্শ মানব-শ্রেষ্ঠদের প্রিয় হয়েছে বহুর কল্যাণ-কামনা এতে কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ পেয়েছে বলে। প্রচলিত ধর্ম ও ধার্মিকতা একালে পতিত হয়েছে এই বহুর কল্যাণ-কামনার সঙ্গে যোগের অভাবের জন্যে। কিন্তু এই 'বহুর কল্যাণ-কামনা' শেষ পর্যন্ত ভাববিলাসের ব্যাপার হতে বাধ্য যদি রাষ্ট্রিক সার্থকতা-লাভ এর না ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর Laissez faire ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য একালের সমষ্টি-কল্যাণ-তত্ত্বে আত্মবিসর্জন করেছে, করে ধন্য হয়েছে। অবশ্য সমষ্টি-কল্যাণ-তত্ত্ব আজ ও আশানুরূপ সুন্দর হয়ে দেখা দেয় নি, Laissez faire (Let Alone-যে যার পথে চলুক) ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও অসুন্দর ছিল যথেষ্ট পরিমাণে, তবে এই নব সমষ্টি-কল্যাণ-তত্ত্বের কার্যকারিতা যে অনেক বেশী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। রাষ্ট্রিক ক্ষমতার অতিচার দেখে কবি শঙ্কিত হয়েছেন। শক্তির এক দুর্দমনীয় প্রবণতা অতিচারের দিকে। সে-প্রবণতাকে সংযত করবার জন্যে প্রেমের প্রয়োজন কম নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ-পক্ষেও প্রতিরোধক্ষমতার প্রয়োজনও কম নয়। ইয়োরোপের দম্ভ ও লোভ যথেষ্ট পরিমাণে লালিত হয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকার অজ্ঞানতা ও নিবীর্যতার দ্বারা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা ভারতবর্ষের সাধনার বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে ভেবেছিলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে এই সম্মানের অধিকারী যে তাঁদেরও দিশাহারা দেশবাসীর অন্তরে আত্মসম্মানবোধ তাঁর সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁদের নির্দেশ বাস্তবিকই ভ্রান্ত নির্দেশ। ভারতবর্ষের লোক জগতের অন্যান্য সভ্যদেশের লোকের তুলনায় কোনো রকমেই অসাধারণ নয়—জ্ঞানেও নয় অজ্ঞানেও নয়—আর তাদেরও মুক্তি কোনো অসাধারণ পন্থায় ঘটবার নয়। জীবনের অর্থ সঙ্ঘবদ্ধতা, একথা সব ভাগ্যবান দেশের লোকে জেনেছে, ভারতবাসীদেরও জানতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের একটি মারাত্মক ত্রুটি এই যে ভারতবাসীর জীবনে এই সঙ্ঘশক্তি-অর্জন যে কত বিঘ্নসঙ্কুল সে-সম্বন্ধে তাঁরা অনেকেই যথেষ্ট পরিমাণে অচেতন। হিন্দু সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতা, আর্য সংস্কৃতি, সেমীয় সংস্কৃতি, এসবের পূর্ণ সংরক্ষণ ইত্যাদি কথা যথেষ্ট আবেগের সঙ্গে তাঁদের কেউ কেউ বলতে পেরেছিলেন এই অজ্ঞতার প্রভাবে।

www.nagorikpathagar.org

রবীন্দ্রনাথের যে-মতের আলোচনা করতে চেষ্টা করলাম, বলা বাহুল্য, সেইটিই তাঁর একমাত্র মত নয়। ভারতবর্ষের মানুষ যে দোষে-গুণে জগতের অন্যান্য দেশের মানুষের আত্মীয়, এ শিক্ষা তাঁর কাছ থেকেই আমরা বেশী করে পেয়েছি। তবে ভারতবর্ষের সাধনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর এক-সময়ের চিন্তা ভারতবাসীর অন্তঃসারহীন দম্ভের লালনে সহায়তা করতে পারে, এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয়। যাঁরা দেশের স্বাভাবিক নেতা তাঁদের আনুগত্য যেমন দেশের লোকদের জন্য প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় তাঁদের নির্দেশ সম্বন্ধে দেশের লোকদের যথাযথ ধারণা।

১৩৩৪

বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা

বাংলার লোকদের দোষ-ত্রুটি নিশ্চয়ই খুব কম নয়। তবু মনে হয়, এদেশের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, কেননা অপেক্ষাকৃত অল্প কালের ব্যবধানে মানুষের চিত্তের অপূর্বতার নব নব প্রকাশ এদেশে ঘটেছে। কিন্তু বাংলার ঐতিহাসিককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বাংলার গৌরবসামগ্রী এই যে সমস্ত আন্দোলন, যেমন বৈষ্ণব আন্দোলন, ব্রাহ্ম আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি এ সমস্তের মুসলমান নামধেয় বাংলার এক বিশাল মানবসমাজের কি দান, তাহলে মোটের উপর তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ভিন্ন তাঁর হয়ত আর গত্যন্তর থাকে না।

বাংলার মুসলমানের আত্মপ্রকাশের এই দীনতা লক্ষ্য করেই আমাদের কোনো কোনো সমালোচক বলতে চান—বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা আর্থিক সমস্যা শিক্ষা-সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বিচার করে দেখবার অবসর কোথায়? সেই গোটা সমাজটাই যে এক সমস্যা!

এই শ্রেণীর সমালোচকদের কথার গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করবেন সন্দেহ নেই। বাংলার মুসলমান সমাজের বয়স কম নয়, অন্যূন সাত আট শত বৎসর হবে; এই দীর্ঘ কালেও সে-সমাজ যদি এমন কোনো শক্তিমানের সূতিকাগার না হ'য়ে থাকে যাঁর কর্ম-প্রেরণায় সেই সমাজের লোকের অন্তরে নব নব আশা ও উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে ও অন্যান্য সমাজের লোকদের চিত্তে শ্রদ্ধা ও আনন্দ জেগেছে, তাহলে তার অবস্থা শুধু শোচনীয় নয় অত্যন্ত চিন্তনীয়। তারই ইঙ্গিত ক'রে যদি কেউ বলেন, বাংলার মুসলমান-সমাজ হীন উপকরণে গঠিত, তবে তাতে শুধু অসহিষ্ণু হয়ে আর কি লাভ হবে।

কিন্তু বাস্তবিক কি বাংলার ইতিহাসে মুসলমানের কিছুমাত্র দান নেই? সেকালের মুসলমান নবাব-বাদশাদের দানের কথা ধরতে চাইনা; বাংলার সাধারণ মুসলমান, যাঁরা পুরুষানুক্রমে এই বাংলার মাটির উপরে জন্মেছেন ও শেষে এই মাটিতেই দেহরক্ষা

www.nagorikpathagar.org

করেছেন, তাঁরা কি সর্বপ্রকারে এতই দরিদ্র ছিলেন যে শুধু প্রাণ-ধারণের অতিরিক্ত কোনো-কিছু কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করবার সৌভাগ্য তাঁদের হয় নি যাতে করে শনৈঃ-শনৈঃ-গ্রথিত দেশের ভাব-ও কর্ম সৌধে তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত থাকতে পারে? এই প্রশ্নটি একসময়ে আমাকে কিছু বিব্রত করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই কথাটি বুঝে আনন্দিত হয়েছিলাম যে, বাংলার মাটির উপর মুসলমান-তরু শুধু নিষ্ফল হ'য়ে দাঁড়িয়ে নেই। অতীতের কুক্ষি ঘে'টে দেখবার তেমন সুযোগ আমার হয় নি, তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে দেখতে পাই, বাংলার স্মরণীয় নীল-বিদ্রোহে প্রধানত মুসলমান চাষীই লড়েছিল, অন্যায়ের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রাণপণ বলে সে-ই বলেছিল—'মানব না'। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল দর্পণে' এক "তোরাপ"কে অমর করেছেন। কিন্তু মুসলমান চাষীসম্প্রদায়ে "তোরাপ" একশ্চন্দ্র নয়, বহু নক্ষত্রের অন্যতম। আর বহুদেববিহীন অস্পৃশ্যতা-নির্মুক্ত মুসলমান সমাজের কোলেই এই "তোরাপ"-এর দল শোভে ভাল।

এই নীলবিদ্রোহের মুসলমান চাষীর কথার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শিক্ষা বিস্তারে মোহসীনের দানের কথা,[১] ঢাকা নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ঢাকার নবাবদের দানের কথা মনে হ'য়েছিল, আর তারই সঙ্গে মনে হ'য়েছিল, এঁরা তো মুসলমান সমাজে নিঃসঙ্গ নন। কি কারণে নিশ্চয় করে বলা শক্ত, ধনবান মুসলমানেরা ধনকে কোনোদিন বহুমূল্য মনে করতে পারেন নি, তাই দানের ধারা অনায়াসে তাঁদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে বাধা পায় নি, আর তাতে করে মানুষের অঙ্গনে নিত্যই নব নব আনন্দ-কুসুম ফুটেছে। একালের চাঁদমিয়াঁ, ফাজেল মোহম্মদ, মোহম্মদ হোসেন প্রভৃতিরও দানের কথা যখন ভাবতে যাই তখন বুঝতে পারি, অর্থব্যয়ে চিরঅকাতরচিত্ত মুসলমানের এঁরা অযোগ্য উত্তরাধিকারী নন।—এই যে মানুষের দল, মুখের ভাষা যাদের ভিতরে অকর্মণ্য, কিন্তু যাদের জীবনের ভিতরে উপলব্ধি করা যায় যেন আদিম কূর্মের নীরব বীর্য, অথবা আদিম প্রকৃতির প্রাচুর্য, এদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনবগত থাকা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু দেশের জীবনোৎসবে এদের সেবার স্পর্শ লাগে নি, অথবা ভবিষ্যতে এদের এই প্রাণ-অবদান জাতির আঙিনায় "রঙীন হ'য়ে গোলাপ হয়ে উঠবে" না, একথা অবিশ্বাস্য বলে ভাবতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়।

(২)

সাহিত্য জীবনবৃক্ষের ফুল, জাতি বা সমাজ-বিশেষের মগ্নচৈতন্যের রসের যোগানে তার বিকাশ ঘটে। সেই গূঢ় রস বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে সঞ্চিত আছে কি না তাদের সাহিত্য-সমস্যার আলোচনা সম্পর্কে তার সন্ধান নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনীয় নয়।—কিন্তু শক্ত প্রশ্ন এই হবে, সাহিত্য সেই রসের যোগ্য স্ফূর্তি আমরা কবে দেখব? এর উত্তরে যদি বলা যায়, তা কি করে বলব, তাহলে অনেকে শুধু বিরক্তই হবেন না, ক্ষুণ্নও হবেন। কিন্তু এ ভিন্ন এ প্রশ্নের আর কিইবা উত্তর আছে? সাহিত্যের বিকাশকে কতকটা তুলনা করা

---

১. তার দানে প্রথম ৩০ বৎসর হিন্দু মুসলমান সমভাবে উপকৃত হয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

যেতে পারে ফুল-ফোটার সঙ্গে। ফুলে গাছের মূলে আমরা পরম যত্নে জল ঢালতে পারি, দেশ বিদেশ থেকে তার জন্য ভাল সারও আনতে পারি, তবু ফুল ফুট্‌বে কি না অথবা ভাল ফুল ফুটবে কি না সে সম্বন্ধে যেমন হুকুম করতে পারি না, সাহিত্য সম্বন্ধেও তেমনি সমাজের ভিতরে স্কুল-কলেজ-লেবরেটরির স্থাপনা, বিচারবিতর্কের সৌকর্যসাধন, ইত্যাদির পরও পরম আগ্রহে কালের পানে চেয়ে থাকা ভিন্ন আর আমাদের কি করবার আছে? সাহিত্য-সমস্যা বাস্তবিকই কোনো সমাজের সত্যকার সমস্যা নয়। সাহিত্যের বিকাশ যখন কোনো সমাজের ভিতরে মন্দগতি অথবা হতশ্রী হয়ে আসে তখন বুঝতে হবে, হয়ত তার এক মৌসুম শেষ হয়ে গেছে তারপর কিছুদিন কতকটা নিষ্ফল ভাবেই কাটবে।—অথবা, তার জীবনায়োজনে বড় রকমের ত্রুটি উপস্থিত হয়েছে।—এই শেষের অবস্থা কোনো সমাজের পক্ষে মারাত্মক।

বাংলার মুসলমানসমাজে এপর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের উদগম হয় নি, শুধু এই ব্যাপারটিই তার অসম্মানের পক্ষে হয়ত মারাত্মক নয়। কিন্তু সে-সমাজে লোক যে এপর্যন্ত জাতীয় জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তেমন গৌরবের আসন লাভ করতে পারে নি, বরং তাদের মর্যাদা সম্বন্ধে জানতে হলে অনুসন্ধান করে জানতে হয়, এতেই তার অবস্থা সম্বন্ধে আশঙ্কা আপনা থেকে এসে পড়ে। আর, তার অবস্থা ভাল করে চেয়ে দেখ্‌তে গেলে চোখে পড়ে, সত্যই বাংলার মুসলমানের জীবনায়োজন মারাত্মক ত্রুটিতে পরিপূর্ণ, যাতে করে মনুষ্যত্বের পর্যাপ্ত বিকাশই যেখানে সম্ভবপর হচ্ছে না, —সাহিত্য-সৃষ্টির কথা আর সেখানে ভাবা যায় কি করে।

এই সম্পর্কে নানা গুরুতর কথার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। বলা যেতে পারে, সে-সমস্তের কেন্দ্রগত কথা এই ঃ— ইসলাম কি ভাবে মানুষের জন্য কল্যাণপ্রসূ হবে সেই কথাটাই হয়ত আগাগোড়া আমাদের নূতন করে ভাবতে হবে। —আমাদের পূর্ববর্তীরা ইসলামের যে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন তা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন; অন্তত তাকে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে যে ভাবে লাভ করেছি তার সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অপবাদ দেওয়া সম্ভবপর নয়। স্পষ্টভাবেই আমাদের সামনে গ্রহণীয়রূপে-বিধৃত ইসলাম নারীর অবরোধ সমর্থন করেছে, সুদের আদান-প্রদানের উপর অভিসম্পাত জানিয়েছে, ললিতকলার চর্চায় আপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরআন ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা। এই সমস্ত কথাই আমাদের নূতন করে ভেবে দেখতে হবে,—ভেবে দেখতে হবে, মুসলমানসমাজের মানুষের কর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতায় এইভাবে যে অনেকখানি নূতন রকমের প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করা হ'য়েছে এতে করে কী সত্যকার কল্যাণ লাভ হ'য়েছে।—এই সমস্ত ব্যবস্থার পিছনে যে সাধু উদ্দেশ্য আছে একথা বুঝ্‌তে পারা কষ্টসাধ্য নয়। সংযম ও পবিত্রতা, পরিশ্রম ও করুণপ্রাণতা, এবং সুন্দর ও মহনীয়ের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা—এ সমস্তের কথা যাঁরা মানুষকে বলতে চেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু আমাদের নূতন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন এই জন্য যে, সংযম ও পবিত্রতাকে নারী অবরোধের দ্বারা,

www.nagorikpathagar.org

পরিশ্রম ও করুণপ্রাণতাকে সুদের আদানপ্রদান নিষেধের দ্বারা ও সুন্দর ও মহনীয়ের প্রতি শ্রদ্ধাকে মানুষের বুদ্ধি শৃঙ্খলিত করার দ্বারা, সম্ভবপর করে তুলতে প্রয়াস পেলে অসম্ভব-কিছুর প্রতি হাত বাড়ানো হয় কি না, অন্যকথায়, তাতে করে মানবপ্রকৃতির উপর অত্যাচার করা হয় কি না, যার জন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

যতটুকু বুঝবার ক্ষমতা আমাদের হয়েছে তাতে মনে হয়, ইসলামের যে-রূপ দিতে প্রয়াস পাওয়া হ'য়েছে, অথবা মানুষকে ইসলামের সার সত্য গ্রহণের উপযোগী করবার জন্য যে-পথে চালিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে করে মানুষের উপর সত্যই অত্যাচার করা হয়েছে। যে ব্যবস্থায় বড় সত্যের পানে মানুষের চিত্তের আকর্ষণ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে ইসলামের সমাজব্যবস্থায় তার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি; সে-ব্যবস্থায় যতখানি বিজ্ঞান-দৃষ্টি আছে তার চাইতে অনেকখানি বেশী আছে ব্যস্ততা ও অসহিষ্ণুতা। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করব। ইসলামের শ্রেষ্ঠ সত্য তৌহীদ মানবচিত্তের চির মুক্তির বাণী। বার বার মানুষ তার কীর্তির শৃঙ্খলে আদর্শের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে; every idea is a prison every heaven is a prison"[২] আর সেই বন্ধনের সামনে বারবার দাঁড়িয়ে বলবার যোগ্য এই বাণী 'নাই, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ উপাস্য নাই'; আর সাম্য এই মুক্তি ও অগ্রগতির চিরসহচর। মানুষের এই অগ্রগতিতে সংযমের প্রয়োজন নিশ্চয়ই কিছুমাত্র কম নয়,—যেমন নদীর জন্য কূলের বাঁধের প্রয়োজন কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু কূলের বাঁধের পত্তন ক'রে তো নদীর সৃষ্টি হয় না, নদীর প্রবাহ আপন প্রয়োজনে যে সংযম তারও তেমনিভাবে ভিতর থেকে জন্ম হওয়া চাই, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংযমের সত্যকার মূল্য মানুষের জীবনে কত সামান্য! তাই মানুষের যে বন্ধু চান, ইসলামের এই বড় সত্যের পানে মানুষের চিত্ত উন্মুখ হোক, তাঁর কাজ কি এই হওয়া উচিত নয় যে মানুষের সর্বাঙ্গীন পরিপোষণ ও পরিবর্ধনের সহায়তা তিনি করবেন? কেননা সর্বাঙ্গীন পরিপোষণ ও পরিবর্ধন যার হয় নি এই দূরের পথের যাত্রী হবার সামর্থ্য তার কোথায়? তার পরিবর্তে বাইরে থেকে বিধি-নিষেধ ও অবরোধ চাপিয়ে চাপিয়ে যে সব মানুষকে সংগত করবার চেষ্টা করা হয়েছে তাদের চিত্তের স্বাভাবিক স্ফূর্তিরই তো কিছুমাত্র অবকাশ দেওয়া হয় নি। তারা যে বড়জোর অর্ধ-বিকশিত মানুষ! তারা কি করে হবে মুক্তিপথ-যাত্রী!

তারপর ললিতকলার চর্চাকে যে মুসলমানসমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে, কোন্ মস্তিষ্কবান ব্যক্তি একে সমর্থন করতে পারেন? নিশ্চয়ই নেতাদের এই হুকুমে মুসলমান তার এত দীর্ঘ জীবন সৌন্দর্য ও আনন্দ-বিহীন হয়েই কাটায় নি, কিন্তু আমাদের ভেবে দেখবার দিন এসেছে যে, সাধারণ মুসলমান সমাজের সম্মতিক্রমে আনন্দ ও সৌন্দর্য-চর্চা করতে পারে নি বলে তার সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তিতে কতখানি বাধা পড়েছে। এখানে হয়ত কথা উঠবে, ইসলামে অনেকখানি চঁৎরঃধহরংস আছে এবং তার জন্য

---

২. এক একটি ধারণা এক একটি কারাগার; প্রত্যেকটি স্বর্গ ও কারাগার।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের লজ্জিত হবার দরকার করে না। আমি নিজেও ইসলামের এই রসবাহুল্যবর্জিত ধাতের জন্য লজ্জিত নই। শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই যে চঁৎরঃধহরংস এক বৃহৎ মানবসমাজের শ্রেণী-বিশেষের বরণীয় হ'তে পারে, তাতে করে সেই সমাজের স্বাস্থ্যের ও সৌন্দর্যের কিছু আনুকূল্যই ঘটে (সম্বৎসরের ঋতুর সমাহারে গ্রীষ্মের যেমন এক অনুপম সার্থকতর), কিন্তু চঁৎরঃধহরংস কে এক বৃহৎ মানব-সমাজের সমস্তের বরণীয় করে তুল্‌তে প্রয়াস পেলে চঁৎরঃধহরংস তো ব্যর্থ হয়ই সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজেরও দুর্ভাগ্যের অবধি থাকে না।

এর একটি দৃষ্টান্ত প্রায় সমসাময়িক কালের বাংলাদেশে আমরা পাই। বাংলা সাহিত্যে বাংলার উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য কোনো দান নেই, অর্থাৎ এমন দান যার জন্য বাংলার চিত্তে শ্রদ্ধা জেগেছে, তা আপনারা জানেন। কিন্তু বাংলার লোকসঙ্গীতে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের দান সাদরে গৃহীত হয়েছে—যেমন পাগলাকানাইয়ের গান, লালন ফকিরের গান ইত্যাদি। এইসব গানের ভিতরে বুঝতে বুঝতে পারা যায়, ইস্‌লামের একেশ্বর-তত্ত্ব গান রচয়িতাদের মনে স্থান পেয়েছিল। আর তারই সঙ্গে তাদের চারপাশের বাউল সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা, ইত্যাদি মিশেছিল,—সব মিলে কেমন এক অসীমের সংবাদে তাদের চিত্ত তৃপ্ত ও মধুর হ'য়েছিল। মাতৃভাষার রচিত এই সব গান এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছে, আর চাষীদের অভাবগ্রস্ত জীবনে আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়েছে—তাদের অনন্তের ক্ষুধা অনেক পরিমাণে মিটিয়েছে। কিন্তু মানুষের অন্তরের বেদনার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন আমাদের আলেম-সম্প্রদায় শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে শিক্ষা ও সাধনাহীন সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করে পল্লীর মুসলমান চাষীর এই গানের ফোয়ারা বন্ধ করে দিয়েছিল। পরিপূর্ণ ইসলাম (কোরআনের ব্যবস্থার সমগ্রতা) মানুষের জন্য যে কল্যাণ ও শান্তি বহন করে এ'দের সাধ্য নেই সেই সম্পদ এই চাষীদের দ্বারদেশে এঁরা পৌছে দেন; শুধু মাঝখান থেকে হালাল হারাম সম্বন্ধে দুই একটা হুকুম শুনিয়ে, ও চঁৎরঃধহরংস এর গোঁয়ার্তুমিতে এদের জীবন নিরানন্দ করে দিয়ে, তাঁরা কর্তব্য শেষ করেছেন।—এই চাষীদের জীবনকে কিছু সুন্দর ও উন্নত করবার জন্য এই সব গানের কতখানি সামর্থ ছিল আমাদের পুনরায় সেকথা ভাবতে হবে না কি?

এই সম্পর্কে একটি ভাববার মতো কথা আমাদের সামনে এসে পড়েছে। সেটি এই যে, কি নিজের সমাজে কি অন্য সমাজে নিষ্ঠাবান মুসলমানের চেষ্টা হোক তাঁর উপলব্ধ ইসলামের স্বরূপ মানুষের সামনে ফুটিয়ে তোলা। সেই চেষ্টায় তাঁর কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ না পাক। কিন্তু ঠিক তেমনিভাবে অপরের ইসলাম বা ইসলামের অংশ-বিশেষের গ্রহণ-ব্যাপারেও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকুক। "ধর্মে বলপ্রয়োগ নিষেধ" কোরআনের এই মহতী বাণী মুসলমানের জন্য সত্য হোক।

এ কথাটি বলবার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। অন্য সমাজের লোকদের উপরে ধর্মের ব্যাপারে কিছুতেই আমরা জবরদস্তি করতে পারি না একথা আমাদের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই মনে স্থান দেন। কিন্তু মুসলমানসমাজের ভিতরকার লোকদের জন্যও যে

www.nagorikpathagar.org

এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য সে কথা ভাবতে আমাদের অনেকেই হয়ত রাজি নন। এ সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষিত মুসলমানসমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে এক সময়ে আমার কথা হয়েছিল। ধর্ম বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা মানতে হবে, আমার এই কথার উত্তরে তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে মুসলমান কাকে বলব? আমি বলেছিলাম—যাদের সাধারণত বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ যারা এ সমাজে জন্মেছে অথবা এতে আশ্রয় নিয়েছে। নইলে চোর ভন্ড স্বেচ্ছাচারী প্রভৃতি যারা প্রতিনিয়ত তাদের আচরণের দ্বারা কোরআন ও হজরত মোহম্মদের উপদেশ-আদেশ অস্বীকার করছে তারা মুসলমান বলে নিজেদের পরিচয় দিতে পারত না, সমাজও তাদের মুসলমান বলে স্বীকার করতে পারত না।—তাঁর সঙ্গে এই তর্ক হচ্ছিল আমাদের উভয়ের জনৈক বন্ধুর কোনো তথাকথিত অনৈসলামিক কথার আলোচনা সম্পর্কে। কিন্তু তিনি আমার মত মানতে কিছুতেই রাজি হতে পারছিলেন না। শেষে একটি কথা বলে তাঁকে ভাবিয়ে তুলতে চাইলাম—বললাম, দেখুন আজ উনি যা বলছেন হয়ত দুদিন পরে নিজেই ওখান থেকে ফিরে আসবেন; নিজের সঙ্গে যার ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে তার মনের বেদনা আমাদের সমাজ বুঝবে না?—কিন্তু তিনি অম্লানবদনে বল্লেন, তা তাঁর ধ্বস্তাধ্বস্তি যখন শেষ হয়ে যাবে তখন যেন তিনি মুসলমান সমাজে ফিরে আসেন।

মুসলমান সমাজের কর্মকর্তারা যে কি আশ্চর্যভাবে পাষাণ প্রতিমার সেবক পাণ্ডাদের মতো পাষাণচিত্ত হয়ে পড়েছেন, মানুষের মনের কত কামনা কত বেদনা কত ভাঙাগড়া এ সম্বন্ধে তাঁরা যে কত চেতনাহীন হ'য়ে পড়েছেন, সে-সব কথা আজ না ভাবলে আমাদের দুর্দশার পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে না। মানুষের জীবন সুন্দর হোক, কল্যাণময় হোক, সেখানে যেন আমি আমার সশ্রদ্ধ সেবা পৌঁছে দিতে পারি, এ ভাব যেন তাঁদের মনের ত্রিসীমায়ও ঘেঁষে না। তার পরিবর্তে মানুষের মাথায় কতকগুলো বিধি-নিষেধ ছুঁড়ে মেরেই আল্লাহ্‌র সৈনিক হওয়ার গৌরব তাঁরা উপলব্ধি করতে চান!

মুসলমানসমাজে যে সমস্ত নরনারী বাস করে তারা শুধু মুসলমান নয়, তারা মানুষ-দেশবিদেশের নানা ধর্মের নানা বর্ণের মানুষের আত্মীয়। সেই বিশ্ববৃহৎ মানবসমাজের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার চেষ্টা-বিফলতার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হচ্ছে এই বাণী যে,—মানুষ দুঃসাহসী, তার অনন্ত ক্ষুধা, জড় জগতের বন্ধনই সে মানতে রাজি নয়, চিন্তার জগতের তো কথাই নেই।—মানুষের এই বাণীর সার্থকতার কোনো আয়োজন কি মুসলমানসমাজে করতে হবে না? যা সুন্দর শুধু তাই দিয়ে দৃষ্টি আবৃত করে কি মুসলমান তার সৌন্দর্য বুঝতে পারবে? না, একথাও সে বুঝবে যে এর জন্য সত্যকার প্রয়োজন হচ্ছে সেই সুন্দর বস্তুকে কিছু দূরে স্থাপন করা, যাতে করে সমস্ত জগত তার চোখে প্রতিভাত হবে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সেই বস্তুর সৌন্দর্য সে উপলব্ধি করবে? —চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির মুক্তি, এতে শুধু মানুষের অধিকার থাকা উচিত নয়, এই হচ্ছে তার জীবন-পথে বিধাতার দেওয়া পাথেয়। যেমন করেই হোক এই পাথেয়ের ব্যবহার মানুষ করে, তবে অনেক সময়ে ভয়ে ভয়ে করে বলে তার অন্তর-প্রকৃতির যথোপযুক্ত পুষ্টিলাভ হয় না।

www.nagorikpathagar.org

কিছু ভিন্ন দৃষ্টিভূমি থেকে দেখে বলা যেতে পারে, সাহিত্য জ্ঞানের সুরভি, তাই জ্ঞানচর্চা সমাজে অব্যাহত থাক্‌লে সাহিত্যের জন্য আর কোনো ভাবনা থাকে না। কিন্তু সেই জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় মুক্ত বুদ্ধির, অথবা তারও চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় সমাজজীবনে বৈচিত্র্যের—মুক্ত বুদ্ধি যার সন্ততি। অবরোধ ও নিরক্ষরতার চাপে আমাদের সমাজের অর্ধেক শক্তি ব্যক্তিত্বহীন ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে; সেই অর্ধেকের সংস্পর্শে এসে অপরাধেরও চিত্ত-বিকাশের অবকাশ কোথায়? মানুষের চিত্ত যার আঘাতে জেগে উঠবে সেই বৈচিত্র্য এমনি করেই আমাদের সমাজে দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

সুন্দর ও সবল জীবনের জন্য যত কিছুর প্রয়োজন তার এত অভাব বাংলার মুসলমান কি করে পূরণ করবে, এ কথা ভাবতে গেলে সত্যই অবসন্ন হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আশার অবকাশও যে নেই তা নয়। বাংলার মুসলমানসমাজের অন্তরে সেই গূঢ় জীবনরস যদি সত্যই সঞ্চিত থাকে তবে তার সঙ্কটসময়ে তার কোলে তার বীরপুত্রদের জন্ম হবে, যারা তার সমস্ত অভাব সমস্ত বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের যোগ্য সূতিকাগাররূপে, তৌহীদের যোগ্য বাহনরূপে। ইসলামের যে তৌহীদ মুক্ত নির্বারিত জ্ঞান ও পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের শিখরই তার যোগ্য অধিষ্ঠানভূমি। মুসলমান অকারণে ভীত হয়ে সেই অমূল্য মাণিককে অন্ধবিশ্বাসের গুহায় লুকিয়ে রেখে তার সার্থকতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

(৩)

সাহিত্যের বিকাশের জন্য সত্যকার প্রয়োজন হচ্ছে সুব্যবস্থিত সমাজজীবনের, জীবনের বহুভঙ্গিমতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার। সেই দিক দিয়ে যে সব ত্রুটি বাংলার মুসলমানসমাজে রয়েছে তার মারাত্মকতা কত বেশী তাই একটু বিস্তৃত ভাবে বলতে প্রয়াস পেয়েছি। তবু হয়ত পরিষ্কার করে বলা হয় নি। আপনারা নিজেদের চেষ্টায় সেই অসম্পূর্ণতা পুষিয়ে নেবেন।[৩]

কিন্তু কেউ কেউ বলতে পারেন, কালের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের পরিদৃষ্টির ও সমাজ-ব্যবস্থার আবশ্যক পরিবর্তন আপনা থেকে হয়ে যাবে; কাজেই সে-সব কথা না তুলে বর্তমানে সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব কথা বাংলার মুসলমানের চিত্তকে আন্দোলিত করছে তার

---

৩. এ সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে পড়েছে। ইসলামের ইতিহাসের অমৃতফল বলে মুসলমান যা সব নিয়ে গর্ব করেন সেই মোতাজেলা দর্শন, সূফি সাহিত্য মোগল স্থাপত্য যাঁদের কীর্তি তাঁদের জীবনের দিকে চাইলে বোঝা যায় তাঁরা আধুনিক মুসলমানদের অবলম্বিত ইসলাম-ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি।

www.nagorikpathagar.org

যোগ্য মীমাংসার চেষ্টা করাই সমীচীন—তাতে করেই ধীরে ধীরে আমাদের সব ত্রুটি ক্ষালিত হয়ে যাবে। এ কথার উত্তরে শুধু এই বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, কালের ভান্ডারে অনন্ত রত্ন রয়েছে, কিন্তু প্রাণপণ না চাইলে তার কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যায় না। এই প্রাণপণ চাওয়ারও পিছনে অবশ্য ইতিহাস আছে। কিন্তু এ বিষয়ে কখনো যেন আমাদের ভুল না হয় যে, যারা পেয়েছে তারা সমস্ত দেহমন দিয়ে চেয়েছে।—তা ছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণত যে সব সমস্যা আজ কাল বাংলার মুসলমানের চিত্তকে আন্দোলিত করছে বলে বোধ হচ্ছে সে সব বাস্তবিকই তাঁদের সামনে প্রবল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। উর্দূ-বাংলা সমস্যা যে সত্যই তাঁদের জন্য কোনো সমস্যা নয় তার প্রমাণ তো বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা তাঁদের সামান্য ক্ষমতার ভিতর দিয়েও প্রতিনিয়তই দিচ্ছেন। আর বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের ব্যবহারের অনুপাত-সমস্যাও সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের খুব অল্প দিনের শিক্ষানবিশীর পরিচায়ক; এরা কিছুদিন গেলেই ও সম্বন্ধে তাঁদের খেয়াল আপনা থেকে দুরস্ত হয়ে যাবে এমন আশা করা যায়, কেননা সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন শুধু শব্দের নয়, বর্ণ ও গন্ধযুক্ত শব্দের, অন্য কথায়, বাঙালী মুসলমানের হবেনা এ ধারণা নিয়ে তাঁদের সাহিত্যসমস্যার আলোচনা করা নিশ্চয়ই বিড়ম্বনা। তবে এই সব সমস্যার সম্পর্কে একটি কথা ভাববার আছে ঃ— এই সব সমস্যার ভিতর দিয়ে বাংলার আধুনিক মুসলমানের একটি বিশেষ কামনা ফুটে বেরুতে চাচ্ছে, সেটি এই—"বাংলার মুসলমানকে সত্যকার মুসলমান হতে হবে"।

মুসলমানের এই মনোভাবের বিশ্লেষণ করলে প্রধানত দুটি চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তার একটিকে বলা যেতে পারে প্রতিক্রিয়া, অন্যটি ক্ষোভ অথবা অনুশোচনা। বাংলা সাহিত্যে আজ জগতের দৃষ্টি একটুখানি আকর্ষণ করতে পেরেছে এবং তাতে এর সত্যকার অধিকার আছে। কিন্তু তবু সত্যের অনুরোধে সাহিত্যরসিকদের নিশ্চয়ই বলতে হবে, এ সাহিত্য এখনো খুব বেশী পরিমাণে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য—মানুষের দুঃখ ও আনন্দের প্রকাশের চাইতে হিন্দুর বিশেষ দুঃখ ও বিশেষ আনন্দের চর্চাই এতে বেশী। "বাংলার মুসলমানকে মুসলমান হতে হবে" এ হচ্ছে অনেক পরিমাণে মুসলমানের অন্তরে বাংলা সাহিত্যের হিন্দুত্বের প্রতিক্রিয়া। এখানে হয়ত তর্ক হবে—হিন্দুও মানুষ, আর বিশেষকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার; কিন্তু তাতে করে আমার কথাটির ঠিক উত্তর দেওয়া হবে না। আমি এখনো বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য সম্বন্ধে এই কথাটুকু বলতে চেয়েছি যে, বাংলা সাহিত্যে হিন্দুর যে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পাওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তা অনেকখানি অস্বাভাবিক রকমে হিন্দু অর্থাৎ বিশ্বের আঙিনার এক পাশে তার বিশেষ রুচি ও বিশেষ দুঃখ নিয়ে ফুটে উঠে যে-হিন্দু জগতের সঙ্গে তার অবস্থার মোকাবেলা করতে চাচ্ছে সে-হিন্দু নয়, কিন্তু বিশ্বের মানব-যাত্রীদের পাশ কাটিয়ে তার চন্ডীমন্ডপের দাওয়ায় বসে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কূটতর্কে সময় কাটাচ্ছে যে হিন্দু সেই হিন্দু।—অবশ্য যারা একবার নীচে পড়ে গেছে তাদের উদ্ধারের ইতিহাস অনেক পরিমাণে যে ঘুরপাক খাওয়া ইতিহাস হবে এ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের দুর্ভাগ্যের জের যে

www.nagorikpathagar.org

আমরা কতকাল টেনে চল্‌ব তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এইখানে যে হিন্দুর হিন্দুত্বের সংঘাতে তার প্রতিবেশী মুসলমানের অন্তরে শুধু সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই জেগেছে।

ক্ষোভ অথবা অনুশোচনার ভাবটিকে এই প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষোভ অথবা অনুশোচনার ভিতরে যে আর একটি কথা আছে সেটি না বুঝলে আধুনিক বাঙালী মুসলমানের উপর অনেকখানি অবিচার করা হবে। সেটি তার মনের এই একটি বেদনার কথা যে ইসলাম সুন্দর, ইসলাম মহান্ কিন্তু তার যোগ্য প্রকাশ আমরা আমাদের সাহিত্যে দেখছিনে কেন?—এই যে বাঙালী মুসলমানের অন্তরে একটুখানি সত্যকার বেদনা জেগেছে এ তার শুভদৃষ্টির পরিচয়—

"আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে।
তুমি আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাক তারে॥"

কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের সামান্য একটু নিবেদন করবার আছে। সাহিত্যে যে হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান নেই ঠিক তা নয়; কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দুর মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের আর সাম্প্রদায়িক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের এক চেহারা নয়। সাম্প্রদায়িক হিন্দু অথবা মুসলমান তার দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহারের ভিতর দিয়ে প্রধানত জগতকে এই বোঝাতে প্রয়াস পায় যে, সে আগে হিন্দু অথবা মুসলমান তার পরে মানুষ। কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু অথবা মুসলমান অন্তরে অন্তরে জানে, সে আগে মানুষ তার পরে হিন্দু অথবা মুসলমান। মানুষের অন্তরের গভীরতম আনন্দ ও বেদনা নিয়েই সাহিত্যের কারবার, সেইখানে সাহিত্যিক মানুষকে তার সম্প্রদায় ও জাতির আবরণ উন্মোচিত করে দেখেছে, অথবা সম্প্রদায় ও জাতির আবরণ তার সামনে ফিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই মানুষে মানুষে আত্মীয়তাই সে বেশী করে উপলব্ধি করে। সুতরাং সাহিত্যে জাতি ও ধর্ম্ম-ভেদ যেন কতকটা একই ফুলের দেশ ও কালের ভেদাভেদ শুধু পাপড়ির বিন্যাস ও রঙের গাঢ়তার বৈচিত্র্য।

তাই বাংলার সাম্প্রদায়িক মুসলমান আজ ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ও কতকটা সত্যকার বেদনায় ইসলামের যে চিত্র মনে মনে আঁকছেন, বাংলার সাহিত্যিক মুসলমানের হাত দিয়ে তারই প্রতিচ্ছবি নাও বেরুতে পারে, বরং সেই সম্ভাবনাই বেশী। তবে ইসলাম সম্বন্ধে যদি সত্যকার বেদনা তার চিত্তে জেগে থাকে তবে সাহিত্যে তার এক অনুপম রূপ নিশ্চয়ই ফুটে উঠবে। কিন্তু সাহিত্য যেমন চিরদিন অনুপম তেম্‌নি চিরদিন অভিনব, তাই সাম্প্রদায়িক মুসলমান তার এই কামনার ধনকে প্রথমে নাও চিনে উঠতে পারে।

সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী মুসলমানের মনের গোপনে আরো বহু সমস্যা আছে,—যেমন ইসলামের প্রাচীন ইতিহাসের কোন্ কোন্ পর্যায়ের দিকে আমাদের আজ বেশী করে চাইতে হবে, অথবা আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যের কোন্ কোন্ অংশ আমরা সাদরে গ্রহণ করব, কোন্ কোন্ অংশ বর্জ্জন করে চলব, ইত্যাদি। কিন্তু এসব বিচারে প্রবৃত্ত হতেও

www.nagorikpathagar.org

আমরা প্রস্তুত নই, কেননা আগে থাকতে এসব বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আর টাকা পাবার আশায় টাকার থলি তৈরী করা সমান রকমের বিড়ম্বনা। এসব বিচার করবে প্রত্যেক সাহিত্যস্রষ্টা নিজে, আর কি গ্রহণ করবে আর কি বর্জন করবে সেটি নির্ভর করবে তার রুচি ও শক্তির উপরে। তবে একটি কাজ করে বাংলার সাম্প্রদায়িক মুসলমান বাংলার সাহিত্যিক মুসলমানদের কিছু সাহায্য করতে পারেন, সেটি হচ্ছে, কোরআন হাদিস ও প্রাচীন মুসলমান গ্রন্থকারদের ভাল বইয়ের বাংলা তর্জমা প্রকাশ করা। অনেক সময়ে দেখা গেছে, অতি সামান্য উপকরণ থেকেও সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টাদের হাতে অনেক বড় সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে, —একটি ফুলকি তাঁদের কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য যেন যথেষ্ট। কিন্তু সেই সামান্য উপকরণটুকুও তো হাতের কাছে চাই।

আর একটা কথা বলে এই আলোচনা শেষ করব। আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক আদর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্য আমাদের আজকাল চাইতে বলছেন উর্দু সাহিত্যের দিকে। সে-চাওয়াটা মোটেই দূষণীয় নয়, বরং যত বেশী চিত্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ততই আমাদের জন্য মঙ্গলকর। কিন্তু এর ভিতর যে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অনুপ্রেরণা দেবার মতো কিছু নেই, স্পষ্ট ভাষায়ই বলতে চাই—ওটি দেখার ভুল। উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই; তবে যে সমস্ত উর্দু সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করে বাঙালী মুসলমানকে তাঁদের প্রতি ভক্তিমান হতে বলা হয় তাঁদের কয়েক জনের লেখার সঙ্গে আমার অল্প-কিছু পরিচয় আছে, এবং সেই পরিচয়ের বলে আমি বরং এর উল্টো কথাই বলতে চাই, —বলতে চাই, বাংলার মুসলমানের অন্তরে প্রেরণা দেবার মতো জিনিস বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যেই বেশী আছে।

বাংলার গত একশত বৎসরের ইতিহাস একটা দেশের পক্ষে গৌরবের ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের স্রষ্টাদের এ পর্যন্ত সাধারণত দেখা হয়েছে হিন্দুর চোখ দিয়ে, অর্থাৎ, সামান্য-সাফল্য-লাভে গর্বিতচিত্ত আধুনিক হিন্দুর চোখ দিয়ে। সেই আস্ফালন থেকে মুক্ত হয়ে অথবা তাতে বিরক্ত না হয়ে যদি তাকানো যায় এই শত বৎসরের রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, রাজনারায়ণ, রামতনু, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির দিকে, যদি ভাবা যায়, একটা মুমূর্ষ জাতির দেহে জীবন ফিরিয়ে আনবার জন্য কি প্রাণপণ সাধনা এঁরা করেছেন, —সে সাধনায় কত উদ্বেগ, কত অভিমান, কত নৈরাশ্য, কত উল্লাস, —তখন এই সব শক্তিমানদের কারো কারো জাতি-অভিমান বিজাতি-বিদ্বেষ ইত্যাদির অর্থ আপনা থেকে পরিষ্কার হয়ে আসে; আর সত্য ও কল্যাণের পথে আমাদের অগ্রজরূপ এঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন, আমাদের অন্তরে সহজ হয়ে পড়ে।

তারপর বাংলা সাহিত্যের কথা। এর ভিতর দোষ যে অনেক আছে সে সম্বন্ধে আগেই কিছু বলা হয়েছে; কিন্তু সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও এতে ভাল যেটুকু সম্ভবপর হয়েছে

www.nagorikpathagar.org

তাকে ডিঙিয়ে যাবার মতো কিছু উর্দুতে পাই নি; বরং বড় সাহিত্যের যে একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ মুক্ত-বুদ্ধি তার যতটুকু বিকাশ বাংলাতে হয়েছে ততটুকুও শুধু সেখানে চোখে পড়ে নি। তা ছাড়া চিন্তার জগতেও বাঙালী মুসলমান শুধু টুপি দেখে আত্মীয় ঠাওরাবে এ মনোভাব সম্বন্ধে শুধু এই বলা যায় যে, যত শীগগির এ দূর হয়ে যায় ততই আমাদের লজ্জা কমে।

দেশে দেশে দিকে দিকে মানুষ যে যেখানে সত্য ও কল্যাণের সন্ধানী হয়েছে সে আমার ভাই—একথা যদি মুসলমান প্রাণ খুলে না বলতে পারে তবে বৃথাই তার সাম্য ও একেশ্বর-তত্ত্বের অহঙ্কার। —আর শুধু মুসলমানের সাহিত্য-সৃষ্টি নয়, তার সমস্ত নবসৃষ্টির উৎস এইখানে বাঁধা পড়ে ক্রন্দন করছে।

"মুসলিম সাহিত্য-সমাজে"র প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। ফাল্গুন, ১৩২৩

দেশের জাগরণ

মুসলমানের গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতার ইতিহাস। তাই ওহাবী-প্রতিক্রিয়া যে বর্তমানে তার প্রধান পরিচয়-স্থল হবে সে-কথা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু একালের হিন্দুর ইতিহাস তার জাগরণ-চেষ্টার ইতিহাস, তাই হিন্দুর সত্যকার পরিচয়, অর্থাৎ তার শক্তি ও দুর্বলতা, সেই জাগরণ-চেষ্টার ভিতরেই খুঁজতে হবে। আর-হিন্দুর এই জাগরণ চেষ্টা শুধু হিন্দুতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়েও সংক্রামিত হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জাগ্রত হবার চেষ্টা করেছে বলা যায়। দেশ যে বিরোধ ব্যাধিতে ভুগছে তা থেকে উদ্ধার পাবার মতো জীবনী-শক্তি দেশের লোকদের মধ্যে আছে কিনা তারও সন্ধান পাওয়া সম্ভব দেশের এই বিচিত্র জাগরণচেষ্টার মধ্যেই।

দেশের একালের জাগরণ প্রধানত তিনটি কেন্দ্র হয়েছে—বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট্র ও উত্তর ভারত। এই তিনের আদি ও প্রধান কেন্দ্র বঙ্গদেশ। মহারাষ্ট্রের ও উত্তর ভারতের জাগরণ-চেষ্টা তার সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত।

বাংলায় ইংরেজের কুঠির পত্তন হয় আড়াইশ' বছর আগে। সেই সময় থেকেই বাণিজ্য-ব্যাপারে হিন্দু বাঙালীদের সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ইংরেজের নির্মিত শহর অনেকখানি নিরাপদ জ্ঞান করে প্রায় সেই সময় থেকেই সেসব শহরে হিন্দুদের বসতি স্থাপনের চেষ্টা চলে আসছে। সেইজন্য বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দুসমাজের মধ্যে যে-জাগরণের সূচনা হলো তাকে ইয়োরোপীয় সংস্রবের ফল বলে দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মত প্রকাশ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ১৮৭৬ সালের সুরেন্দ্রনাথের Indian Association স্থাপনা পর্যন্ত, অথবা ১৮৮৫ সালের ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপনা পর্যন্ত, অথবা একাল পর্যন্ত—এই জাগরণ নানা

www.nagorikpathagar.org

ধারায় নানা ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে বা করে আসছে। কাজেই ইয়োরোপীয় সংস্রবের পরিচয়—যে এর মধ্যে কখনো কখনো সুস্পষ্ট না হয়েছে তা নয়। তবু সেই সংস্রবই এর প্রধান পরিচয় কিনা সেটি বিচার্য।

এই জাগরণের আদিপুরুষ রামমোহনের যে সমস্ত রচনা পাওয়া গেছে সেসবের মধ্যে তুহ্ফাতুল্ মুওহ্হিদীন-ই বোধ হয় প্রাচীনতম। এর ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মন্তব্য করেছিলেন— রামমোহনের ধর্ম, জীবনের সূচনা এখানে, এর পরে তাঁর সে-জীবনের পূর্ণাঙ্গতা লাভের পরিচয় আছে ব্রাহ্মসমাজের Trust Deed-এ। কিন্তু তুহ্ফাতুল মুওহ্হিদীন এর সঙ্গে রামমোহনের পরে পরের রচনা তুলনা করলে এইই দেখা যায় যে ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে কোনো পরিবর্তন পরে তাঁর ভিতরে দেখা দেয় নি, শুধু তুহ্ফাতুল্ মুওহহিদীন-এ অবতার পয়গম্বর ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা তিনি যে, অস্বীকার করেছিলেন পরে আর সেসব তেমনভাবে অস্বীকার করেন নি বরং স্বীকার করেছেন। আমি দেখাতে প্রয়াস পেয়েছি যে যেভাবে তিনি পরে মধ্যবর্তী পয়গম্বরাদি স্বীকার করেছেন তা প্রকারান্তরে অস্বীকার করা—অর্থাৎ সাধারণত তাঁদের যেভাবে পরিত্রাতা বা পরিত্রাণের ভারপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করা হয় তা তিনি মানেন নি[১]। তবে তুহ্ফাতুল্ মুওহহিদীনে ও পরে পরের গ্রন্থসমূহে—যেমন হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা ও খৃষ্টান শাস্ত্রের আলোচনা—বড় পার্থক্য এই দেখা দিয়েছে যে তুহ্ফাতুল্ মুওহ্হিদীন-এ রামমোহন সংস্কারক ঠিক নন কিন্তু পরে তিনি সংস্কারক। তুহ্ফাতুল্ মুওহ্হিদীন-এ তিনি মনীষী—সত্য তন্ন তন্ন করে সন্ধান করছেন ও তা যোগ্য ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। এখানে তাঁর যে প্রখর যুক্তিবাদ প্রকাশ পেয়েছে তাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাব আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেখেছেন। তা সত্য হলেও সে-যুক্তিবাদের সঙ্গে রামমোহনের যুক্তিবাদের বড় পার্থক্য এই যে রামমোহন একই সঙ্গে প্রখর যুক্তিবাদী ও ঈশ্বরে-সমর্পিত-চিত্ত। তাঁর অবলম্বিত যুক্তিপদ্ধতি মুসলিম নৈয়ায়িকদের একথা তুহ্ফাতুল্ মুওহ্হিদীন-এর প্রথম ইংরেজী অনুবাদক মাওলানা ওবেদুল্লাহ্ স্বীকার করেছেন। মুসলিম দার্শনিকদের যুক্তিপদ্ধতিও তিনি ব্যবহার করেছেন। সেই দার্শনিকদের মধ্যে স্পেনীয় দার্শনিকরা নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের বিশেষ ভক্ত ছিল। তাঁদের প্রভাবে রামমোহনের মানস-জীবন গঠিত হয়েছিল একথা স্বীকার করার পথে কোনো বাধা নেই অথচ একথা স্বীকার করলে তাঁর প্রতিভার স্বরূপ-নির্দেশ কিছু সহজসাধ্য নয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে মুস্‌লিম দর্শন শেষ পর্যন্ত ধর্মেও সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য হয় নি; রামমোহনের যুক্তিবাদের সঙ্গে ঈশ্বর নিত্যযুক্ত। রামমোহনের প্রতিভার বেশ স্পষ্ট দুইটি ধারা—একদিকে তিনি মনীষী, বিচারকুশল; অন্যদিকে তিনি মানব প্রেমিক—সমস্ত জ্ঞান ও বিচারের সামাজিক মূল্য বড় করে দেখেছেন। তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও এই শেষোক্ত লক্ষণ তাঁর প্রতিভার বড় লক্ষণ হয়ে রয়েছে। মধ্যযুগের সাধকদের সঙ্গে রামমোহন সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তাঁর বড় পার্থক্য এই

---

১. দ্রঃ রামমোহন রায়।

www.nagorikpathagar.org

যে তাঁদের মতো তিনি ভক্ত ও কবি নন, তিনি ভক্ত ও মানবহিতাকাঙ্ক্ষী—সে-হীতাকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য মানুষের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের উৎকর্ষ-সাধন। মধ্যযুগের সাধকদের সঙ্গে তুলনায় তাঁর আধুনিকতা এইভাবে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর সেই আধুনিকতারও স্বরূপ বোঝা যাবে তাঁর সমসাময়িক ইয়োরোপীয় মনীষী গ্যেটের সঙ্গে তুলনায়। ফাউস্ট্-এ গ্যেটের যে কথা যে ভুল করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক সেই ভুলের ভিতর দিয়ে তাঁর কল্যাণভিসারী পথ সে-কথা হয়ত রামমোহনেরও; তাঁর "ধর্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের" কথাটির এই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভিলহেল্ম মেইস্টার-এ গ্যেটে যে একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার ছবি এঁকেছেন তাঁতে ঈশ্বর সম্বন্ধে উপদেশ পরিত্যক্ত হয়েছে, মানুষ শক্তিমান হয়ে প্রকৃতির উপরে ও নিজের উপরে অধিস্বামিত্ব লাভ করবে মানুষের এই রূপই গ্যেটে যেন সেখানে দেখেছেন, ভক্তিবাদকে তিনি যেন অবিশ্বাস করেছেন—এতে রামমোহন রাজি হতেন কি না তাইই ভাববার কথা। বাস্তবিক, প্রখরযুক্তিবাদী, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উৎকর্ষাবকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, রামমোহন যে অন্তরে অন্তরে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ঈশ্বরানুরাগের উপরে, শুধু অন্তরে নয় সমাজ-জীবনেও তাঁর প্রকাশ কাম্য জ্ঞান করেছিলেন, এই থেকেই বাংলার (অথবা ভারতের) ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়েছে। আমরা বলতে চাই, বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ মোটের উপর একটি ধর্মান্দোলন; কর্মান্দোলনও তার সঙ্গে হয়েছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে অতি-নিন্দিত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে অথবা ইয়োরোপের কোনো প্রধান দেশে যা হয়েছে তার সঙ্গে তার তেমন তুলনা হয় না। আর রামমোহনের পরে সেই কর্মের প্রবাহ তো যথেষ্ট অল্পপরিসর।

রামমোহন পরে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ (সামাজিক কর্মী হিসাবে) যে মুখ্যত ভগবৎ-উপলব্ধি-কামী, অন্তত, প্রধানত সেই কামনার জন্য তাঁদের জীবনকে তাঁরা ধন্য মনে করেছেন, সে-কথার প্রমাণ দেবার দরকার করে না। কেবল ডিরোজিও ও বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির মনে হয়। কিন্তু বিচারপন্থী হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যয়শীলতা যে ডিরোজিওর অন্তরপ্রকৃতির বড় ধর্ম ছিল তা বোঝা যায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর কবিতা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রকে বোঝাই শক্ত। তাঁর প্রতিভায় বড় গুণের ও বড় দোষের এমন একত্র সমাবেশ ঘটেছে যে তাঁর কোন্ রূপ সত্যরূপ তা বোঝা প্রায় অসম্ভব। তাঁকে বলা হয়েছে স্বদেশপ্রেমের পুরোহিত। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেমে সৃষ্টিধর্মের চাইতে প্রলয়ধর্ম বলবত্তর। তাঁর ধর্ম ও সমাজবিষয়ক রচনাগুলোর বেশী মূল্য দেবার উপায় নেই, কেননা, তিনি নিজে সে সবের বেশি মূল্য দেন নি—সেসবে বাদ-প্রতিবাদের ঝাঁজ মরে নি। হয়ত শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যিক অর্থাৎ রস-স্রষ্টা হিসাবেই দেখতে হবে। সে-হিসাবে মধুসূদনের মতো তাঁকেও যদি দেখা হয় এই ধর্মান্দোলন-যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাতে যুগের প্রকৃত রূপ আচ্ছন্ন হয় না[২]। বিদ্যাসাগরকেও এযুগ থেকে

---

২. বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। 'বাংলার জাগরণ' ও রামমোহন রায় দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা দরকার, কেননা, তাঁর বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন শাস্ত্র-সমর্থিত হলেও তিনি নিজে একে জানতেন কাণ্ডজ্ঞানানুমোদিত সামাজিক ব্যাপার বলে, এই মনে হয়।

রামমোহনের আবির্ভাব থেকে সুরেন্দ্রনাথের Indian Association স্থাপনা পর্যন্ত মোটামুটিভাবে এই ধর্মান্দোলন যুগের স্থিতিকাল বলা যায়, কেননা সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় রাজনীতির প্রবর্তক। নিজকে তিনি অবশ্য জানতেন ধর্মপ্রাণ ম্যাট্‌সিনির শিষ্য বলে; কিন্তু তিনি ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনেরই পরিচালক, শিক্ষিত ভারতবাসী কেমন করে ইংরেজ শাসকদের মতো সুযোগ সুবিধা লাভ করে সম্মানিত জীবন যাপন করবে এই ছিল তাঁর লক্ষ্য, একথা বল্লে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয় না। Indian Association-এর দশ বৎসর পরে ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়, আর কংগ্রেস রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক করে দেখতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রেও আনন্দমোহন প্রমুখ কর্মীর সেবা দেশের লাভ হয়েছিল যাঁরা রাজনীতিকে জীবনের অন্যান্য প্রয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি, বরং জীবনের সমস্ত প্রয়াস এক বড় আদর্শের অঙ্গীভূত করে দেখেছিলেন। কংগ্রেসের পূর্বে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন তেমন প্রবলপ্রতাপ হয়নি এই বিবেচনা থেকে কংগ্রেসস্থাপনার পূর্ব পর্যন্ত ধর্মান্দোলনের স্থিতিকাল বল্লে বেশী সঙ্গত হতেও পারে। এর পরে যে সব ধর্মপ্রাণ কর্মীর আবির্ভাব দেশে হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ ও অশ্বিনীকুমার—তাঁরা রাজনীতিক্ষেত্র থেকে নিজেদের দূরেই রেখেছিলেন বেশী। সেইজন্য ভিন্ন কালে জন্মেও ধর্মান্দোলন-কালের সঙ্গে তাঁরা নিবিড়ভাবে যুক্ত।

এই ধর্মান্দোলন-যুগ শুধু যে বাংলার গৌরব তা নয় সমগ্র ভারতের গৌরব। পৃথিবীর বড় বড় ধর্মান্দোলন-যুগের সঙ্গে এর তুলনা করলে এর ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে—চারপাশের দুর্বলতার সঙ্গে এর সংগ্রাম তেমন প্রবল হয় নি। তবু এই যুগের সাধকরা মাঝে মাঝে এমন দুই একটি কাজ করেছেন, দুই একটি কথা বলেছেন, যাতে ধূলি লুণ্ঠিত চতুষ্পার্শ্বেও জীবনকে যেন মুহূর্তের জন্য এক সুউচ্চ গ্রামের শোভা-সৌন্দর্য দেখবার শক্তি দান করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—রামমোহনের শিক্ষাসম্বন্ধে পত্র ও ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডীড, ডিরোজিওর ভারত-বন্দনা, দেবেন্দ্রনাথের দুর্বহ পিতৃঋণ সর্বান্তঃ করণে স্বীকার, কেশবচন্দ্রের "The term Brahmo is not included in the term Hindu", রামকৃষ্ণের সমস্ত ধর্মের সাধন-চেষ্টা, বিবেকানন্দের "জীবে প্রেমে করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" রবীন্দ্রনাথের "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়!" এরকম আরো কীর্তি ও বাণী উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের আছে যার ভিতর দিয়ে মানুষের সৃজনী প্রতিভার পরমমনোজ্ঞ রূপ উৎসারিত হয়েছে। এ যুগের অনেককাজে ও কথায় অভিনবত্বের ছটা অবশ্য কম। কিন্তু তাতে সেসবের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ন হয় না। ফুল পুরাতন, কিন্তু প্রতিদিন বাগানে বাগানে নতুন হয়ে ফুটছে। এ যুগ আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশের যে একটি শ্রেষ্ঠ যুগ সে-সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিতেরা দিন দিনই বেশী সচেতন হচ্ছেন। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত-সাধারণের সঙ্গে একালের

www.nagorikpathagar.org

বাংলার এই স্রষ্টাদের কি সম্পর্ক সে-কথাটি ভাল করে বুঝে দেখবার প্রয়োজন আছে। এ-প্রশ্ন আমাদের শিক্ষিতদের মনে তেমন ওঠে না, তাঁরা মনে করেন, দেশের মানস জীবনের সহজ ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা পোষণ করবার কারণ উপস্থিত হয় নি। দুশ্চিন্তা অবশ্য অসার্থক; কিন্তু দেশের মানসজীবনের ক্রমবিকাশ যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং দেশের একালের স্রষ্টাদের সঙ্গে দেশের শিক্ষিত-সাধারণের সম্পর্ক যে সাধনা ও সাধনার উত্তরাধিকারের সম্পর্ক নয় কৃতী পিতার ভদ্রাসন ও প্রতিপত্তির সঙ্গে পুত্রের যে সাধারণ সম্পর্ক সেই সম্পর্ক, এ কথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি।[৩] কেন এমন হয়েছে সে-কথাটি সংক্ষেপে বলা যায় এই ভাবে ঃ—

রামমোহন থেকে দেশে যে নব চেতনা এলো তার বড় প্রকাশ হলো দুই আন্দোলন-অবশ্য সংস্কারের চাইতে আন্দোলন বেশী। এই সময়েই হিন্দু-সভ্যতার লাভ হলো বৈদেশিক পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা। ফলে এই অনেকখানি দুর্বল সংস্কারকদের সংস্কার-চেষ্টাকে দাম্ভিকতা বলে ভাববার সাহস হিন্দুসমাজের ভিতরে জাগলো। প্রেমও সৃষ্টি-ধর্মী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে তাঁদের দলে পেয়ে তাঁদের অভ্রান্ততা-বোধ বিশেষভাবে বর্ধিত হলো। মুসলমানের চিন্তার ইতিহাসে ইমাম গাজ্জালীর প্রভাব যে-ফল ফলিয়েছিল একালের হিন্দুর চিন্তাধারায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবও সেই ফল ফলালো; অর্থাৎ সর্বসাধারণের কাছে সংস্কার-চেষ্টা একশ্রেণীর দুর্বলতা মনে হলো, কিন্তু দেশের একালের এই সংস্কার-চেষ্টা বা নবজীবন লাভের চেষ্টা এর চাইতেও বড় আঘাত পেল দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের তরফ থেকে। রাজনীতি অবশ্য মানুষের সমাজজীবনের খুব বড় ব্যাপার। কেউ যদি একে মানুষের জীবনের সব চাইতে বড় ব্যাপার জ্ঞান করেন তাঁর সঙ্গে তর্ক না করলেও চলে। কিন্তু আমাদের দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের রাজনীতি নামেও ধরণধারণে রাজনীতি হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু পদমর্যাদা-বৃদ্ধির জন্য আন্দোলনমাত্র—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন আবেদন নিবেদনের থালা বহন। শুধু এই ব্যাপারটি দেশের মানসজীবনের জন্য মারাত্মক হতো না; এটি মারাত্মক হলো এই বিশেষ কারণে যে এই সামান্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এর তরফ থেকে এমন ঢক্কা-নিনাদ দেশের লোকদের দিকে দিকে বিঘোষিত হলো যে আত্ম-অন্বেষণের কঠোর প্রয়াস সহজেই দেশের লোকদের কাছে স্বাদহীন মনে হলো পর-চর্চার স্বাদুতার সামনে।—কেউ কেউ হয়ত বলবেন, এক সময়ের এই সৌখীন রাজনীতি চিরদিন সৌখীন থাকেনি—স্বদেশী আন্দোলন, একালের রাজনৈতিক আন্দোলন, নানাজনের নানা ধরণের আত্মদান তার প্রমাণ। যাঁরা এমন কথা বলেন তাঁদের মধ্যে অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি আছেন। তাই পরম বিনয়ে এই কথাটি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে জীবনের সার্থকতার পথ ক্ষুরধার, যা প্রচণ্ড বা মোহকর তার গতি সেই পথে অবাধ যে হবেই এমন কথা নেই; আর জীবনে যা অসার্থক তাকে সৌখীন না বলে উপায় কি। আত্মদান অবশ্য অশ্রদ্ধার সামগ্রী নয় কখনো, কিন্তু নবতর

---

৩. পরিশিষ্ট (ক) দ্রঃ

www.nagorikpathagar.org

অন্ধতার জন্যও যে তার থেকে সম্ভবপর সে-সম্বন্ধে চেতনার অভাব মারাত্মক।

আমাদের দেশের রাজনীতি-চর্চা একটি ক্ষুদ্র দলে আবদ্ধ বলে যে তাকে আমরা অসার্থক বলতে সাহসী হয়েছি তা নয়। একটি দল কেন একজনের মধ্যেও রূপ লাভ করতে পারে সমগ্র দেশের কল্যাণ-সম্ভবনা। আমাদের দেশের রাজনৈতিক অসার্থকতার মূলে আমাদের শিক্ষিতদের শোচনীয় আত্মসর্বস্বতা ও অপ্রেম। যদি বলা যায় যে দেশের রাজনৈতিক চেতনার প্রারম্ভে তাঁরা পূজারি হয়েছিলেন পরিতোষ-দেবতার আর আজ পূজারি হয়েছেন অসন্তোষ দেবতার তবে অপ্রিয় কথা বলা হয় সত্য কিন্তু অসত্য কথা হয়ত নয়। দেশ বলতে যে বহু শ্রেণীর বহু মানসিক স্তরের লোক বোঝায়, আর দেশসেবা বলতে যে সেই সব মানুষের উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত সাধনা বোঝায়, এসব কথা বলবার মতো লোক আমাদের দেশে কম জন্মাননি; কিন্তু যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কর্মী দেশের এই সমস্যার গুরুত্ব তাঁদের বোঝানো সম্ভবপর হয়নি। তার চাইতে তাঁরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেছেন তাঁরা যে সংখ্যায় যথেষ্ট অতএব গণনীয় এই কথাটা বিদেশী শাসকদের বোঝাতে। তাঁরা যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সে কথা মানতে হবে; কিন্তু এই অপ্রিয় সত্যের সম্মুখীন তাঁরা হচ্ছেন না যে সব জয় জয় নয়, অনেক জয় পরাজয়েরই অন্য নাম, এইখানেই কর্মী হিসাবে তাঁদের শোচনীয় দুর্বলতা। ভাঙবার ক্ষমতার সঙ্গেই যুক্ত থাকে গড়বার তাগিদ, এ সুচিন্তা নয়—মোহ; এর বিপরীতটি অবশ্য সত্য—গড়বার ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থাকে ভাঙবার তাগিদ। যাঁর গড়বার ক্ষমতা ভাঙবার তাগিদের পূর্ববর্তী হয় নি তাঁকে অনায়াসে বলা যায় কুকর্মা। কর্ম ও জ্ঞান এর কোনক্ষেত্রে আমাদের দেশের রাজনীতি যে সৃষ্টিপ্রবণ হয়নি, যাঁরা সৃষ্টিপ্রবণ হয়েছেন তাঁদের প্রভাব সে-ক্ষেত্রে নগণ্য হয়েছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় আছে মনে হয় না। অথচ, এই রাজনীতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছে দেশের সমস্ত মন!

দেশের দ্বিতীয় জাগরণ-কেন্দ্র মহারাষ্ট্র। বাংলার জাগরণের সঙ্গে তার যোগ নিবিড়। তবে মহারাষ্ট্রও স্বকীয়তা-বিবর্জিত নয়।

মহারাষ্ট্রের জাগরণের নেতা মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। রামমোহনের সাধনার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার সেকালে তাঁরই লাভ হয়েছিল মনে হয়। রামমোহনের মতোই তিনি স্বদেশ প্রেমিক আর তাঁর স্বদেশ-প্রেমও নিরভিমান। দুর্লভ মনীষারও তিনি অধিকারী; তাঁর theist's confession of faith সহজেই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিন্তার গৌরব-স্বরূপ। বাংলায় তাঁর চাইতে সূক্ষ্মতর চিন্তার বিকাশ হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতো স্থিতধী প্রতিভা বাংলায় দুর্লভ।

এই রাণাডে জননায়করূপে নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন সেটি বেশ বুঝে দেখবার মতো। তাঁর মনীষাকে তিনি আবৃত করেননি, ধর্মে ও সমাজে হিন্দুর যে-সব আচার ও চিন্তা তিনি উন্নত জীবনের পরিপন্থী মনে করেছিলেন সে সব সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত তাঁর মতামত। তবু কর্মক্ষেত্রে তিনি বড় জ্ঞান করেছিলেন মতবাদের পরিচ্ছিন্নতা তত নয় যত তাঁর চারপাশের লোকদের সঙ্গে নিবিড় যোগ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের উৎকর্ষের জন্য অতন্দ্রিত কিন্তু অনুৎকট প্রয়াস। এতে চিন্তার বিচিত্র প্রকাশ তাঁর অঞ্চলে হয়ত

www.nagorikpathagar.org

আজো তেমন হয় নি; কিন্তু পশ্চিম ভারতের লোকদের অর্থনৈতিক বোধ যে বাঙালীর চাইতে উন্নততর তার সঙ্গে তাঁর সাধনার যোগ বুঝতে পারা যায়। বিশেষ করে. দেশের সৃষ্টিধর্মী রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর শিষ্য গোপালকৃষ্ণ গোখেল যেরূপ কৃতী হয়ে গেছেন তাতে পরিচয় রয়েছে তাঁর সাধনার মাহাত্ম্যের। আশ্চর্য এই যে ইতিহাসে মারাঠাজাতির পরিচয় নির্মম লুণ্ঠনকারীরূপে অথচ সেই জাতির ভিতরে জন্ম গ্রহণ করেছেন এমন মানবপ্রেমিক মনীষী। এ বিষয়ে রাণাডে নিজেও হয়তো সজাগ ছিলেন—তিনি নিজেকে উত্তরাধিকারী জ্ঞান করেছেন মারাঠা জাতির সাধুসন্তদেরও সেই সঙ্গে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতের যুগ-যুগান্তরের ঋষি ও প্রেমিকদের।

মারাঠা জাতির সত্যকার নেতা রাণাডেই, অন্তত দূর থেকে তাইই আমাদের মনে হয়। কিন্তু এই মারাঠা দেশে আর একজন শক্তিমান ব্যক্তির ও জন্ম হয়েছিল বৃহত্তর দেশের রাজনীতির উপরে তাঁর প্রভাব অসামান্য; তিনি বালগঙ্গাধর তিলক। দেশ তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছে দুঃসাহসী নেতা জ্ঞানে। কিন্তু তাঁর শক্তি হয়ত বাংলার বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রলয়ঙ্কর শক্তি-দুর্যোগরাত্রির বিদ্যুৎ-ঝলক তাতে, পথের নির্দেশ তার কাছে কেউ আশা করে না।

কিন্তু ভাবুক বাঙালী ও কাণ্ডজ্ঞানপ্রিয় মারাঠা দুয়েরই কাছে এই জাগরণ নাম পেল হিন্দু-জাগরণ। হিন্দু-সম্প্রদায়ে সূচিত হলো এই জাগরণ, তাতে উৎফুল্ল হয়ে সাধারণ শিক্ষিত হিন্দু এর এই নামকরণ করলেন তা নয়। দেশের এই নবচেতনা যাঁদের দ্বারা সূচিত হলো সেই বরেণ্য স্রষ্টাদের ও অনেকের কাছে এই নাম সমর্থন পেল। এই হিন্দুজাগরণ কথাটা দেশের জীবনধারায় এত বড় জায়গা দখল করেছে যে একে ভাল করে বুঝে দেখবার প্রয়োজন আছে।

এই হিন্দু-জাগরণ কথাটার ভিতরে মোটামুটি ভাবে তিনটি চিন্তাধারা রয়েছে। প্রথমত, হিন্দু-জাগরণ বলতে বোঝা হয়েছে পতিত হিন্দু-সমাজের সহজ ও সবল মনুষ্যত্বের স্তরে উত্থান। অন্যান্য উন্নত সমাজের মানুষ যেমন জগতে সম্মানিত জীবন যাপন করে যাচ্ছে হিন্দু দীর্ঘকাল তা থেকে বঞ্চিত থাকলেও আবার তার সুদিনের উদয় হয়েছে, এই এ মতের চিন্তাশীলেরা বলেন। এঁরা বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ী মনে করেন, আর সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে জাতিতে জাতিতে অথবা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সহযোগিতা কামনা করেন। দ্বিতীয়ত, হিন্দু-জাগরণ বলতে বোঝা হয়েছে হিন্দু-সভ্যতার অন্তর্নিহিত অনন্যসাধারণ শক্তির জাগরণ। হিন্দু-সমাজ অতি পুরাতন-বর্তমান সভ্য জগতে প্রাচীনতম; তার সমবয়সী সব সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও কেবল সে-ই আজো ধ্বংসমুখে পতিত হয় নি: অতএব সিদ্ধান্ত এই যে তার গঠনের মূলে অতি আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রয়েছে তার এমন দীর্ঘ পরমায়ুর কারণ সেই বৈজ্ঞানিকতাই। এই মতের চিন্তাশীলদের ধারণা হিন্দু-সভ্যতা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা, হিন্দু-জাগরণের অর্থ সেই আশ্চর্য শক্তির জাগরণ-জগতের কল্যাণের জন্য। তৃতীয়ত, হিন্দু-জাগরণ বলতে বোঝা হয়েছে ভারতের সর্বব্যাপী এক বিশেষ প্রভাবের জাগরণ। এই মতের চিন্তাশীলেরা বলতে

www.nagorikpathagar.org

চান ভারতে আর্য অনার্য দ্রাবিড় শক হূন প্রভৃতি বিচিত্র জাতির মিলনে মুসলমানের আগমনের পূর্বে একটি বিশেষ মনোভাবের জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই মিশ্রিত জাতির সাধারণ নাম হিন্দু। মুসলমানেরা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে খুবই চেষ্টা করেছিল। তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নি; কিন্তু তাদেরও অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, নানা আচারে, হিন্দু-প্রভাব অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রভাব পড়েছিল। সে-প্রভাব দিন দিন গভীরতর হচ্ছিল। সেই ভারতীয়ত্ব কিছুদিন নিষ্প্রভ হয়ে ছিল, আবার তার শক্তি বোঝা যাচ্ছে। হিন্দু-জাগরণের অর্থ এই ভারতীয়ত্বের জাগরণ। এদেশের সকলেরই শ্রদ্ধার বস্তু হওয়া উচিত এটি, কেননা এই-ই জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের সকলের সার্থকতা-লাভের পথ। কোনো সমাজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে দেওয়া এর স্বভাব নয়, তবে দেশের সব রকমের স্বাতন্ত্র্য যেন হয় এই মূল ভারতীয়ত্বের সঙ্গে সুসঙ্গত।

হিন্দু-জাগরণের এই তিন অর্থের কিছু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হবে তৃতীয় বক্তৃতায়, আপাতত দেখবার দরকার হিন্দু প্রধান সহকর্মী ও প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানের চিন্তা ও কর্মের উপরে এর প্রভাব। সে-ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে এই হিন্দু-জাগরণের প্রথম অর্থটি শিক্ষিত মুসলমানের অশ্রদ্ধেয় নয়। তৃতীয় অর্থটি তাদের একান্ত অপ্রিয়। হিন্দু-জাগরণের এই অপ্রিয় অর্থটি দিন দিন মুসলমানের চোখে কেমন স্পষ্টতর হচ্ছে তার পরিচয় রয়েছে ভারতীয় মুসলিম-জাগরণের নেতা সার সৈয়দ আহ্‌মদ খানও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের প্রচেষ্টায়।

স্যার সৈয়দ বাল্যে মোগল সংস্কৃতির আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিলেন। বোধ হয় সেইজন্যই স্বধর্ম ও স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্ত্বেও ওহাবী অসহিষ্ণুতার কবলে তিনি কখনো পতিত হন নি। মোগল সংস্কৃতির সেই সৌজন্যই তাঁকে হয়ত শক্তি দিয়েছিল দেশের সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে। ধর্ম-বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও শুধু একদেশবাসী হিসাবে মানুষে মানুষে যে আর্থিক ও রাজনৈতিক যোগ আছে সে-সম্বন্ধে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। একটি বক্তৃতায় তিনি নিজেকে জাতি-হিসাবে বলেছিলেন হিন্দু অর্থাৎ হিন্দুস্থানের অধিবাসী। উন্নতি প্রবণতার জন্য বাঙালী-জাতির প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল; কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক একজন বাঙালী হিন্দু নিযুক্ত হয়েছিলেন দেখে ভারতবাসী হিসাবে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। তবু শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিমস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে যেতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি।

মৌলানা মোহাম্মদ আলি খান কংগ্রেসে তাঁর অভিভাষণে স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক মনোভাব বিশেষভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের সব ক্ষেত্রে মুসলমানেরা বড় বেশী পেছনে পড়ে গিয়েছিল, এই জন্যই স্যার সৈয়দ মুসলমানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তাঁর কথা মিথ্যা নয়। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের অপরিসীম দুঃখে পতিত হতে হয়েছিল তাঁর জন্য দেশের রাজনৈতিক জাগরণ, অর্থাৎ শাসকদের সঙ্গে যোঝাযুঝি, স্যার সৈয়দ যে মুসলমানদের জন্য অবাঞ্ছিত মনে করবেন, এ বোঝা যায়। কিন্তু এ ভিন্ন অন্য একটি উদ্দেশ্যও যে তাঁর ছিল

www.nagorikpathagar.org

তা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য হওয়া উচিত নয়। তিনি ইসলামকে বলেছিলেন "এক লাজওয়াব নূর" (তুলনাহীন জ্যোতিঃ)—যা চিরউজ্জ্বল চিরপূর্ণাঙ্গ। হিন্দু-জাগরণ বলতে যাঁরা বোঝেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার জাগরণ তাঁদের সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর এই ইসলাম-ব্যাখ্যার মিল রয়েছে। এই দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় মুসলিমস্বাতন্ত্র্য স্যার সৈয়দ চেয়েছিলেন শুধু যে মুসলমানের দুর্বলতার জন্য তা হয়ত সত্য নয়। মুসলিম সভ্যতার খ্যাতি জগৎ-জোড়া, সেই সভ্যতার উত্তরাধিকারী ভারতীয় মুসলমান আপাততঃ হতশ্রী হলেও কেন চেষ্টা করে দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের মতো সম্মানের পাত্র হবে না,তাদের চাইতে বেশী শ্রদ্ধার্হ হওয়াও তাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়—এই ধরণের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হওয়া সেদিনে তাঁর পক্ষে কত স্বাভাবিক ছিল তা বোঝা যায় এই কথা ভাবলে যে সে-যুগে রাণাডের মতো মনীষী ও স্বদেশবৎসল ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করেও ভারতীয় জাতীয় জীবন বলতে হিন্দু জীবনই বুঝেছিলেন বেশী। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সৌহার্দ তখন ছিল জাতীয় জীবন সম্বন্ধে উচ্চতম ধারণা। 'হিন্দু-জাগরণ' 'মুসলিম জাগরণ' এ-সব 'দেশের জাগরণের' সঙ্গে কিভাবে সম্বন্ধ সে ধারণা তখন দেশের শ্রেষ্ঠদের মনেও ছিল অস্পষ্ট।—তবু পূর্ণাঙ্গ জীবন সম্বন্ধে অনেকখানি ধারণা স্যার সৈয়দ ও তাঁর কোনো কোনো সহকর্মীর ছিল যেমন তাঁদের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ হিন্দুজাগরণকামীদের ছিল। 'যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়'—তাঁর এই ইসলাম-ব্যাখ্যা কল্যাণপ্রসূ হবে আশা করা যায়। কিন্তু মুসলমানদের জন্য একটি শক্তিশালী আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তিনি যে জীবনের ব্রত করেছিলেন মনে হয় এরই ভিতরে রয়েছে তাঁর প্রতিভার সত্যকার মর্যাদা।

স্যার সৈয়দের পরে মুসলিম জাগরণের বড় বাহন সৈয়দ আমির আলি ও স্যার মোহম্মদ ইকবাল। আমির আলি অনেক বিষয়ে ছিলেন স্যার সৈয়দের যোগ্য পরবর্তী। স্যার সৈয়দ জ্ঞানী হলেও প্রধানত ছিলেন কর্মবীর, মুসলমানের দুর্দশা ঘুচিয়ে তাকে আধুনিক কালের লোকদের সঙ্গে সহজভাবে চলবার সামর্থ্য দেবার সাধনা ছিল তাঁর। আমির আলির চেষ্টা হয়েছিল—অনেকখানি স্যার সৈয়দেরই অনুবর্তিতায়—মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভুত নিষ্করুণ সমালোচনার সৌজন্যময় প্রতিবাদ ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানের সুমহৎ সম্ভাবনা প্রদর্শন। এঁরা দুজনেই যুক্তিবাদী; আমির আলি নিজেকে বলেছিলেন মোতাজেলা-পন্থী। ইসলামতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড এতে ঘোর আপত্তি করেছেন। তাঁর মতে এই নব ভারতীয় মোতাজেলা-বাদ ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের ছদ্মনাম মাত্র। তাঁর কথায় সত্য আছে, কিন্তু ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের সঙ্গে মোতাজেলা-বাদেও দূর-সম্পর্ক যখন আছে তখন তাঁর এত আপত্তি অশোভন। তাছাড়া আমির আলির দাবীর সত্যতা বোঝা যায় তাঁর স্বসম্প্রদায়ের শিক্ষিত-সাধারণের উপরে তাঁর প্রভাবের স্বরূপের কথা ভাবলে। তাঁর প্রভাবে তাঁদের স্বধর্মানুরাগ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নি অথচ সেই সঙ্গে জ্ঞান ও উদারতার প্রতি কিছু অনুরাগ তাঁদের মনে জেগেছে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু আমির আলির নেতৃত্ব তাঁর স্বসম্প্রদায়ের লোকদের জন্য স্যার সৈয়দের মতনও কল্যাণপ্রসূ হয় নি তাঁর নিজের একটি মারাত্মক দুর্বলতার জন্যে। যে-দেশে তাঁর জন্ম সে-দেশে ভিন্নধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তা ও কর্মের যত আন্দোলন চলেছিল সে-সবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে নেই তা নয়, কিন্তু বড় অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত সে সম্পর্ক। সুরেন্দ্রনাথের Indian Association এর পরে ও কংগ্রেসের আবির্ভাবের পূর্বে তিনি Central Mohamedan Association এর প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার রাজনীতির প্রশংসা আমরা করতে পারি নি, কিন্তু সেই রাজনীতির সঙ্গে তুলনায়ও আমির আলির রাজনীতি অদ্ভুত বলে মনে হয়। তাঁর Central Mohamedan Association এর প্রেরণায় বাংলার বহুস্থানে নানা শ্রেণীর আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মনে হয় তাতে বলবার বিষয় মাত্র এই দাঁড়িয়েছিল যে মুসলমান হিন্দু থেকে স্বতন্ত্র। স্যার সৈয়দের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে তাঁর পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্যার সৈয়দ স্বাতন্ত্র্যবাদী হলেও সৃষ্টিধর্মী, কিন্তু আমির আলি, অন্তত কর্মক্ষেত্রে, শুধু স্বাতন্ত্র্যবাদী। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের রাজনীতির যে আদিরূপ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আপন পদমর্যাদার জন্য অন্তহীন উপরোধ—আমির আলি তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন মনে হয়। তবে আমির আলির ভিতরে রাজনীতির চাইতে জ্ঞানানুরাগ প্রবল, তাই তাঁর স্বাতন্ত্র্যবাদ উৎকট আকার কখনো ধারণ করে নি।

স্যার ইকবাল সমসাময়িক ব্যক্তি। হিন্দু ও মুসলমানের বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ যখন দেশে উৎকট হয়েছে তখন তিনি দাঁড়িয়েছেন মুসলিম নেতৃত্বের দাবী নিয়ে। তাই তাঁকে বুঝবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধপক্ষকে বোঝা দরকার। এই বিরুদ্ধ পক্ষ কে? ঠিক হিন্দু-সমাজ নয়, তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ হিন্দু-সমাজে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে একটি মনোভাব। হিন্দুজাগরণ বলতে যাঁরা বোঝেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের জাগরণ, আর যাঁরা বোঝেন ভারতের প্রকৃতি হিন্দু-প্রকৃতি, এই উভয় মতের এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে তাতে। হিন্দুত্বের এই যে রুদ্র মূর্তি এর সঙ্গে ইসলামের ওহাবী মতের আশ্চর্য মিল রয়েছে। দুয়ের উৎপত্তি-সূত্রও একই। মুসলমান জগতের শক্তিহীনতা থেকে ওহাবী প্রতিক্রিয়া জন্মলাভ করেছে, তেমনি হিন্দুর যুগযুগান্তের শক্তিহীনতাও ব্যর্থতা-বোধ থেকে জন্ম হয়েছে এই রুদ্র-হিন্দুত্বের। হিন্দুত্বের এই রূপ হিন্দুসমাজে যে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা নয় কিন্তু মুসলমানের চোখে সে শুধু মাত্রার ভেদ। মুসলিম-বিদ্বেষ হিন্দুত্বের অতি বড় পরিচয়চিহ্ন বলে একালের মুসলমানদের মনে হয়েছে।

ইকবাল সেই কথাই খুব বড় করে বলছেন এই ভাবে—হিন্দুর অবলম্বিত জাতীয়তাবাদ দেশে সর্বব্যাপী হিন্দু-প্রাধান্য স্থাপনের ছদ্মনাম। তার সঙ্গে আরো তিনি বলছেন—মুসলমান তাতে রাজি হতে পারে না এই জন্য যে জগতের একটি অতি বড় আদর্শের সে বাহন, তাহলে সেই আদর্শ তাকে বিসর্জন দিতে হয়। অথচ এই মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নব্য তুর্কীর প্রতি শ্রদ্ধাবান যদিও তিনি জানেন যে নব্যতুর্কী তাঁর ইসলাম-ব্যাখ্যা গ্রহণ করে না। অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমের পরিচয়ও তাঁর কাব্যে আছে, তাঁর 'নয়া শিবালয়' কবিতায়

www.nagorikpathagar.org

স্বদেশ-দেবতার পূজাকে তিনি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। অল্পদিন পূর্বের একটি অভিভাষণেও তিনি বলেছেন—ভারত যদি কবীর বা আকবরের মত গ্রহণ করত তাহলে কথা ছিল না; কিন্তু তা যে হয় নি সেজন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদর্শ অম্লান রাখা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের একমাত্র কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন।[৪]

বোঝা যাচ্ছে ইকবাল পণ্ডিত হলেও দুর্বল চিন্তা-নেতা-সমসাময়িক বিপর্যস্ত ভারতীয় জীবনের দ্বারা বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু তিনি কবি, যখন যা বলেন সমস্ত অন্তর দিয়ে বলেন, তাতে তাঁর বাণীর প্রভাব কম হচ্ছে না। ভারতের মুসলমানকে সব বিষয়ে হুশিয়ার হতে হবে এই বহুকালের অর্ধস্ফুট কথা আপাতত দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মুসলমানের বুকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে।

হিন্দুসমাজের কর্মীদের আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি—স্রষ্টা ও শিক্ষিতসাধারণ। এই দুইয়ের ভিতরে সাধনার যোগ ঠিক নেই এই আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি। মুসলমান-সমাজেও তেমনি স্যার সৈয়দকে ভাবা যায় স্রষ্টা আর তাঁর পরের কর্মীরা প্রায় সবাই শিক্ষিত মাত্র। সৃষ্টি-ধর্মী রাজনীতি নয় রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি উভয় সমাজের এই শিক্ষিত-সাধারণের প্রধান পরিচয়-চিহ্ন। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে একালের স্রষ্টাদের যে সহজ ও নিবিড় যোগ একালের এই শিক্ষিত-সাধারণ সেদিক দিয়ে দুর্ভাগ্য।

দেশের জাগরণ-চেষ্টার যে পরিণতি হলো তা বেদনাদায়ক। 'হিন্দু-জাগরণ' 'মুসলিম-জাগরণ'-কামীদের কাছে যে অর্থে ব্যক্ত হলো তা নাও হতে পারতো। হিন্দুসমাজে সূচিত এই জাগরণকে হিন্দু-জাগরণ বলে পরিচিত করবার আগ্রহ হিন্দু-সমাজে এমন প্রবল না হলেও অস্বাভাবিক-কিছু হতো না। রাজনীতি খেয়ালী না হয়ে সৃষ্টিধর্মীও হতে পারতো। কিন্তু অতীতের উপরে ফরমাস করা চলে না, তাই বর্তমানের প্রয়োজন— সংযতভাবে দেশের এই নিষ্ঠুর বিরোধের দিকে তাকিয়ে দেখা, আর এর হাত থেকে দেশের লোকদের অব্যাহতি লাভের কি উপায় আছে তারই সন্ধান করা। এই বিরোধ সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার প্রয়োজন হবে তৃতীয় বক্তৃতায়, আপাতত সংক্ষেপে এই কথাটা বলা যায় যে, একদিকে মুসলমানের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত শক্তি-দৈন্য যার জন্য নবজাগরণ সহজ হতে পারে নি তার ভিতরে অধিকন্তু সন্দেহশীলতা তাতে হয়েছে দৃঢ়মূল, অন্যদিকে হিন্দুর নবজীবন লাভের অকৃত্রিম প্রয়াস কিন্তু তারই সঙ্গে তার অদ্ভুত আত্মসম্পূর্ণতাবোধ যার জন্য নবজাগরণ সহজেই তার ভিতরে রূপান্তরিত হয়েছে বিভিন্ন ধরণের মানসিক সৌখীনতায়—এই যে দেশের দুই বিবদমান সম্প্রদায়ের দ্বিবিধ দুঃখ এর কোনোটিই যেন আমাদের সতর্ক দৃষ্টির প্রহরা এড়িয়ে না যায়। এই দুই সমাজের দুঃখের স্বরূপ যদি দেশের লোকেরা বাস্তবিকই উপলব্ধি করতে পারে তবে সে-দুঃখ জয় করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য না হওয়াই স্বাভাবিক।

২৭ মার্চ, ১৯৩৫

---

৪. All-India Muslim League-এ অভিভাষণ, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা সাহিত্যের চর্চা

সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা কিছু বলতে যাবেন তাঁরা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবেন সাহিত্য-তত্ত্ব অর্থাৎ রস কি কাব্য কি কবি এই সব, আমাদের দেশের পাঠক-সাধারণ এ আশায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু লেখক-সাধারণ দুঃখের সহিতই জানেন, সংস্কৃত অথবা ইংরেজী বচনোদ্ধার তাঁরা যতই করুন কাজটি আসলে বড় শক্ত—হয়তো বা অসম্ভব।—তা হোক না খুব শক্ত, এমন কি অসম্ভব-ঘেঁষা, তবু সাহিত্যিকদের এই সাহিত্যতত্ত্বরূপী স্বর্ণ-মৃগের পশ্চাদ্‌ধাবন অসঙ্গত বা অশোভন নয়, কেননা স্বর্ণমৃগ আয়ত্তের বহির্ভূত হতে পারে কিন্তু তাকে উপলক্ষ্য করে যে প্রয়াস যে দুঃখভোগ যে অন্তর্দাহ তার ভিতরে পুটপাক হয়ে কোনো অমৃত তাঁদের জন্য উচ্ছলিত হবে কিনা কে জানে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য বিষয়টি আরো কিছু জটিল। সত্য বটে এমন কিছু চিন্তা-ভাবনা কিছু রূপাঙ্কন বাংলা সাহিত্য আমরা পেয়েছি যা অমৃতমাখা—মানুষের চিত্তের জন্য এক উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু তার পরিমাণ ও রকমারিত্ব এখনো বড় কম—এত কম যে তাই থেকে সাহিত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে নব নব প্রেরণালাভ অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য নিঃসন্দেহ। ইংরেজী প্রভৃতি সাহিত্যে যাঁরা কাব্যজিজ্ঞাসু তাঁরা অবশ্য তাঁদের অনুসন্ধিৎসা শুধু ইংরেজী সাহিত্য-ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখেন না, কিন্তু সেই সাহিত্যই যে তাঁদের মুখ্য প্রেরণাস্থল সে সম্বন্ধে বাক্যব্যয় বোধ হয় অনাবশ্যক। তাছাড়া ইংরেজী ভিন্ন অন্যান্য যে সব সাহিত্য থেকে তাঁরা উপকরণ সংগ্রহ করেন, যেমন গ্রীক ও রোমক সাহিত্য, সে-সবের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধ এত নিকটবর্তী যে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তেমন নিকট সম্বন্ধ কোন্ সাহিত্যের অথবা কোন্ কোন্ সাহিত্যের সেইটিই একটি বড় অনুসন্ধানের বিষয়।

কথাটা কারো কারো কাছে অদ্ভুত শোনাতে পারে, কেননা বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণই যে বেশী শুধু তাই নয়। তবু এ কথাটা বাস্তবিকই অদ্ভুত নয়। মধুসূদনের আগেকার যে বাংলা কাব্য, যেমন ভারতচন্দ্রের অথবা বিদ্যাপতির কাব্য ও কতকাংশে চণ্ডীদাসের কাব্য বলা যেতে পারে, মুখ্যভাবেই হোক আর গৌণভাবেই কাব্য, সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রভাব তার উপরে বেশী। কিন্তু মধুসূদন থেকে বাংলার যে নব সাহিত্যের সূত্রপাত তার সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় কি? নব বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ তেমনই প্রচুর, হয়তো বা প্রচুরতর, সংস্কৃত শব্দালঙ্কার সংস্কৃত দার্শনিক পরিভাষা এসবও বাংলার নব সাহিত্যের রথীদের প্রীতির সামগ্রী, কিন্তু এসব, যাকে বলা হয়, বাইরের সাজসজ্জা—ভেতরকার আসল কবি-মানুষটি যে বদলে গেছে!

কথাটা আরো কিছু পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে। কালিদাস-ভারবি-প্রমুখ সংস্কৃত কবিদের আর্থিক অভাব-অভিযোগের তাড়না ভোগ করতে হতো কি না সে তত্ত্ব আমাদের

www.nagorikpathagar.org

অজ্ঞাত কিন্তু তাঁদের কাব্যের ভিতর যে চিত্ত প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায় সেটি বড় শান্তিপূর্ণ-উদ্বেগরহিত। অর্থাৎ, ধর্ম সমাজ ইহকাল পরকাল ইত্যাদি নিয়ে মানুষের চিত্ত যে সময় আন্দোলিত হয়—এ কালের মানুষ এ আন্দোলনের হাত থেকে যেন আর নিষ্কৃতিই পাচ্ছে না—এই সব সংস্কৃত কবি সে-বিক্ষোভ দ্বারা যেন অস্পৃষ্ট। কিন্তু মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—আমাদের একালের সাহিত্যের দিক্‌পাল—এঁদের মনোজীবনে সে আরাম কোথায়! সত্য বটে মধুসূদনের জীবন বহু বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হলেও তাঁর কাব্যের মর্মকোষে যে চিত্তটি বিরাজ করছে সেটি প্রসন্ন—ঠিক আনন্দিত না হলেও উদ্বেগ-রহিত। কিন্তু তাঁর যে নব-আবিষ্কৃত ছন্দলোক—কত অভিনব সামগ্রী সেই বিরাট হার্মনি! কত বিক্ষোভ কত দুঃখ কত প্রেম কত মাধুর্য তাকে এই অহরূপতা দান করেছে! মধুসূদন নিজে বলেছিলেন গ্রীক দেবদেবীদের তিনি পরিচয় দেবেন হিন্দু দেবদেবীর পোষাক, —কত নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে তাঁর এই উক্তির সার্থকতা লাভের ভিতরে তাই-ই ভাববার বিষয়।

আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। "ভাষা ও ছন্দ" কবিতাটিকে বাল্মীকির কবিপ্রেরণা লাভ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়?..........................

বঙ্কিম-রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে এই কথাই বার বার আমাদের মনে হয়। একাধারে এঁরা কবি, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক, রাষ্টতত্ত্ববিৎ, ভাষাসংস্কারক, ধর্ম-সংস্থাপক!—আর তাও অজ্ঞাতসারে নয়, সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—হৃদয়রক্ত নিঃশেষিত করে!

কাব্য সম্বন্ধে সেকালের সংস্কৃত উক্তি—
কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষয়তে,—
আর একালের বাংলা উক্তি—
কত প্রাণপণ,— দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,—
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি?

এই দুই কাব্য-জগতের যে ব্যবধান তা শুধু বিপুল নয়, কোনো কোনো দিক দিয়ে হয়তো বা দুর্লঙ্ঘ্য।

এই জন্য শান্তি নয় সংগ্রাম-ধর্মী যে ইয়োরোপীয় সাহিত্য তার সঙ্গে মিলিয়ে বাংলার নব সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করতে আমাদের কোনো কোনো সমালোচক যত্নপরায়ণ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেও মুশকিল কম নয়। ইয়োরোপীয় সাহিত্য ইয়োরোপবাসীর কাছে এক জীবন্ত ব্যাপার। সেই জীবনের প্রয়োজনে সেই সাহিত্যের, অর্থাৎ কাব্য ও কাব্যজিজ্ঞাসা দুয়েরই, আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন সেখানে হচ্ছে। এত দূর থেকে সেই জীবনও পরিবর্তন-প্রবাহের সমঝদারি আমাদের জন্য খুবই দুরূহ সন্দেহ

www.nagorikpathagar.org

নেই। তাই ইয়োরোপীয় সমালোচনাশাস্ত্র নিয়ে আমাদের ভিতরে যাঁরা কিছু ব্যস্ত-সমস্ত ইয়োরোপীয় সেই অনুদিন-বর্ধমান কাব্যজিজ্ঞাসার পরিবর্তে অনেক সময়েই যে তাঁদের লাভ হবে বিভিন্ন ধরণের কিছু কিছু "কোটেশন" তা অস্বাভাবিক বা অসাধারণ কিছু নয়।—কিন্তু এর অসাধারণত্বও আছে—এই "কোটেশন"-সমালোচনাও মাঝে মাঝে বাংলা সাহিত্যে ভীতির সঞ্চার করে এসেছে।

কিন্তু বলা যেতে পারে, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে একালের বাংলা সাহিত্যের মিল যখন বেশী তখন যতটা সম্ভব ইয়োরোপীয় কাব্যজিজ্ঞাসার মূল সূত্রগুলি আয়ত্ত করা ভিন্ন আমাদের নব সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করবার আর কি মানদণ্ড আছে? বলা বাহুল্য আমাদের অনেক সমালোচকেরই মোট বক্তব্য এই—যদিও সত্যকার সাহিত্যরসিকদের বুঝতে একটুও দেরী হয় না এই মনোভাব কত হেয়। এ হচ্ছে অনুকরণের মনোভাব,—আর অনুকরণ করে যেমন কবি হওয়া যায় না, অনুকরণ করে তেমনি কাব্যজিজ্ঞাসুও হওয়া যায় না। সত্য বটে ইয়োরোপীয় সহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট আমাদের নব সাহিত্য। কিন্তু সেই প্রভাবের কথাই তো এর সবখানি কথা নয়। বরং প্রকৃত কথা এই—এক ভিন্ন পরিবেষ্টনে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের কিছুই বোঝা হয় না।

যাঁরা একালের বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা তাঁরা যে এই অভিনত্বের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত ছিলেন তা নয়। মধুসূদন তো ইয়োরোপীয় কাব্যকলা বরণ করেছিলেন প্রাণের দোসর রূপে। কথিত আছে, তাঁর স্ত্রীর কণ্ঠে ফরাসী গান শুনে তিনি অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন। তবু তাঁর রাবন মেঘনাদ অথবা রাম লক্ষ্মণ সীতা বিভীষণ হোমরের প্রায়াম হেক্টর অথবা আগামেম্‌নন নেস্‌টর হেলেন ইউলিসিসের অনুকৃতি হয়ে ওঠে নি, এমন কি এরা ইয়োরোপীও নয়,—সমস্ত নূতনত্ব সত্ত্বেও এরা সেই একধরণের বাঙালী। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অবশ্য জাগ্রতভাবে বাংলার বৈশিষ্ট্যসাধন তাঁরা যতটুকু করতে চেয়েছেন তাঁদের অজ্ঞাতসারে তার চাইতে মহত্তর বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন তাঁদের প্রতিভা থেকে লাভ করেছে।—এই যে আমাদের সৌভাগ্য এর জন্য পর্বাতিবোধ অশোভন নিশ্চয়ই, কিন্তু এ বিষয়ে উদাসীন হয়ে পরধনলোভে মত্ত হলে তা হয় শোচনীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হবে—কি সেই নব বাংলা সাহিত্যের অভিনবত্ব? —কি তার স্বরূপ?

এ প্রশ্নের খুবই সন্তোষজনক উত্তর কেউ যদি দিতে পারেন তবু বাংলার অন্যান্য সাহিত্যসেবীর সেজন্য অব্যাহতি মেলে না। তাই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এমন একটা প্রশ্নের অবতারণাই আমাদের জন্য সব চাইতে বড় লাভ। হয়ত এই প্রশ্নের আঘাতেই বাংলার জীবন ও সাহিত্যসমস্যার নব নব দ্বার আমাদের জন্য উদঘাটিত হবে। এর উত্তর বাংলার সাহিত্য-দরবারে, তথা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে, পেশ করতে চেষ্টা করবেন বিভিন্ন সাহিত্যিক তাঁদের শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে। আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি তা নিবেদন করতে চেষ্টা করব।

শোনা যায়, বাংলাদেশ এক সময়ে জলমগ্ন ছিল। তখন সমুদ্রের তরঙ্গ তার বুকের উপরে খেলা করত। সেই তরঙ্গভঙ্গের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে বাংলা নিজেকে প্রকাশ

www.nagorikpathagar.org

করেছে। বাংলার লোকদের জীবনেও তেমনি বহুবার বহু ভাব-প্লাবন এসেছে। আর্য দ্রাবিড় কোল মঙ্গল বৌদ্ধত্ব হিন্দুত্ব এসব তো ছিলই, তার উপর এসেছে মুসলমান-প্লাবন তার নবাবী বাদশাহী শরীয়ত মারেফাত এই সব নিয়ে; তার উপর এসেছে ইয়োরোপীয় প্লাবন তার বাণিজ্য রাজনীতি ফরাসীবিপ্লবের বার্তা খৃষ্টধর্ম সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে। অবশ্য এমন বৈচিত্র্য যে বাংলারই বৈশিষ্ট্য তা নয়; প্রায় সব দেশেরই ইতিহাস যথেষ্ট বিচিত্র। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এই সব বিচিত্র উপকরণের কেমন এক জৈব মিলন ঘটেছে—এ-মিলন সব দেশে সবসময়ে ঘটে না—এ কালের বাংলা সাহিত্যে ফুটে উঠেছে বাংলার এই নবগঠিত মানসলোকের শ্রী। —বাংলার নব ধর্মাচার্যবৃন্দ নব সাহিত্যরথিবৃন্দ এঁদের সবারই জীবনে প্রাচীর ও প্রতীচীর বিচিত্র সাধনার সমাবেশ ঘটেছিল বাংলার শিক্ষিত লোকেরা তা জানেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের কাছে এই সমাবেশ বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ এইজন্য যে এতে এই অগ্রণীদের জীবনই এক আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত হয় নি, বরং এঁদের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞাপিত হয়েছে সমগ্র বাঙালী জীবনের জন্য এক নব সূচনা; এঁরা যেন পর্বতশীর্ষ—নব প্রভাতের সুপ্রসন্ন আশীর্বাদে প্রথম উজ্জ্বলিত এঁদের ভাল দেশ।

বলেছি, এই বৈশিষ্ট্য সাধনের জন্য খুবই চেষ্টিত আমাদের মনীষীরা যে হয়েছিলেন তা নয়। এমনকি তাঁরা অনেক সময়ে কেমন করে যেন একে আচ্ছন্ন করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। তিনি ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিন্দুধর্মের স্থান নির্দেশ করেছেন সব ধর্মের উপরে। কিন্তু বেদের বহুঊর্ধ্বে তিনি যে গীতার স্থান নির্দেশ করেছেন এতেই তাঁর হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দুর ভক্তির চাইতে সংশয় জাগায় বেশী। তেমনিভাবে তাঁর প্রফেট ষ্টেটস্‌ম্যান ও বৈজ্ঞানিকবিচারে-পূর্ণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত হিন্দুর বিস্ময়ের সামগ্রী। অথচ এসব বঙ্কিমচন্দ্রের খেয়ালী সৃষ্টি নয়; তাঁর জিজ্ঞাসায় তীব্রতা যথেষ্ট। —তাঁকে যদি বলা হয় কঁৎ-স্পেন্সারসিলি-বেন্থামের হিন্দুবেশী শিষ্য তাতেও ঠিক কথাটি বলা হয় না; কেননা এই সব পাশ্চাত্য মনীষীর মতো পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতা তাঁর বড় লক্ষ্য নয়। —আসলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৌন্দর্যবোধ ও অনুসন্ধিৎসা, প্রবল স্বদেশকল্যাণ-কামনা ও কিছু মোহ, সমস্ত নিয়ে বিশেষভাবে একজন man of faith-কল্যাণজিজ্ঞাসু কর্মী—তাই দেশের জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তাঁর এই আলো ও অন্ধকার উদগীরণকারী অদ্ভুত প্রতিভা থেকেও কিছু নির্দেশ লাভ হয়েছে—কি কল্যাণ কি পথ, কি গ্রহণীয় কি বর্জনীয়।

আর রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিভা তাঁর সমসাময়িকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ অনবদ্য বিবেচিত হবে এ স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো-কিছুরই পূর্ণাঙ্গতালাভে প্রকৃতির বোধ হয় আপত্তি। তই পরবর্তীকালের সাহিত্য-রসিকেরা হয়ত দেখবেন, যে বিশ্বপ্রেমের জন্য এই কবির কোনো কোনো স্বদেশবাসী তাঁর প্রতি অনুরক্ত অথবা বিরক্ত হয়েছেন সেই প্রকাণ্ড বিশ্ব-প্রেমের চাইতে অপ্রকাণ্ড স্বদেশ-প্রেম বা বঙ্গ-প্রেম তাঁর ভিতরে কত নিবিড়! সেজন্য তাঁর প্রতিভা তাঁদের কাছে কম গৌরবের হতে পারত, কিন্তু কবির নিজের ও তাঁর স্বদেশবাসীদের সৌভাগ্য এই যে কবির জন্মগত সত্যের আকর্ষণ মহাজীবনের আকর্ষণ তাঁর সমস্ত আরাম

www.nagorikpathagar.org

ও তুচ্ছতাপ্রীতির ভিতরে বার বার জয়ী হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই যে সত্যের আকর্ষণের ছবি, এই যে সৌন্দর্যপ্রিয়, আরামপ্রিয়, স্বদেশ স্বজাতি ও স্বকালের সঙ্গে নিবিড় স্নেহের যোগে যুক্ত কবি বার বার উন্মাদনা হয়ে উঠেছেন সত্যের আহ্বানে, ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত মোহপাশ অপসারিত করে নতমস্তক হতে পেরেছেন সত্যের সামনে, —এই অপরূপ জীবন-আলেখ্য, —এরই জন্য মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার চাইতে তাঁর প্রতিভা তাঁর দেশ ও জাতির জন্য বেশী অর্থপূর্ণ হয়েছে।

......একটা দেশের লোক বহুকাল ধরে বাস করে আসছিল অনেকখানি জড়ধর্মের ধর্মী হয়ে। সময়সময়ের চিত্তোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও একটা অপ্রবল জীবন অপ্রচুর জীবনায়োজন এইই ছিল জগতের সামনে তাদের পরিচয়। সেই জীবনে কোথা থেকে জেগেছে নব সাধ-নব স্বপ্ন! —পাড়াগাঁয়ের ব্যাপারী যেন আলাউদ্দিনের প্রদীপের দৈত্যের সাহায্যে রাতারাতি হয়ে উঠেছে বিশ্বের বন্দরের সওদাগর! —গ্রাম্য সমাজের অন্ধ গতানুগতির পরিবর্তে জগৎ-সমাজের সাহিত্য ধর্মতত্ত্ব সৌন্দর্য বিজ্ঞান সমাজনীতি রাজনীতি তার অবলম্বন ও উপজীবিকা!.....

বাংলার সাধারণ জীবনের সঙ্গে বাংলার সাহিত্যের জীবনের এই প্রভেদ। —এই সাহিত্যকে বিশেষিত করা যেতে পারে idealistic বলে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে idealism-এর সুখস্বপ্ন এর মর্মকথা নয়। এ তার চাইতে বীর্যবন্ত। এ বরং prophetic-বাংলা যা হবে বা তাকে যা হতে হবে তারই সূচনা এতে। —সব সাহিত্যেরই দোষ ত্রুটি থাকে; একালের বাংলা সাহিত্যেরও আছে। হয়তো বড় সাহিত্যের তুলনায় কিছু বেশী আছে। কিন্তু গণনার বিষয় এর ত্রুটি নয়, এর প্রাণশক্তি—এর অর্থ ও সম্ভাবনা।—কিন্তু এ কালের বাংলা সাহিত্যের এই অর্থ ও সম্ভাবনাজিজ্ঞাসায় বাংলার "কাব্যরসিক"রা আশ্চর্য ক্ষীণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন!

কিন্তু তাঁদের এত নিন্দা করে লাভ নেই। সমালোচকরা মোটের উপর দেশের পাঠকদের প্রতিনিধি। তাই তাঁদের দোষ তাঁদের একলার দোষ নয়। সে দোষ হয়ত গোটা পাঠকসমাজের।

আসলে ব্যাপারটাও তাই। সত্যকার সাহিত্যিক বোধ ও রুচি বাংলার পাঠকসমাজে খুব কমই প্রসারলাভ করতে পেরেছে। এ ব্যাপারে আশ্চর্যভাবে সফলকাম হয়েছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা নন—আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিকরা। তাঁদের পরিচয়স্বরূপ বলা যেতে পারে, মধুসূদন বলতে তাঁরা বুঝেছেন—পরধর্মো ভয়াবহঃ, বঙ্কিমচন্দ্র বলতে বুঝেছেন—হিন্দুত্বের পুনরুত্থান, আর রবীন্দ্রনাথ বলতে বুঝেছেন—idealism, mysticism, অর্থাৎ কিছু কবি-কবি ভাব। আর এই সাহিত্যসমঝদারি নিয়ে বাংলার পাঠকসমাজ মোটের উপর আরামেই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে আরাম ভেঙে দিতে চাচ্ছ, অথবা দিয়েছে—"অতি-আধুনিক সাহিত্য"।

এই "অতি-আধুনিক সাহিত্য" বা "তরুণ সাহিত্য" বাঙালী জীবনে মহা চাঞ্চল্যের সূচনা করেছে। এর প্রশংসা হয়তো এর লেখকদেরই মুখে, তাঁদের গণ্ডীর বাইরে দুই চার

www.nagorikpathagar.org

জন প্রসন্ন পাঠকও হয়ত আছেন। কিন্তু বাদবাকি সমস্ত বাঙালী, লেখক পাঠক নির্বেশেষে, এর উপর অসন্তুষ্ট। তাদের এত অসন্তোষের কারণ নির্ণয় কিন্তু খুব সহজ নয়; কেননা" তরুণ সাহিত্যে"র যে সব অতিচার অনাচারের দিকে তাঁরা অঙ্গুলি নির্দেশ করেন সহজিয়া ও কবিখেউড়ের বাংলা দেশে ও বাংলা সাহিত্যে তা পুরোপুরি নতুন নয়। তবে "তরুণ সাহিত্যিক"দের বড় অপরাধ হয়ত এই যে বাংলার ভদ্র-সাধারণ একটা শতছিদ্রপূর্ণ অথচ ভব্যতামণ্ডিত জীবন নিয়ে কিছু নিরুদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন, এই "তরুণ"রা সেই ক্ষণভঙ্গুর ভব্যতার আবরণ নিয়ে নেহাৎ অল্পমতির মতো টানা-হিঁচড়া আরম্ভ করেছেন।

আমি নিজে "তরুণ"রা সাহিত্য সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছুই বলতে চাই না; কেননা, মনে হয়, তা অনাবশ্যক। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর যে বুদ্ধি বিবেচনা নীতি রুচি "তরুণ সাহিত্যিক"রা মোটের উপর তার চাইতে বেশী ভাল বা বেশী মন্দ নন। "তরুণ"দের নবইয়োরোপ-প্রীতি ও অতরুণদের প্রাচীনভারত-প্রীতি একই মনোভাবের এপিঠ আর ওপিঠ। কিন্তু মনে হয় বাংলার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাছে এই "তরুণ"দের চেষ্টাই হবে বেশী অর্থ পূর্ণ; কেননা যে ধ্বংস বাংলার সমাজজীবনে অবশ্যম্ভাবী—এবং সেই পথেই হয়ত কল্যাণ—এই "তরুণ"দের প্রচেষ্টায় ফুটতে চাচ্ছে সেই ধ্বংসেরই রূপ। রচনাবিষয়েও এই "তরুণ"দের কারো কারো ভিতরে দেখা যাচ্ছে তাঁদের অতরুণ নিন্দুকদের চাইতে কিছু বেশী শক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে নজরুল ইসলামকে অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। নজরুল ইসলামকেই ধরা যাক। তাঁর রচনা বহুত্রুটিপূর্ণ নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবু তাতে আঁকা পড়েছে একটি তাজা মনের অভিমান-উন্মাদনার আশা-আনন্দের ছাপ। অর্থাৎ এ কাব্য-ফুল তাজা গাছের ফুল—হোক্ না বন্যফুল। কিন্তু এর পাশে দুই চার জন অতরুণ শিক্ষিত কবির রচনা দাঁড় করালে দেখা যাবে, তাতে না আছে রং না আছে গন্ধ। রঙের আভাস যেটুকু লাগে তা প্রলেপ; গন্ধও দুই এক ঝলক যা পাওয়া যায় তা প্রক্ষেপ; —আসলে তা কাগজের ফুল।

বাস্তবিক, বাংলা সাহিত্যে "তরুণ"দের অজ্ঞতা ও মস্তিষ্কহীনতা আসল সমস্যা নয়; আসল সমস্যা বরং সাধারণ বাঙালী জীবনের জড়তা ও স্বল্পতুষ্টি বা অন্ধতা—তরুণদের পূর্ববর্তী আরামপ্রিয় অকর্মণ্য খেয়ালী কবি ও সমালোচক-নিবহ যার প্রতীক—আর "তরুণ"রা একই সঙ্গে যার ভয়াবহ পরিণতি ও ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া।—এই সাধারণ বাঙালী জীবনের অবাঞ্ছিত চেহারা বদলে দেওয়াই একালের বাংলা সাহিত্যের এক বড় কাজ। কিন্তু একাজ এখনো অসম্পন্ন।

প্রাকৃতিক নিয়মে যে জলধারা পাহাড় থেকে নেমে এসে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তারই কূলে কূলে লোকের বসতি জমে, সভ্যতার বিকাশ ঘটে। বাংলার বুকে যে ভাবগঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে তারই কূলে কূলে ফুটবে বাংলার ও জাতীয় জীবনের শ্রীছাঁদ। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন আমাদের সমস্ত ঔদাসীন্য ও তুচ্ছতাপ্রীতি সর্বান্তঃকরণে দূর করে দিয়ে এই ভাবনদী যে আমাদের বহু দেশদেশান্তরের বিচিত্র সম্পদ-সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেছে সেই মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হওয়া। এমনিভাবে, শুধু সাহিত্য-চর্চা নয়, ব্যাপকভাবে

www.nagorikpathagar.org

জীবন-চর্চাতেই আমাদের নব সাহিত্যের প্রকৃতি সার্থকতা। আর এইভাবেই আমাদের সমস্ত মুগ্ধতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ও সাহিত্যে আমাদের সমস্ত চেষ্টার ধ্বংস হবার, সত্যাশ্রয়ী হবার, সুযোগ ঘটবে।

Realism কথাটার সঙ্গে বাংলার "তরুণ"রা বেশ পরিচিত কিন্তু মনে হয় এ কথাটা তাঁরা বুঝতে চাচ্ছেন বেশ খানিকটা বিকৃত করে। মৃত্যু আমাদের পদে পদে, কিন্তু মৃত্যু ধ্বংস নয়, ধ্বংস জীবন যা মৃত্যুকে ডিঙিয়ে চলে। তেমনিভাবে মোহ দুর্বলতা মানুষের পদে পদে, কিন্তু তাইই real নয় real তপস্যা যা মানুষকে সত্যকার মনুষ্যত্ব দান করে। আমাদের দেশের যে খণ্ডিত বিপর্যস্ত রুগ্‌ণ জীবন একে real ধরে' নিয়ে নাকি সুরের কান্নাচর্চায় না হয় সাহিত্য-চর্চা না হয় জীবন-চর্চা।

তাজী ঘোড়াকে জীর্ণ আস্তাবলে পোরায় যে বিপদ বাংলার মনীষীদের নব-জীবন ও নব-মানবতার সাধনা বাংলার সমাজ-জীবনে হয়ত সেই বিপদের সূচনা করেছে। কিন্তু সেই ঘোড়া বিদায় দিয়ে জীর্ণ আস্তাবলটি যে অটুট রাখবার চেষ্টা হবে সে সময়ও তো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে!

কিন্তু বৃথা এই অস্বস্তিবোধ, বৃথা এই ক্ষোভ। "এক হাতে এর কৃপাণ আছে আর এক হাতে তার"—এই যে আমাদের একালের সাহিত্য এ আমাদের বিভ্রান্ত করতে আসে নি, এ প্রকৃতই আমাদের সৌভাগ্য। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ জীবন ধ্বংস করবার বল ও স্বাস্থ্যসমন্বিত করবার সুন্দর করবার অমোঘ শক্তি এর আছে।—তাই এ যদি এ-কালের বাংলা সাহিত্যিকদের কাছে দাবি করে অকুণ্ঠিত আত্মসমর্পণ, তবে অসম্ভব কিছু দাবি করে না নিশ্চয়ই।

সাহিত্যকে মোটামুটি দুই অংশে ভাগ করে দেখা যেতে পারে—তার সৃষ্টি-অংশ আর আলোচনা-অংশ। আমরা এতক্ষণ মুখ্যত বুঝতে চেষ্টা করেছি এ-কালের বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি-অংশ, আর তারই সঙ্গে এও দেখা গেছে যে এই সাহিত্যের সমঝদারি, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-অংশের এক অংশ, খুবই ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু শুধু আংশিকভাবে নয়, মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে সমগ্রভাবে বাংলার সাহিত্যের আলোচনা-অংশ যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ-জ্ঞান ও উন্নত রুচির এক প্রকৃষ্ট বাহন এ আজো হয়ে ওঠে নি। কিন্তু আলোচনা-অংশ এমনিভাবে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকলে গৌরবান্বিত সৃষ্টি-অংশেরও যে অনেকখানি ব্যর্থতা, —যেমন বায়ুমণ্ডলের কার্যক্ষমতার উপরে নির্ভর করে সূর্যোত্তাপের সাফল্য। তাই বাংলা সাহিত্যের আলোচনা অংশ কিসে দোষমুক্ত হতে পারে সেটি বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য বাস্তবিকই এক সাহিত্যিক সমস্যা। অর্থাৎ, এর উৎকর্ষ বিধানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হবার সময় তাঁদের এসেছে।

Matthew Amold তাঁর একটি লেখায় ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় ইংরেজি সাহিত্যের দুটি ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর নির্দেশ ইংরেজি সাহিত্যে কতখানি গ্রাহ্য হয়েছে যে বিচারের ভার ইংরেজ সাহিত্যিকদের উপরে ন্যস্ত; কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাংলার আলোচনা-অংশের উৎকর্ষের জন্য তাঁর সেই দুটি কথা থেকে

www.nagorikpathagar.org

প্রচুর সাহায্য পাওয়া যাবে। তাঁর সেই দুটি কথার দিকে বাঙালী সাহিত্যসেবীমাত্রেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া সঙ্গত। সে দুটি কথার নাম তিনি দিয়েছেন Urbanity I clear mind, তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া যেতে পারে ভব্যতা ও পরিচ্ছন্ন চিন্তা।

ভব্যতা বলতে তিনি বুঝেছেন গ্রাম্যতা ও আতিশয্য বর্জন; অর্থাৎ, লেখক তাঁর কথাগুলো পেশ করছেন এক শিক্ষিত মণ্ডলীর কাছে, কাজেই তাঁর চিন্তায় ও ভাষায় মার্জিত রুচির পরিচয় থাকবে এইই সমীচীন।—এই ভব্যতা যে আমাদের সাহিত্যে একান্তই বিরল তা নয়। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ এঁদের রচনার এর সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে। তবু শুধু সাধারণ বাঙালী জীবনে নয় আমাদের শ্রেষ্ঠদের কারো কারো ভিতরেও (যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র) এই ভব্যতার অসদ্ভাব মাঝে মাঝে সেই এক ভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে উঠে জ্ঞান ও রসের আসরে বিভ্রাট ঘটিয়েছে। এই ভব্যতা রচনার শ্রী ও মাধুর্য বাড়িয়ে দিয়ে তাকে যে কত অর্থপূর্ণ করে তোলে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একে পুরোপুরি আয়ত্ত করবার ক্ষমতাও হয়ত তাঁরই আছে যিনি প্রেমিক ও জ্ঞানের পথে অকুতোভয়।

এই ভব্যতা-সাধন বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য নিশ্চয়ই খুব সহজ হবে না, কেননা বাংলার প্রচলিত জীবনধারা এর বিপরীত। বাংলার কবি যাত্রা ও একালের থিয়েটার সাংবাদিকতা এ সবের অন্য গুণ যতই থাকুক গ্রাম্যতা ও সংকীর্ণতার প্রাচুর্য এসবের বেশ এক বড় পরিচয়চিহ্ন। কিন্তু কষ্ট-সাধ্য হলেও এ থেকে পেছপাও হবার সময় আমাদের আর নেই। গ্রামের লোক শহরবাসী হলে নাগরিক ভব্যতা-সাধনের।

তারপর পরিচ্ছন্ন চিন্তা। শুধু সাহিত্যে নয়, জীবনের সকল ব্যাপারেই এই পরিচ্ছন্ন চিন্তার দাম যে কত বেশী এই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার যুগে তা আর নুতন করে দরকার করে না। কিন্তু আমাদের পুরুষপরম্পরাগত গ্রাম্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচ্ছন্ন চিন্তার এক বড় অন্তরায় হচ্ছে—আমাদের অতীতের মোহ ও বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভয়।

এই অতীতের মোহ আমাদের মনীষীদের জন্যও অপ্রবল ছিল না সত্য, কিন্তু সেই মোহ তাঁদের চিত্ত বন্দী করে রাখতে পারে নি; রক্তমোক্ষণশীল স্যার ফিলিপ সিড্নীর মতো শেষ পর্যন্ত তাঁরা জয়ী হয়েছেন। আর এক-হিসাবে এই মোহ ছিল তাঁদের জীবনের এক অলঙ্কার। কিন্তু অল্পশক্তি লোকদের জীবনে এই মোহের কবলে পড়ে অদ্ভুতদর্শন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বাঙালী বাস্তবিকই মুক্তবুদ্ধির লোক হলে একালের বাঙালীর বহু গবেষণা তার হাসিতামাসার প্রচুর খোরাক যোগাতে পারবে।

কিন্তু এই পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে সামনে চলার বিড়ম্বনা বহু ভোগ করা হয়েছে। এ পালা এখন চুকিয়ে দেওয়া ভাল। অবশ্য তার জন্য অতীতকে অস্বীকার করবার দরকার করে না, কেননা তা জ্ঞানতা। আমরা পিতামাতার সন্তান নিশ্চয়ই।—তবে সেই আমাদের একমাত্র পরিচয় নয়।

আমরা অতীত ইতিহাসের সৃষ্টি;—বেশ। কিন্তু আমাদের পরের যে ইতিহাস তার পুরো চেহারা অতীত থেকে তো অনুমান করা যায় না। এমন কি আমাদের অতীতের সত্য

www.nagorikpathagar.org

পরিচয় পাবার জন্য প্রয়োজন হয় আমাদের পরের ইতিহাস বুঝবার। অর্থাৎ, আমরা বাস্তবিকই নব নব ইতিহাস সৃষ্টি করি, অথবা আমাদের ভিতর দিয়ে নব নব ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। তাই অতীতের বন্ধন আমাদের জন্য অসত্য-মোহ।

এই অতীতের মোহের হাত থেকে উদ্ধার পেলে শুধু সাহিত্যে নয় শিক্ষা স্বাস্থ্য আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সব বিষয়েই আমাদের চিত্ত যে কত সত্য ও কল্যাণঅভিসারী হতে পারবে, ভবিষ্যৎ ভীতির স্থল না হয়ে কত মোহন স্বর্গের ধাত্রী হবে, একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারা যায়; অথচ এই মোহকে মোহ জেনেও আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বহু মূল্যবান সময় এর পেছনে নষ্ট করি!

উপসংহারে Goethe-র একটি উক্তি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—"The great works of art are brought into existence by men, as are the great works of Nature in accordance with true and natural laws; all arbitrary phantasy falls to the ground; there is Necessity, there is God"—একালের বাংলা সাহিত্যে এই "প্রয়োজন" এই "বিধাতৃবিধান" অল্প-বিস্তর আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। —বাঙালী জীবন ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এইসব প্রাণপ্রদ জিজ্ঞাসা উত্তরোত্তর আপনাদের গভীরতর চিন্তা-ভাবনার বিষয় হবে, আশা করি।

"মুস্‌লিম সাহিত্য-সমাজে"র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। চৈত্র, ১৩৩৫

www.nagorikpathagar.org

জীবনপঞ্জি

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ (১৩০৯ বঙ্গাব্দ)	বৈশাখ মাসের প্রথম শুক্রবার জন্ম। স্থান: নদীয়া ও বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার জগন্নাথপুর গ্রাম (মাতুলালয়)। পৈত্রিক তদানীন্তন বাসস্থান ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রাম। পিতামহ : কাজী ইয়াসিন আলী। পিতা : কাজী সৈয়দ হোসেন ওরফে ছগীর কাজী। মাইনর ক্লাশ পর্যন্ত লেখাপড়া। কোলকাতা রেলওয়েতে চাকুরী শুরু, হাওড়ার ষ্টেশন মাষ্টার হিসেবে সমাপ্তি। মাতামহ : পাঁচু মোল্লা। বাগমারার অদূরবর্তী হোগলা গ্রাম। প্রতাপশালী জোতদার। দুই পুত্র দারোগা, এক পুত্র শিক্ষা বিভাগের বড় চাকুরে।
১৯০৯	পাবনা ইনস্টিটিউশনে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু জগন্নাথপুর মাইনর স্কুলে, ষষ্ঠ শ্রেণী নরসিংদির সাটির পাড়া হাই স্কুল; অষ্টম–নবম শ্রেণী ঢাকা জেলার মুড়াপাড়া হাই স্কুল।
১৯১৩	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ। মাসিক দশ টাকা হারে বৃত্তি ও রৌপ্য পদক লাভ।
১৯১৬	বড় মামার মেয়ে জমিলা খাতুনের সংগে বিয়ে।
১৯১৭	কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ।
১৯১৯	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ।
১৯২০	ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার লেকচারার পদে নিযুক্তি।
১৯২৬	ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা।
১৯৩৫	বিশ্বভারতীতে 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ' সম্পর্কে নিজাম বর্তৃতা।
১৯৪০	টেক্সট বুক বোর্ডের সেক্রেটারী রূপে কলকাতায় গমন। কিছুকাল পরে রেজিষ্ট্রার অব পাবলিকেশন্স-এর দায়িত্ব লাভ।
১৯৪৭	দেশ বিভাগের পর কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত।
১৯৫২	সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ। ওপরওয়ালাদের অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে দু-দুবার চাকুরীতে ইস্তফা দান, শেষ পর্যন্ত সহকর্মীদের অনুরোধে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার।
১৯৫৪	স্ত্রীর মৃত্যু।
১৯৫৬	বিশ্বভারতীতে 'বাংলার জাগরণ' সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক বক্তৃতা দান।
১৯৫৭	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শরৎ স্মৃতি বক্তৃতামালা' প্রদান।
১৯৭০	শিশির কুমার পুরুস্কার লাভ।
১৯ মে, ১৯৭০	মৃত্যু।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১. 'বুদ্ধির মুক্তি' কথাটির মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদের চিন্তাধারার বীজ নিহিত।' শাশ্বত বঙ্গ গ্রন্থের নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২. 'কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্য সাধনার মূলে ছিল উদার ও মুক্ত বুদ্ধির চেতনা।'–আলোচনা কর।

৩. মুক্ত বুদ্ধির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদের প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় দাও।

৪. 'কাজী আবদুল ওদুদ ধর্ম ও জাতিগত বিদ্বেষের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন।' 'শাশ্বত বঙ্গ' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুলোর আলোকে মতামত দাও।

৫. 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থের নির্বাচিত প্রবন্ধ অবলম্বনে কাজী আবদুল ওদুদের প্রগতিশীল মানসিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

৬. 'বাঙলার জাগরণ' প্রবন্ধ অবলম্বনে কাজী আবদুল ওদুদের প্রগতিশীল চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

৭. বাংলার জাগরণ ও মুক্তবুদ্ধির প্রবর্তক হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৮. 'শাশ্বত বঙ্গ' প্রবন্ধ গ্রন্থের আলোকে কাজী আবদুল ওদুদ-এর মননশীল চেতনার পরিচয় দাও।

৯. কাজী আবদুল ওদুদের 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ অবলম্বনে এ দু'মহৎ কবির পরিচয় দাও।

১০. কাজী আবদুল ওদুদের 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অনুসারে বাংলার সংস্কৃতির স্বরূপ আলোচনা কর।

১১. 'বাঙলার জাগরণ' প্রবন্ধ অনুসারে তৎকালীন ভাব-আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।

১২. প্রাবন্ধিক হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

১৩. কাজী আবদুল ওদুদের ভাষা শৈলীর পরিচয় দাও।

১৪. কাজী আবদুল ওদুদের 'রস ও ব্যক্তিত্ব' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

১৫. কাজী আবদুল ওদুদের 'শতবর্ষ পরে রামমোহন' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

১৬. কাজী আবদুল ওদুদের 'ইকবাল' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

১৭. কাজী আবদুল ওদুদের 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

১৮. কাজী আবদুল ওদুদের 'গ্যেটে' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

১৯. কাজী আবদুল ওদুদের 'কোরআনের আল্লাহ' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

২০. কাজী আবদুল ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org